গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

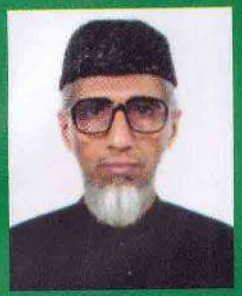

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গ্রন্থকার আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। পবিত্র আরব ভূমি থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এতদঞ্চলে আগত মহান হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (র.)-এর বংশধর তিনি। বৃটিশ আমলের দু'দুবারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র।

দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে আসছেন।

জনাব চৌধুরীর এ পর্যন্ত ২৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও ১১/১২টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তার প্রবন্ধের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি একাধিক স্মরণিকা / স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা, দিকনির্দেশনা দান করেন।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে ১৪টি ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৬ সাল থেকে।

এতদ্ব্যতীত, তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও সভাপতির পদে আসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে অবদান রেখে আসছেন।

তিনি দেশে বহুল পরিচিত সাড়া জাগানো ৭/৮টি সংগঠন দাড় করিয়ে মানব কল্যাণে সেবাদান করে আসছেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১০/১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য।

এসবের পরেও তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন।

তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন। তৎমধ্যে ইরান ও তুরস্কে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে সফর করেন।

Persia To Iran

পারস্য থেকে ইরান

از فارس تا ایران

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

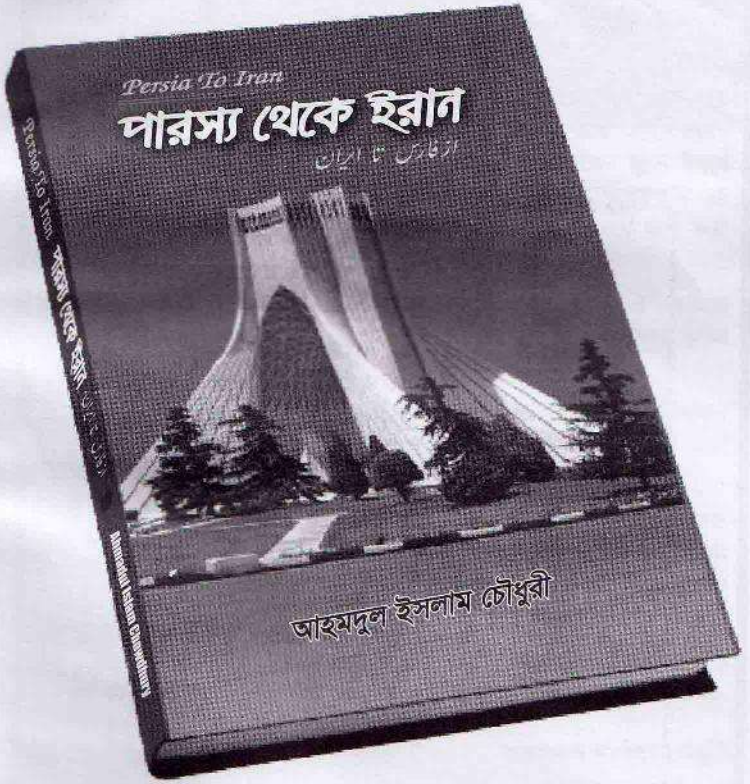
Persia To Iran
পারস্য থেকে ইরান
از فارس تا ایران
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

Persia To Iran

পারস্য থেকে ইরান

از فارس تا ایران

প্রকাশক ॥ সালমা আদিল
বাড়ী নং-৪০৭/১০, রোড নং-৭
বারিধারা ডি.ও.এইচ.এস, ঢাকা

প্রকাশকাল ॥ ১২ নভেম্বর ২০১২ইংরেজি
২৮ কার্তিক ১৪১৯ বাংলা
২৭ জিলহজ্ব ১৪৩৩ হিজরি

প্রচ্ছদ ॥ টিটন

মুদ্রণ ॥ সুচিত্রা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০১৭১২-৯০০৫৭৬

মূল্য ॥ ৩০০/-
Price ॥ US$ 5.00

ভূমিকা

"পারস্য থেকে ইরান" গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আল্লাহপাকের কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে এবং ২০০৮ সালের জুনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান গমন করার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

আমাদের দেশের সাথে পারস্যের নানা যোগসূত্র ছিল। তা বর্তমানেও একেবারে মুছে যায়নি। দীর্ঘদিন থেকে ইরান গমন করার আশা পোষণ করে আসছিলাম। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ১ম বার স্বউদ্যোগে এবং ২০০৮ সালের জুনে ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইরানী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ২য় বার ইরান গমন করার সুযোগ হয়। ফলে আলোচ্য গ্রন্থকে দু'টি পর্বে ভাগ করা হয়।

গ্রন্থে পারস্য/ইরানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পাশাপাশি বিভিন্ন শহর, ঐতিহাসিক স্থাপনা, মাজার ও ধর্মীয় স্থাপনাসমূহে গমন করার পর তথাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকি।

গ্রন্থটি পাঠ করে সম্মানিত পাঠক মহল সাবেক পারস্য আজকের ইরানের বিভিন্ন বিষয়াবলীর মধ্যে ন্যূনতম হলেও ধারণা লাভ করতে পারলে শ্রম সার্থক মনে করব।

প্রথম প্রকাশ বিধায় তথ্যে ভাষায় ও মুদ্রণে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটা স্বাভাবিক। এতে পাঠকমহলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ রাখছি। যে কোন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি অবগত করালে ভবিষ্যতে ২য় প্রকাশে শুধরিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকব।

গ্রন্থটি প্রকাশে আমার মেয়ে সালমা আদিল এগিয়ে আসায় তার প্রতি দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সকলের শুভ কামনায় –

তারিখ :
চট্টগ্রাম
১২ নভেম্বর
২০১২ইংরেজি

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
(বাঁশখালী, চট্টগ্রাম)
বাসা: বাড়ী নং-১০, রোজভ্যালী রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া,
জাকির হোসেন রোড, পোঃ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২০২
Cell : 0088-01713-115601
E-mail : aislam@kbhouse.info

সূচি

১ম পর্ব

❑ THE CONTENTS IN THE BOOK "PERSIA TO IRAN" ৭

❑ موضوعات کتاب به عنوان «از فارس تا ایران» ১৫

১। পারস্যের ইতিহাসের উপর আলোকপাত ২৩

২। পাহলভী শাসন ২৭

৩। আজকের ইরান ৩৩

৪। ইরান গমন ৪০

৫। তেহরানে কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমা'র নামাজ ৪৮

৬। তেহরানে যেয়ারতগাহ ৫৪

৭। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) ৫৮

৮। সেমনান হয়ে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)'র যেয়ারত ৬৭

৯। হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রহ.) ও তাঁর যেয়ারত ৭৭

১০। কোমে প্রখ্যাত দুই আয়াতুল্লাহর মুখোমুখি ৮২

১১। ধর্মীয় নেতার সাথে কথোপকথন ৮৮

১২। ইস্পাহান ৯২

১৩। হযরত শেখ সাদী (রহ.) ও তাঁর যেয়ারত ১০৩

১৪। সিরাজে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১০৯

১৫। চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা ১১৫

১৬। হামেদানে ইবনে সিনার যেয়ারত ১১৮

১৭। তেহরানের আল-বুরুজ পর্বতে রাতের খাবার ১২৩

১৮। গীলানে যেয়ারত ১২৭

১৯। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ১ রাত ১৩৬

২০। ইরানের খাবার-দাবার ১৪১

২১। ইরানের নারী সমাজ ১৪৫

২২। তেহরান থেকে ঢাকা ১৪৯

সূচি

২য় পর্ব

১। ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইরান গমন ১৫৫

২। ইমাম খোমেনীর আলোচনা সভায় যোগদান ১৫৯

৩। শাহ'র প্রাসাদ পরিদর্শন ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ ১৬৩

৪। রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে যোগদান ও বিকেলে যেয়ারত ১৬৬

৫। ইমাম খোমেনীর শোকসভায় অংশগ্রহণ ১৬৯

৬। মা'শাদে যেয়ারত ১৭৪

৭। তেহরানে ব্যতিক্রমধর্মী দু'টি পার্কে গমন ১৮১

৮। তেহরান থেকে কেরমান গমন ১৮৪

৯। কেরমানে হযরত নেয়ামত উল্লাহ অলির যেয়ারত ১৮৭

১০। কেরমানে অন্যান্য যেয়ারত শেষ করে তেহরান প্রত্যাবর্তন ১৯০

১১। তেহরান থেকে তাবরীজ গমন ১৯৩

১২। তাবরীজ থেকে মারাঘেহ হয়ে উরুমিয়া গমন ১৯৭

১৩। তাবরীজ-তেহরান হয়ে ইস্তাম্বুল ২০১

১৪। কুর্দি জাতি ও তাদের আতিথেয়তা ২০৫

১৫। শিয়া মতাবলম্বীর দৃষ্টিভঙ্গি ২০৯

১৬। আমাদের দেশে পারস্যের প্রভাব ২১৪

১৭। ইমাম খোমেনী-পরবর্তী ইরান ২১৮

১৮। ইরানের রাষ্ট্রদূতের সাথে মত বিনিময় ২২২

১৯। ইসলামী বিপ্লবত্তোর এক নজরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২২৪

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- তাওয়াফ ও যেয়ারত-১৯৯৮ইংরেজি (৯ম প্রকাশ)-২০১২ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৯৯ ইংরেজি
- কালান্তরের দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড-২০০১ ইংরেজি
- হজ্ব ও যেয়ারত-২০০২ ইংরেজি
- গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.)-২০০৩ ইংরেজি (২য় প্রকাশ)-২০০৪ ইংরেজি
- চট্টগ্রামের কথা-২০০৪ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড-২০০৪ ইংরেজি
- মক্তুবাতে হামেদী-মজিদী-২০০৪ ইংরেজি
- গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক)-২০০৪ ইংরেজি
- মোবারক স্মৃতি-২০০৫ ইংরেজি (২য় প্রকাশ)-২০০৬ ইংরেজি
- পাক-ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১ম খণ্ড-২০০৫ ইংরেজি
- শানে ওয়াইসী (রহ.)-২০০৫ ইংরেজি
- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী-২০০৭ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৮ ইংরেজি
  ৩য় প্রকাশ-২০০৯ ইংরেজি
- Shan-E-Waisi (Published from India) 2007
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ১ম খণ্ড (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন)-২০০৭ ইংরেজি
- Hajj: Omrah: Ziarah-2007
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খণ্ড-২০০৯ ইংরেজি
- ধর্মকথা-১ম খণ্ড ২০০৯ ইংরেজি
- আয়নায়ে দরবারে গারাংগিয়া-২০১১ ইংরেজি
- ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক ২০১১ ইংরেজি
- শানে রাহমতুললিল আলমিন (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২০১১ইংরেজি)
- পারস্য থেকে ইরান ২০১২ ইংরেজি
- ভারতের যেয়ারত ও ভ্রমণ (২য় খন্ড) ২০১২ইংরেজি
- Turkey: An Osmanian Empire 2012
- শানে ওয়াইসী (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) ২০১২ ইংরেজি
- নিষ্প্রাণ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ২০১২ ইংরেজি

প্রকাশের পথে

- চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহণ : ইতিকথা-অধিকার-দাবী
- রব্বানা
- ঐতিহ্যের চট্টগ্রাম
- ইস্তাম্বুল কোনিয়ার পথিক
- A Rambler In Istanbul & Konia
- ভারতের যেয়ারত ও ভ্রমণ (৩য় খন্ড)
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ২য় খণ্ড (ইয়েমেন)
- পশ্চিমবঙ্গের আউলিয়ায়ে কেরাম
- ধর্মকথা-২য় খণ্ড
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৮ম খণ্ড
- চট্টগ্রাম ও ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ
- মানবতা
- ইউরোপ, আমেরিকায় ৬৮ দিন

THE CONTENTS IN THE BOOK "PERSIA TO IRAN"

Mr. Ahmudul Islam Chowdhury is the son of an aristocratic family in Chittagong. He is the author of many books and a weekly coloumn writer of the "Daily Purbakone" which is one of the famous newspaper of the country. His composed essays are near about one thousand. He was born in Chittagong in 1950.

The writer Ahmudul Islam Chowdhury is the founder, Patron and chairman of many religious, educational and welfare institutions. Directly or indirectly he is related with several organizations of the country.

He visited different countries of Asia, Europe, Africa and America with a view to travelling and observing (zearat). Among them he visited Islamic Republic of Iran in September, 2005. He went to Iran for the second time in June, 2008 on the 19th death anniversary of the great Imam Khomenee by the invitation and supporting of the government of Iran. Mr. Ahmudul Islam Chowdhury who is a writer, Researcher and Islamic thinker, composed "Persia to Iran" and divided it into two different parts.

LIST OF THE ESSAYS OF THE FIRST PART

1. A description of the history of Persia :

At the beginning of the book contains a brief history of ancient Persia.

2. The administration of Pahlobhee :

Ill-administration and objectionable history of the two Pahlobhee administrators.

3. Iran today :

A description of the present social condition, the passing of life and the development of Iran.

4. Visiting Iran :

The writer and his companion, a famous businessman Mr. Sakhawat Hossain took Visa from Dhaka and went to Tehran by Amirat Air Ways in September, 2005. Here contains a description about the travelling from Dubai to Tehran by Amirat Air Ways.

5. Praying Zuma in the Central Mosque of Tehran :

A description of Praying Zuma in the Central Mosque of Tehran University by the writer.

6. Zearatgah in Tehran :

It contains a description about the zearat of Hazrat Imamzada Abdal Azim, Imamzada Saleh, Hazrat Shahar Banu, Imamzada Taher, Imamzada Zafar and Imam Khomenee of Tehran.

7. Hazrat Bayezeed Bostamee :

The writer went to Bastam in Semnan Province from Tehran with a view to observing (zearat) of Bayezeed Bostamee. There is a simbolic graveyard of Hazrat Bayezeed Bostamee at Chittagong in Bangladesh. As an inhabitant of Chittagong the writer has eagerness of visiting Bastam in Semnan Province. Here the writer to has written Biography of Bayezeed Bostamee (R).

8. Zearat to Hazrat Bayezeed Bostamee Via Semnan :

It contains an elaborate description about how the writer reached Bastam by Taxi, stayed there and returned Tehran in the evening.

9. Hazrat Abul Hasan Kherkanee (R) and his Zearat :

The writer went to near Bastam with a view to zearat of Abul Hasan Kherkanee. The writer tries to wrote about his Biography and Zearat.

10. The writer came face to face with the two famous Ayatullah :

The writer went to Koam with Hamid Kaberi who was a famous businessman. There the writer took an interview from Ayatullah Mahadi Hadbi and Mostafa Nazafi about Shia Akida. Because of publishing the interview, the writer hopes that the misunderstanding about the faith in Shia Akida will come to an end with some extent among the readers of Bangladesh.

11. Conversation with an Iranian religious leaders :

The writer went to Sowdi Arabia with a view to performing Hazz and Zearat in 1999. There he took an interview from Huzzatul Islam Falahian at Islamic Cultural Centre in Madina Munawar Mr. Huzzatul Islam came from Iran. In the interview the writer wanted to know about the paith in Shia, Akida from Mr. Falahian. Because of publishing the interview in the book the writer hopes that Bengali speaking Muslim society will get a clear idea about Shia, Akida.

12. Visiting Espahan :

The writer and his companion, Mr. Sakhawat Hosen went to Espahan by "Iran-Air" Morning Flight, They stayed there one night, performed zearat to Hazarat Imamzada and visited the famous historical settlements of Espahan. The writer composed a description of his two days and one night visiting in Espahan.

13. Hazarat Sheikh Sadi and his zearat in Siraj :

The writer went to Siraj from Espahan by "Iran Air", evening flight. The writer composed his Biography and Zearat.

14. Zearat and visiting in Siraj :

The writer composed a complete description about two-night staying in Siraj and performing Zearat to Imamzada Shah Cherag, Hafiz Sirajee, Hazarat Khaju Kermanee (R) and other famous persons. He also gave a description about historical settlements and after staying two days The writer returned Tehran by "Iran-Air", morning flight.

15. Medicine Scientist Ibne-Sina :

Though the writer has great eagerness about historical events, it is seemed that he has a attraction about Unani-treatment. This is why he composed a brief Biography of Ibne-Sina.

16. Zearat to Ibne-Sina at Hamedan :

The writer went to Hamedan by Taxi and performed zearat to Imamzadas' and father (Baba) Taher. After performing zearat he returned Tehran by Taxi. He composed a description about it.

17. Enjoying Dinner on Al-Buruj Mountain in Tehran :

An established businessman of Tehran Mr. Goalkar invited the writer and his companion to enjoy dinner at a famous restaurant on Al-Buruj mountain. The writer and his companion went there with Mr. Goalkar. On the mountain the temperature is 5/7 less than the plain land. There the Iranian women were roaming even at midnight. The writer composed a real description about it.

18. Zearat at Gilan :

Both the writer and his companion went to Gilan from Tehran by 'Iran-Air' morning flight. Reaching Raste they went to the deep of the famous Al-Burj mountain and performed zearat to Imamzada Ibrahim, Imamzadi Hurriah at Raste town and Ummul Khaer who is the mother of the great peer (saint) Hazrat Abdul Quader Zilani (R). The writer composed an elaborate beautiful description about it.

19. Passing a night on the bank of the Kaspean sea :

The writer passed a night at a famous hotel on the bank of the Kaspean Sea and returned from Raste to Tehran by Iran Air in the morning. The writer composed a brief history of the Kaspean Sea, a description of passing night and returning Tehran.

20. Iranian Food and Meal :

Here the writer has given a short description about the eating habit of the Iranian people, his two-week staying and enjoying Iranian food.

21. Iranian Women Society :

The writer is very pleased with the way of life of Iranian women society. But he does not like the talebanese life of Afganistan. Afganistan is adjacent with Iran. Another neighbouring country of Iran is Turky. The writer does not like at all the free mixing life of Europe women. Although the writer has faith in Sunni Hanafi, he praises the well behaviour, well-dress and the way of life of Iranian women. Who have faith in Shia. The writer has described it here.

22. Tehran to Dhaka :

The writer returned to Dhaka from Iran via Dubai by Amirat Air. During his staying in Iran he tried to go to Ma'shad. He tried heart and soul for getting any flight but vain. Here the writer has expressed his grief for failure of going to Ma'shad and returned Dhaka and the writer has described it here.

Second Part

The writer visited Iran on the occasion of the death anniversary of the great Imam Khomeni by the heartiest invitation of the government of Islamic Republic of Iran. On the 30th May, Friday in 2008. Mr. Sakhawat Hossain and Ex-commissioner of Chittagong City Corporation Mr. Emdad Ullah were his visiting companion as the previous time.

Mr. Ahmudul Islam Chowdhury stayed at Estiklal Hotel for six days as a state guest by the management of the government of Iran and participated in the state ceremonies. He visited Kerman, Tabriz and Urumia for the next six days with his own efforts.

After reaching Tehran the writer was given a chart of state ceremonies. There he found the setting of programmes for going to Ma'shad at last day on the 4th June and returning to Tehran at night. Going to Ma'shad the writer and his two companions wished to stay there for two nights with a view to zearat with heart content. But it was not possible for them to stay there one or two nights because they did not get any returning ticket in any flight.

THE LIST OF ESSAYS IN SECOND PART

1. Visiting Iran on the occasion of the death anniversary of Imam Khomeni :

The writer and his two companions and other five Bangladeshi guests started for Tehran from Dhaka on the 30th May, Friday in the morning by Gulf Air. They reached Tehran via Bahrain. An official of Iran government welcomed them at Iran Air Port and these eight guests were reached at Estiklal Hotel by the official. The writer composed an elaborate description about it.

2. Participation in the discussion meeting of Imam Khomeni in Tehran :

The writer participated in the recalling discussion meeting of Imam Khomeni with the state-invited guests of the different countries of the world at International Meeting Centre in Tehran. The writer has presented it excellently.

3. Visiting the palace of Shah of Iran and participation at dinner :

The writer visited the palace of Pahlobhi Shah with the guests on Friday, the 1st June and that evening participated at a dinner at Laleh Hotel which was entertained by Imam Hasan Khomeni, the grand son of the great Imam Khomeni. The writer has presented it nicely.

4. Participation at the celebration of the President and zearat in the afternoon:

The writer participated at a discussion meeting in the old parliament building with the guests by the President Ahmadinezad. In the evening the writer and his two companions went to old Tehran with Hamid Kaberi, a famous businessman with a view to zearat of Imamzada. Here the writer has described it.

5. Participation at the mourning meeting of Imam Khomeni :

The writer and the foreigner guests went to the graveyard of the great Imam Khomeni with the millions of Iranian men and women on 3rd June. The writer has presented an elaborate description about it.

6. Visiting Ma'shad for zearat:

The writer and the foreigner guests went to Ma'shad from Tehran by Iran Air and performing zearat of Imam Reza. They returned to Tehran on that flight. The writer had a wish to stay there one or two nights but his wish did not fullfill. The writer has presented it here.

7. Visiting two exceptional park in Tehran :

The writer went to Millat Park on the 5th June, Thursday which is situated near at Estiklal Hotel. He became astonished seeing the busts of 10/12 intellectual persons, philosophers, poets and doctors at the gate of Millat Park. He also visited the attractive Taighitark and composed a beautiful description about it.

8. Tehran to Kerman :

The writer and his two companions went to Kerman from Tehran by the Mahan Air in the afternoon on the 5th June, Thursday and stayed at a hotel. He has presented it here.

9. Zearat to Hazrat Neamot Ullah at Kerman :

The writer went to the old city Royen with his companion on the 6th June, Friday. Reaching Mahan at noon they performed zearat to the saint Neamot Ullah. The saint Hazrat Neamot Ullah is well known in the Indian subcontinent and specially in Bangladesh. In the afternoon the writer visited to Imamzada Hossain and the famous ancient buildings of Kerman City. The writer has described it beautifully.

10. The writer returned Tehran after performing zearat of others :

The writer returned Tehran from Kerman by the Mahan Air Flight on the 7th June, Saturday. He became failure to collect a flight ticket for going from Tehran to Tabreez or Urumia. On the 7th June reaching at Meherabad Air Port in Tehran from Kerman, the writer tried to collect ticket but failed and returned to hotel. Here the writer has tried to compose this story.

11. Tehran to Tabreez :

In the morning on the 8th June, Sunday the writer and his companion started for Tabreez from Tehran by bus and became very weak when reached Tabreez in the afternoon.

We came to know from his writings that being unsuccessful to get a good hotel they had to reside at a poor hotel.

12. Tabreez to Urumia via Maragheh :

The writer went to Urumia via Maragheh Mahbad by the car of Syed Touhidi, a famous businessman of Tabreez and returned to Tabreez in the evening. The writer has composed this description.

13. Tabreez to Istanbul via Tehran :

The writer returned Tehran to Tabreez on Tuesday, 10th June at 10 a.m by the Aseman Air Flight and stayed at 'Mar-Mar Hotel'. The next night he left Tehran for Istanbul. The description of it is composed by the writer.

14. The Kurdi nation and their hospitality :

The writer enjoyed a lunch and dinner at a Kurdi family at Tabreez and Mahbad by a immigrant Bangladeshi doctor and pleased with the hospitality of them. The description of their hospitality is composed here by the writer.

15. The vision of the Shia principles :

Most of the people in Bangladesh think that the people of Shia principles are in wrong faith. Visiting Iran for two times and taking interview from two Ayatullah and a Huzzatul Islam the writer came to a conclusion about their faith and expressed a real picture of the Shia principles to the reader of Bangladesh. The writer thinks that the misunderstanding will be come to an end in some extent by reading this.

16. The influence of Persia in our country:

Phersi was the state language of the Indian subcontinent including Bangladesh for 5/6 centuries. Many Phersi words are used in Bengali language even today. Phersi education is going on even today in religious educational institutions and in higher education which is described excellently to the readers of Bangladesh by the writer.

17. Iran and Imam Khomeni:

After passing the ill-administrative period of Pahlobi father and son Modern and Islamic Republic of Iran is going on ahead by means of the proper leadership of the great Imam Khomeni and the writer has described it here excellently.

At last I wish to say that a writer can draw a real picture of something which is not possible at all by the other famous persons. After the death of Imam Khomeni many Bangladeshi men and women have visited Iran by being state guest or personally. Publishing an overall description about the real facts and real picture of Iran the writer tried to come to an end about the misunderstanding of the faith between the Bangladeshi and Iranian people. It is not known to me that any other writers tried like him about this.

It will be just that the government of Iran will take him to Iran and will give him opportunity so that he can write continuously.

موضوعات کتاب به عنوان «از فارس تا ایران»

جناب آقای احمد الاسلام چودوری از اشراف زادگان چیتاگنگ است. وی نویسنده ی کتاب های گوناگون و مقاله نویس پرتیراژترین روزنامه «پوربوکون» هستند. تعداد مقاله ی ایشان نزدیک به هزار می باشد. وی در سال ۱۹۵۰میلادی در شهر چیتاگنگ چشم به جهان گشود. آقای احمد الاسلام چودوری تأسیس کننده و پشتیبان مؤسسه های مذهبی، رفاه و خیریه هستند. وی به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا مسافرت نموده اند. وی اولین بار در سپتامبر سال ۲۰۰۵میلادی به ایران سفر کرد و باردیگر جهت شرکت در سمینار نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸میلادی به ایران مسافرت نمود. کتاب حاضر حاصل مشاهدات دقیق نویسنده در طول گشت و گذار وی در ایران است.

متفکر اسلامی آقای احمد الاسلام کتاب خود «از فارس تا ایران» را به دو بخش تقسیم بندی کرده است:

فهرست بخش اول

۱- گزارش تاریخ فارس (شامل تاریخ باستان ایران)

۲- حکومت پهلوی (تاریخ دو حاکم سرکش و متمرد پهلوی)

۳- ایران امروزه (گزارش توسعه ی اجتماعی و معیشت ایران)

۴- مسافرت به ایران (گزارش دریافت روادید از داکا و پرواز با هواپیمای امارات متحده عربی از دبی تا ورود به تهران)

۵- ادای نماز جمعه در مسجد مرکزی دانشگاه تهران

۶- زیارتگاه تهران (گزارش زیارت گاه های تهران از جمله مقبره ی امام زاده عبد العظیم، امام زاده صالح، حضرت شهربانو، امام زاده طاهر، امام زاده جعفر و حرم مطهر امام خمینی (ره) وغیره.

۷- حضرت بایزید بسطامی : نویسنده آرامگاه بایزیر بسطامی را که در بسطام سمنان قرار دارد زیارت کرده است. آرامگاه نمادین بایزید بسطامی در شهر چیتاگنگ

بنگلادش هم وجود دارد. بنابر این وی علاقه فراوانی به زیارت آن داشته است. ایشان در این باب زندگانی حضرت بایزید بسطامی را ذکر نموده است.

۸- ازسمنان تا آرامگاه بایزید بسطامی: مؤلف در این فصل چگونگی سفر به سمنان با تاکسی و بازگشت به تهران را در وقت شامگاه بیان کرده است.

۹- زیارت مقبره ی ابو الحسن خرقانی: مؤلف آرامگاه خرقانی را که نزدیک به بسطام قرار دارد، زیارت نموده است. مؤلف در این بخش زندگی نامه ی خرقانی را بیان کرده است.

۱۰- مصاحبه با دو عالم دین (آیت ا...) مشهور : مؤلف همراه تاجر مشهور تهران جناب آقای حمید کبیری به قم رفته و در این سفر با آیت ا... مهدی هروی و آیت ا... مصطفی نجفی پیرامون عقیده ی مذهب شیعه مصاحبه کرد. وی توقع دارد که با انتشار آن مصاحبه دلهای اهل سنت و شیعیان بیش از پیش به هم نزدیک گردد.

۱۱- گفتگو با یکی از رهبران مذهبی ایرانی: مؤلف در سال ۱۹۹۹میلادی برای زیارت خانه ی خدا به مکه و مدینه مشرف شد. در این سفر وی با حجت الاسلام فحیان مصاحبه کرد که به عنوان رایزن فرهنگی ایران در مدینه تشریف آورده بود. در این مصاحبه درمورد عقیده شیعه مباحثی ذکر شده است. وی امیدوار است که پس از چاپ این کتاب در قلمرو مسلمانان بنگالی، سایر مذاهب اسلامی با عقاید شیعه بیشتر آشنا گردند.

۱۲- مسافرت به اصفهان: مؤلف همراه سخاوت حسین با هواپیمای ایران ایر به اصفهان رفت. وی نخست آرامگاه امام زاده را زیارت کرد و پس از آن از جاهای دیدنی و تاریخی اصفهان بازدید کرد. نویسنده دو رزو و یک شب آنجا ماند. وی گزارش سفر اصفهان را در این بخش ذکر کرده است.

۱۳- زیارت آرامگاه حضرت شیخ سعدی شیرازی: مؤلف با هواپیمای ایران ایر از اصفهان به شیراز رفت. در این بخش زیارت آرامگاه شیخ سعدی و زندگی نامه ی آن را بیان کرده است.

۱۴- زیارت و مسافرت به شیراز: مؤلف دو شب در شیراز اقامت کرد و آرامگاه امام زاده شاه چراغ، حافظ شیرازی و خواجوی کرمانی زیارت نمود. پس از آن از جاهای

دیدنی و تاریخی شیراز بازدید کرد و سومین روز با هواپیمای ایران ایر از شیراز به تهران برگشت. گزارش زیارت و بازدید شیراز در این بخش مطرح گردیده است.

۱۵- عالم پزشکی ابن سینا: مؤلف به مسایل موارد تاریخی و طب گیاهی علاقه ی زیادی دارد. بنابر این زندگی نامه ی ابن سینا را در این فصل بیان کرده است.

۱۶- زیارت آرامگاه ابن سینا در همدان: نویسنده در این بخش درباره ی بازدید از آرامگاه ابن سینا و زیارت مقبره های امام زادگان مطالبی آورده است.

۱۷- صرف شام در کوه البرز تهران: تاجر ماهر آقای گلکار مؤلف را همراه دوستش برای صرف شام در دامانه ی کوه برز برد. دمای هوای آنجا بین ۵ تا ۷ درجه کمتر از سطح زمین بود. نویسنده مشاهدات خود را از کوه البرز در این بخش توضیح داده است.

۱۸- زیارت گیلان: مؤلف در صبحگاه با ایران ایر از تهران به گیلان رفت. وی در این سفر آرامگاه امام زاده ابراهیم، امام زاده حریه که در عمق کوه برز قرار دارد و به ویژه آرامگاه حضرت عبد القادر گیلانی و نیز مقبره ی مادرش ام الخیریه را زیارت نموده است. نویسنده گزارش این سفر و زیارت را به خوبی در این فصل ذکر کرده است.

۱۹- یک شب در کنار دریای خزر: مؤلف یک شب در هتلی مجلل در کنار دریای خزر اقامت کرد. صبح روز بعد قصد به تهران حرکت کرد. گزارش این گشت و گذار در این بخش ذکر گردیده است.

۲۰- غذاهای ایرانی: در این بخش نویسنده غذاهای ایرانی را توصیف کرده و در لابلای ذکر آن علاقه ی خودش را هم بیان کرده است.

۲۱- جامعه زنان ایران: نویسنده از معیشت و زندگانی جامعه زنان ایران به نیکی یاد می کند. مؤلف از جامعه زنان برهنه ی اروپا و حتی متعصبان طالبان افغانستان متنفر است. نویسنده در این بخش لباس زنان ایران و رفتار و کردار زنان ایران را بسیار ستایش کرده است.

۲۲- از تهران به داکا: مؤلف پس از اتمام سفر با هواپیمای امارات متحده عربی به داکا برگشت. وی طول این دو هفته خیلی سعی کرد که مشهد مقدس سفر کند

۴- شرکت در مراسم ریاست جمهوری ایران: نویسنده همراه میهمانان جهت شرکت در جلسه ی سخنرانی ریاست جمهور جناب آقای احمدی نژاد به ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی رفت و پس از آن مقبره ی امام زاده را زیارت کرد. شرح این مطالب در این قسمت بیان شده است.

۵- شرکت در مراسم سوگواری امام خمینی: نویسنده همراه میهمانان خارجی در تاریخ سوم ژوئن روز سه شنبه در مراسم سوگواری امام شرکت نمود. نویسنده در این بخش جزئیات این مراسم را به تفصیل توضیح داده است.

۶- زیارت مشهد: نویسنده همراه میهمانان با هواپیمای ایران ایر از تهران به مشهد رفت و پس از زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) با هواپیمای ویژه زودتر از موعد مقرر به تهران برگشت. نویسنده در این قسمت گزارش سفر ناتمام را بیان کرده است.

۷- نویسنده ۵ ژوئن روز پنج شنبه به پارک ملت که نزدیک به هتل استقلال است، رفت. وی از دیدن مجسمه ۱۲ تن از روشنفکران، فلسوفان، شاعران، پزشکان وغیره در درب اصلی آن تحت تأثیر قرار گرفت و پس از آن به یک پارک دیگر رفت. گزارش این گردش ها و مشاهدات در این بخش آمده است.

۸- از تهران به کرمان: نویسنده در تاریخ ۵ ژوئن با هواپیمای ماهان همراه دو نویسنده تهرانی دیگر به کرمان رفت. در این بخش گزارش سفر کرمان بیان گردیده است.

۹- زیارت مرقد شاه نعمت الله ولی: نویسنده با همراهان در تاریخ ۶ ژوئن به شهر قدیم رایان رفت. پس از آن مرقد شاه نعمت الله را زیارت کرد. سپس وی مقبره امام زاده حسین را زیارت کرد و از معماریهای باستانی کرمان شهر بازدید کرد. قابل ذکر است که شاه نعمت الله در شبه قاره هند و بنگلادش هم معروف است.

۱۰- پس از زیارت برگشتن به تهران: نویسنده در تاریخ ۷ ژوئن روز شنبه با هواپیمای ماهان از کرمان به تهران بازگشت. وی به علت نبودن بلیت هواپیما نتوانست از تبریز به ارومیه سفر کند. باردیگر هم سعی کرده بود امام موفق نشده بود. این گزارشها را در این قسمت ذکر نموده است.

اما به دلیل نبودن هواپیما موفق به انجام این سفر نشد. نویسنده در این قمست گزارش پایان این سفر را ذکر نمود.

بخش دوم

نویسنده احمد الاسلام چودوری به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۸میلادی دعوت شده بود. در این سفر مانند سفر قبلی جناب آقای سخاوت حسین و جناب آقای امداد الله، رئیس اداره عمران شهر چیتاگنگ او را همراهی کردند.

آقای احمد الاسلام ۶ روز اول این سفر به عنوان میهمان دولت آن کشور در هتل استقلال اقامت گزید و در برنامه های مختلف شرکت نمود و ۶ روز دیگر با هزینه ی خود به کرمان، تبریز و ارومیه رفته بود.

وی پس از رسیدن به تهران برنامه ی ۶ روزه را دریافت کرد. در آن برنامه قراربود روز چهارم به مشهد بروند اما به علت نبودن بلیت هواپیما آن برنامه منتفی شد و نویسنده این توفیق را از دست داد.

موضوع های مقالات بخش دوم:

۱- سفر به ایران به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی (ره): نویسنده همراه گروه ۸ نفره با هواپیمای طیران الخلیج به تهران رفت. چند نفر از برگزار کنندگان سمینار از میهمانان بنگلادش استقبال کردند و به آنها را به هتل استقلال بردند. جزئیات این مطلب در این بخش ذکر شده است.

۲- شرکت در همایش بین المللی: نویسنده و میهمانان خارجی در تالار بین المللی تهران حضور یافتند. گزارش برگزاری همایش در این قسمت ذکر شده است.

۳- بازدید کاخ شاه تهران و شرکت در ضیافت شام: نویسنده در تاریخ یکم ژوئن همراه میهمانان از کاخ شاه پهلوی بازدید کرد و بعد از ظهر برای میهمانی نوه امام جناب آقای سید حسن خمینی به هتل لاله رفت. گزارش این بازدید و ضیافت در این قسمت آمده است.

در آخر ما می توانیم بگویم که یک نویسنده با نوشته های خود می تواند حقیقت را به تصویر بکشد ولی برای دیگران این کار ناممکن است. پس از رحلت امام خمینی (ره) مردان و زنان بسیاری به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران به ایران سفر کردند. بعضی از مردم بنگلادش شخصًا هم به ایران مسافرت کرد، اما هیچکدام تاکنون گزارشی به سادگی و جامعیت کتاب این نویسنده ارایه نکرده است. کتابی که می تواند مردم بنگلادش را با بسیاری از مشترکات فرهنگی و اجتماعی ایران و بنگلادش آشنا سازد.

امید است جمهوری اسلامی ایران با حمایت مادی و معنوی از این نویسنده ی توانا، موجبات گسترش آثار قلمی وی را فراهم آورد.

ناشر

۱۱- از تهران به تبریز: نویسنده ۸ ژوئن یک شنبه همراه دوستان با اتوبوس از تهران به تبریز رفت و آنجا مریض گردید. در این بخش شرح حال و افسردگی خود را ذکر کرده است.

۱۲- از تبریز به ارومیه: نویسنده با ماشین تاجر تبریز جناب آقای توحیدی اول به مراغه و مهاباد و سپس به ارومیه رفت و موقع عصر به تبریز برگشت. در این قسمت شرح سفر تبریز و ارومیه را بیان کرده است.

۱۳- تبریز به تهران و استانبول: نویسنده در تاریخ ۱۰ ژوئن سه شنبه با هواپیمای آسمان از تبریز به تهران برگشت و در هتل مرمر اقامت گزید. پس از گردش در شهر تهران روز دیگر به قصد استانبول تهران را ترک کرد. نویسنده شرح سفر استانبول را در این بخش بیان کرده است.

۱۴- ملت کرد و پذیرائی آنها: نویسنده در تبریز و مهاباد توسط یک پزشک بنگالی که مقیم آنها است به خانه ی یکی از کردهای آن منطقه جهت صرف ناهار و شام دعوت شد که موجب خوشحالی او گردید. نویسنده مسرت خود را از این مهمانی در این قسمت بیان کرده است.

۱۵- نظرات شیعیان : مردم بنگلادش اکثر با عقاید شیعه به خوبی آشنا نیستند. نویسنده به جهت سفر به ایران و مصاحبه با برخی از عالمان دینی شیعه، مباحثی را در این کتاب مطرح کرده است که با ارائه تصویر واقعی شیعیان بسیاری از سؤ تفاهم ها از میان خواهد رفت.

۱۶- نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در کشور بنگلادش: زبان فارسی تقریبا در طول ۵ یا ۶ قرن زبان رسمی در شبه قاره هند بود. هنوز هم در واژه های بنگلا نفوذ فارسی دیده می شود. زبان و ادبیات فارسی در مؤسسه های مذهبی و دینی و آموزش عالی بنگلادش تدریس می شود. در این بخش نویسنده به خوبی در این باره توضیح داده است.

۱۷- ایران بعد از امام خمینی (ره): نویسنده توانسته است که شکست دادن حکومت سرکش و متمرد پهلوی (پدر و پسر) به رهبری امام روح الله خمینی (ره) به خوبی بیان کند.

পারস্যের ইতিহাসের উপর আলোকপাত

পারস্য বিশ্বের অতি প্রাচীনতম দেশ। এই প্রাচীন পারস্য বর্তমানে ইরান নামে অভিহিত। অতীতে বহু বংশ এখানে রাজত্ব করেছে। পারস্যের সাইরাস, দারায়ুস প্রমুখ সম্রাটের নামে এককালে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত হত। চেঙ্গিস খান, তৈমুর লং-এর সমর নৈপুণ্য দিগদিগন্তে বিঘোষিত হত এবং সে-দেশ শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবে সমুন্নত ছিল। গত শতাব্দীর প্রথমদিকে সে-দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে।

সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী বেষ্টিত একটি মালভূমিই হল পারস্য বা আজকের ইরান। পারস্যে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম এবং শীতে প্রচণ্ড শীত। গ্রীষ্মকালে প্রবলবেগে প্রবাহিত গরম বাতাস এবং শীতকালে ততোধিক বেগে প্রবাহিত বরফ শীতল হাওয়া মানব বসবাসকে কষ্টসাধ্য করে তোলে। মধ্যপ্রাচ্যের বহু অংশ বৃষ্টিহীন বলা যায়। পারস্যের বিশাল বিশাল মরু-প্রবণ এলাকা রয়েছে। তবে ক্যাস্পিয়ান সাগরের নিকটতম এলাকাসহ কিছু কিছু এলাকা বৃষ্টিপাতের কারণে সবুজের সমারোহ থাকলেও আয়তনের দিক দিয়ে মধ্যাঞ্চলের মালভূমি সমগ্র পারস্যের প্রায় অর্ধেক বৃষ্টিহীন বলা যায়। পারস্যের প্রায় সমস্ত অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৫০০ ফুটের বেশী উচ্চতায়। এক-তৃতীয়াংশের উচ্চতা ৬৫০০ ফুটের বেশী। কয়েকটি পর্বতশ্রেণী ইরানের অভ্যন্তরীণ উঁচু উপত্যকাকে ঘিরে আছে।

খ্রিস্ট-পূর্ব ৫৫০ অব্দে সাইরাস কর্তৃক আকিমিনীয় বংশ প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে এ বংশের অধীনে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্মৃতি আজও তথাকার শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকের মনে গর্বের সঞ্চার করে।

'শাহনামা'র ন্যায় জাতীয় মহাকাব্য এবং একটি শৈল্পিক ঐতিহ্য ইরানী সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এই বিশিষ্টতাকে ইরানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে, পারস্যের দীর্ঘ ইতিহাস বংশভিত্তিক শাসনের উত্থান-পতনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তেমনিভাবে ইস্পাহান, হামাদান, তাবরীজ ইত্যাদি শহরগুলোর রয়েছে হাজার হাজার বছরের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস। রয়েছে ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস। আলেকজান্ডার দি গ্রেট, খসরু পারভেজ পারস্যের বিশ্বখ্যাত সম্রাট হিসেবে আজও ইতিহাস-বিজ্ঞানে আলোচনার খোরাক হয়ে রয়েছেন।

৬২৮ খৃস্টাব্দে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী পাক (স.) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের শাসকগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তেমনিভাবে পারস্যের প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট নবী পাক (স.)-এর পবিত্র পত্র নিয়ে বাহক হিসাবে গমন করেন প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোজাইফা (রা.)। কিন্তু নবী পাক (স.)-এর পবিত্র পত্র পেয়ে অন্যান্য শাসকগণ সম্মান করে থাকলেও পারস্যের সম্রাটের দরবারে ঘটে তার ব্যতিক্রম। আরব বেদুঈন দেশের নতুন নবীর (স.) পবিত্র পত্র খসরুর কাছে গাত্রদাহ হয়, পবিত্র পত্রটি টুকরা টুকরা করে বিচ্ছিন্ন করলেন এবং দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

নবী পাক (স.) দূত মারফত যথাযথ সংবাদ শুনে মন্তব্য করলেন – ঐদিন দূরে নয় যেদিন পারস্য টুকরা টুকরা হয়ে ইসলামের পতাকাতলে এসে যাবে। সত্যিই আমিরুল মোমেনিন হযরত ফারুকে আযমের আমলে পারস্য টুকরা টুকরাভাবে ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে।

আমিরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আমলে সূত্রপাত হলেও মূলত হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে পারস্য ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। উমাইয়াদের আমলে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে পূর্বদিকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

দামেস্ক রাজধানীকেন্দ্রিক উমাইয়াদের শোচনীয় পতনের পর বাগদাদ বসে আব্বাসিয়রা পারস্য শাসন করতে থাকেন। তবে আব্বাসীয় শক্তিশালী শাসক খলিফা আল-মনসুর, খলিফা হারুনর রশিদ-এর মতো ক্ষমতাধর শাসকদের বিদায় ঘটে, এসে যান দুর্বল শাসক। আব্বাসীয় এই দুর্বল শাসকের আমল থেকে পারস্য তার নিজস্ব স্বকীয়তা ফিরে পেতে তৎপর হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে পারস্যে বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১২৫৮ সালে আব্বাসীয় বংশের পতনের পর পারস্যে ইলখান বংশের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বংশের পতনের পর পারস্যের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি ছোট ছোট বংশ রাজত্ব করতে থাকে। আমির তাইমুরের অভ্যুদয় ও দিগ্বিজয়ের ফলে সাময়িক ঐক্য স্থাপিত হলেও পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের শাসন ও তাদের পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্ব লেগে ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সাফাভী বংশ এবং এ বংশের প্রধান শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজও ইস্পাহান শহরে শাহ আব্বাসের বহু দৃষ্টিনন্দন বিশাল বিশাল স্থাপনা ভ্রমণকারীদের খোরাক যুগিয়ে রয়েছে। এই শাহ আব্বাস পারস্যের ইতিহাসে আজও একজন বিখ্যাত সম্রাট শাসক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখিত রয়েছে।

সাফাভী বংশের পতনের পর আবার রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৭৯৪ সালে কাজার বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। তবে যান্দ বংশের করিম খান যান্দ (১৭৫০-১৭৭৯) কিছুদিনের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজার বংশের সময় থেকে পারস্যে আধুনিক যুগের সূচনা বলা যায়। এ কাজার বংশ ১৭৯৪ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল একনাগাড়ে পারস্য শাসন করেন।

তারা হলেন, আগা মুহাম্মদ শাহ (১৭৯৪-১৭৯৭), ফাতেহ আলী শাহ (১৭৯৭-১৮৩৪), মুহাম্মদ শাহ (১৮৩৪-১৮৪৮), নাসির উদ্দীন শাহ (১৮৪৮-১৮৯৬), মুজাফ্ফর উদ্দীন শাহ (১৮৯৬-১৯০৭), মুহাম্মদ আলী শাহ (১৯০৭-১৯০৯), আহমদ শাহ (১৯০৯-১৯২৫) সাল পর্যন্ত।

কাজার বংশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পারস্যের আর্থিকসহ নানান প্রতিকূলতা ছিল। ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার অভাব।

তবে কাজার বংশের আমলে পারস্যের যেমনি নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয় তেমনি একদিকে রাশিয়া অপরদিকে ইউরোপ প্রভাব বিস্তারের সাথে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে দেয় প্রবলভাবে। কাজার বংশের শেষ শাসক আহমদ শাহ পারস্যের নেতৃত্ব রক্ষায় নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হন, বিশেষ করে রুশ ও ইংরেজদের কারণে। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বহুলাংশে বেড়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে পারস্যে বিদেশী সৈন্যদের উপস্থিতি সে-দেশকে আরও নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। এমনকি রাশিয়া, বৃটিশ পারস্যকে গ্রাস করার মতলবে তাদের দূরত্ব কমিয়ে সমঝোতায় পৌঁছে। সাথে সাথে দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে কঠোরতা অবলম্বন করেও সম্রাট বারেবারে ব্যর্থ হন। এই প্রতিকূল সময়ে জেনারেল রেজা খান দ্রুত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছে যান।

রেজা খান সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন। তিনি সাজেন্দ্রানে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী। দেশের নাজুক অবস্থায় তার বাহিনী সহযোগে ১৯২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজধানী দখল করে নেন এবং নিজে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ও যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এতে দ্রুত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯২৩ সালে রেজা খান প্রধানমন্ত্রী হন। কাজার বংশের শেষ শাসক অতি বিলাসী আহমদ শাহ প্রায় সময় ইউরোপ যাওয়া-আসা করতেন। এ সুযোগে ১৯২৪ সালের ২১ অক্টোবর কাজার বংশের শেষ শাসক আহমদ শাহকে বরখাস্ত করা হয় এবং সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রেজা শাহ নিজেকে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসের পাতায় বিজড়িত পাহলভী বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে নিজে পারস্যের এককভাবে বাদশাহী ক্ষমতার মসনদে বসে যান।

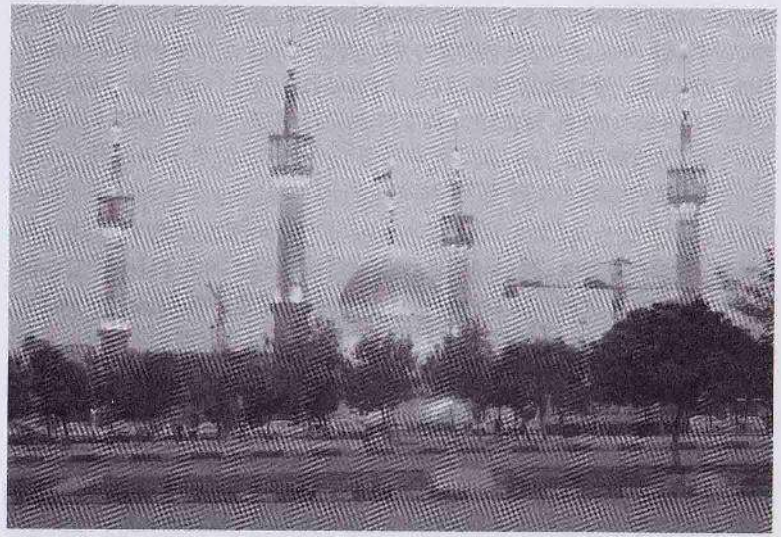

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মাজার কমপ্লেক্স

অপরদিকে, আমাদের উপমহাদেশের শত শত বছরের শাসন আমল ছিল দিল্লীকেন্দ্রিক সুলতানী ও মোগল আমলে। তাদেরই ভাষা তথা পারসী ভাষা উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়ে যায়। এই উপমহাদেশে ফারস্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। পারস্যের অসংখ্য ধর্ম প্রচারক, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা এই উপমহাদেশে আগমন করেন। বহু অলি-দরবেশ এদেশে আগমন করে থেকে যান। আজও পারস্যের বহু অলি-দরবেশের মাজার উপমহাদেশে বিদ্যমান। উপমহাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ফারসি ভাষা বিশেষ স্থান দখল করে নেয়।

বৃটিশ আমলে এই উপমহাদেশে ইংরেজের পাশাপাশি ফারসীও সমান্তরালে চালু ছিল। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর আমাদের এই অঞ্চলে ফারসীকে ডিঙ্গিয়ে উর্দু প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ফারসী ও উর্দু অনেকটা গৌণ হয়ে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চালু হয়ে যায়।

পাহলভী শাসন

১৯২৫ সালের ২১ অক্টোবর জেনারেল রেজা খান পাহলভী পারস্যের বাদশাহী পদে বসেন। এর আগেই তিনি যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর বাদশাহী পাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। তিনি পর্যায়ক্রমে পারস্যকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন এবং পারস্যের নানান সংস্কার করতে তৎপর হন। ১৯২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর রেজা খানকে শাহ বলে ঘোষণা করা হয়।

তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের সেকুলার ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে রেজা খান শংকিত হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ইরানে যাতে প্রজাতন্ত্র প্রতিহত করা যায় সে উদ্দেশ্যে নিজেকে শাহ উপাধি ধারণ করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন সাবেক শাসকগণের অনুকরণে। যদিও কামাল আতাতুর্কের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইরানের রেজা খানের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা কাছাকাছি ছিল।

১৯৩৮ সালে পুরাতন প্রদেশগুলির অবসান ঘটায়ে সমগ্র ইরানকে ১৩টি প্রদেশে (উসতান) ভাগ করেন। প্রতিটি প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় (শাহবিস্তান) এবং প্রতিটি জেলাকে কয়েকটি মহকুমায় (বখস বা দিহিস্তান) ভাগ করা হয়। এর আগে, ১৯২৮ সালে তিনি ইরানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন করেন। সমগ্র ইরানে সড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ব্যাপকভাবে তেল উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ করেন। ইরানের হাজার হাজার বছর বা শত শত বছরের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষমতা খর্ব করতে শুরু করেন। যেমন : ১৯৩০ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যিক স্থলে নৈর্বাচনিক করেন। ১৯২৭ সালে বিচার মন্ত্রণালয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের নিকট হতে আধুনিক আইন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিকট অর্পিত হয়।

আগে ইরানে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ তথা মোল্লা মুযতাহিদগণই শিক্ষাদান করবার একমাত্র বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতেন। কিন্তু তাঁর আমলে নানান আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠালাভ করে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের অধিকার খর্ব করা হয়। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত বাড়তে থাকায় সমগ্র ইরানে দ্রুত আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে থাকে। ১৯২৮ সালে বিদেশী নাগরিকের বিশেষ সুবিধা রহিত করা হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে নতুন আইন করা হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে ১৯৩১ সালে শরীয়াহ্ আইন বাদ দিয়ে আধুনিক আইন প্রবর্তন করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের শত শত বছরের পর্দা প্রথা ইরানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় দ্রুত বিলোপের দিকে যেতে থাকে। এমনি অবস্থার সুযোগে ১৯২৮ সালে ইরানের ধর্মীয় শহর কূম (Qom)-এ অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে শাহ বানুর মুখাবরণ অকস্মাৎ অপসারিত হয়। শাহ বানুর এ অশোভন আচরণের জন্য কূম-এর ধর্মীয় নেতা প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। এ সংবাদে শাহ ক্ষুব্ধ হন এবং পরদিন কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ কূমে উপস্থিত হন। বুট জুতা পরিহিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে উক্ত ধর্মীয় নেতাকে বেত্রাঘাত করেন।

শাহ বানুর মুখাবরণ অপসারণের সংবাদ সমগ্র ইরানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর মহিলাগণ বোরকা ত্যাগ করে আধুনিক পোশাক পরিধান করতে থাকে। দ্রুত সাধারণ মহিলাগণ বোরকা ত্যাগ করে আধুনিক পোশাক গ্রহণ করে নেয়। এতে করে প্রাচীন পন্থী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের চেয়ে থাকা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। মাশাদে এ পর্দাপ্রথা রহিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু শাহ বাহিনী দৃঢ়তার সাথে বিদ্রোহ দমন করেন।

ধর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার পরিধি সংকুচিত হওয়ার সাথে সাথে ইরানে ইউরোপের আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে থাকে। ফলে ইরানীদের জীবনযাত্রায় শত বছরের ধর্মীয় প্রভাব খর্ব হয়ে যায়।

রেজা শাহ ক্ষমতা দখলের সময় বৃটেনের প্রভাব ছিল। তেমনি একটি চুক্তিও ছিল। ফলে রেজা শাহ-এর মাধ্যমে বৃটিশ ইরান হতে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। পরবর্তীতে রেজা শাহ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃটেনের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য হন। রাশিয়া ও জার্মানীর সাথে শাহ রেজার সম্পর্ক উল্লেখ করার মত।

উপকার ও ঘটনার সংমিশ্রণে লিখিত 'শাহনামা'র লেখক ফেরদৌসীর সমাধিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয় এবং 'শাহনামা'কে ইরানের শ্রেষ্ঠ দলিল বলে মনে করা হতে থাকে। পারস্যের বৃহত্তর অংশ আজকের ইরান। ১৯৩৫ সালে পারস্য থেকে ইরান নামকরণ করা হয়।

রেজা শাহ ১৯৩৯ সালে তাঁর পুত্র শাহ মুহাম্মদ রেজা পাহলভীর সহিত মিশরের বাদশা ফারুকের ভগ্নী ফৌজিয়ার সাথে বিবাহ করান। এর দুই বছর পূর্বে ১৯৩৭ সালে তুরস্ক, ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সাদাবাদ চুক্তি সম্পাদনে শাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যদিওবা শাত-ইল-আরব নিয়ে ইরান-ইরাকের মধ্যে বিরোধ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রেজা শাহ-এর কাল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেও জার্মানীর প্রভাব খর্ব হয়নি। ১৯৪১ সালের জুনে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বৃটিশ ও রাশিয়া ইরানকে চাপ দিতে থাকে জার্মানীর লোকজনকে ইরান থেকে

বহিস্কার করে জার্মানীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। কিন্তু ইরান বৃটেন-রাশিয়ার কথা রক্ষা না করায় ১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট বৃটেন-রাশিয়া ইরান আক্রমণ করে সহজে দখল করে নেয়। ইরানের উত্তরাংশ রাশিয়া এবং দক্ষিণাংশ বৃটেন দখল করে। নিকটতম এলাকাসহ রাজধানী তেহরান নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষিত হয়। দুই দখলকারীর চাপে রেজা শাহ তার যুবক পুত্র মুহাম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে বাধ্য হন। সে-দেশে তিন বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

বৃটেন-রাশিয়া রেজা শাহের পুত্র মুহাম্মদ রেজা শাহের সরকারকে স্বীকার করে নেয় এবং এই সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ইচ্ছামত, তবে ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু বৃটেন ও রাশিয়া তথা মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী ইরানে অবস্থান করতে পারবে। এতে ইরান স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও মূলত বৃটেন-রাশিয়ার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমেরিকা বৃটেনের মাধ্যমে ইরানে নাক গলাতে শুরু করে। ফলে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ইরানে একত্রে কাজ করলেও ইরানে রাশিয়ার কার্যকলাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনঃপূত হচ্ছিল না।

তবে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মিত্রপক্ষের তিন বৃহৎ শক্তি বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানগণ যুদ্ধ পর্যালোচনার জন্য তেহরানে মিলিত হন। চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন এই বৈঠকে ইরানের আত্মমর্যাদা বহাল রাখতে একমত পোষণ করেন।

কিন্তু দক্ষ রেজা শাহের দেশত্যাগ ও বিদেশী বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইরানে অবস্থান করায় ইরান দারুণভাবে অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হয়। অপরদিকে, চরমপন্থী রাজনীতি জেগে উঠে। ইরানে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দেয়। দেশ অরাজক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। দুই বড় শক্তির মাঝে বৃটেন কর্তৃক ইরানী ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য গুদামজাত করার মনোভাব এ দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকাংশে দায়ী বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতিও ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে।

পরবর্তীতে ইরান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সৈন্য নিয়ে সরে পড়লেও রাশিয়া সহজে যেতে চাইছিল না। কিন্তু স্বস্তি পরিষদের বারংবার চাপে রাশিয়া ইরানের সাথে সুবিধাজনক ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি করে শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে ইরান আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অপরদিকে ইরান পর্যায়ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে ইরান রাশিয়ার সাথে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করেও রাশিয়াকে তেমন বেশী সুবিধা না দিয়ে চুক্তি থেকে সরে আসে।

ইরানের সাথে মার্কিনের সামরিক ও অর্থনৈতিক নানান চুক্তিতে রাশিয়া অসন্তুষ্ট হলেও করার তেমন কিছুই ছিল না প্রচার বাদে।

ইরানে মার্কিনীসহ পশ্চিমা প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাদের আচার আচরণ অনুকরণের দিকে ধাবিত হওয়ায় ইরানের সচেতন মহলে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। সাথে সাথে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ জেগে উঠতে থাকেন।

এখানে উল্লেখ্য, তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের আধুনিকতায় নানান সংস্কারেও গণতন্ত্র কাজ করছিল। অপরদিকে ইরানে আধুনিকতায় ভরপুর পাশ্চাত্য অনুকরণ হলেও রাজতন্ত্র বহাল ছিল ও আছে।

তবে তুরস্ক ও ইরানের ভৌগলিক অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তুরস্কের অবস্থান ইউরোপ সংলগ্ন। সে কারণে তুর্কীর মন-মানসিকতায় ইউরোপীয় প্রভাব সহজে পড়তে পারে। অপরদিকে ইরান বা পারস্যের অবস্থান ভিন্ন। একদিকে আরব রাষ্ট্র অপরদিকে পশ্তু, পাঞ্জাবীসহ মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থান। পারস্যের ইতিহাস ও তুরস্কের ইতিহাসের মধ্যেও নানান পার্থক্য ছিল। ফলে কামাল আতাতুর্ক যেভাবে তুর্কীদের মগজ ধোলাই করতে পেরেছেন সেভাবে দুই শাহ-এর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি প্রায় ৫০ বছরের অধিককাল শাসন করেও।

১৯৫৩ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে শাহ-এর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র শাহ-এর পক্ষের সেনাবাহিনী বানচাল করে দেয়। সামরিক-বেসামরিক বহু অফিসার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। শাহ দৃঢ়ভাবে সবকিছু মোকাবেলা করে যান। পরবর্তীতে ইরান মার্কিন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে আরো ক'টি চুক্তি স্বাক্ষর করে ক্ষমতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে।

তবে ইরানের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল কারণ তেলখাতে ধারণাতীত আয় বৃদ্ধি। এতে ইরান দ্রুততার সাথে গরিবী অবস্থা কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছলতা ফিরে পায়। সাথে সাথে শাহও রাষ্ট্রীয় সম্পদে ভাগ বসাতে শুরু করেন।

১৯৫১ সালের মার্চে মজলিশ তেল সম্পদ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এপ্রিলে জাতীয় ফ্রন্ট নেতা ড. মোহাম্মদ মুসাদ্দিক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

কিন্তু ড. মুসাদ্দিক-এর পক্ষে অত সহজে তেল শিল্পে ইরানের স্বার্থ প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। এদিকে বৃটিশ ও মার্কিন অর্থে ড. মুসাদ্দিক ও জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চলতে থাকে। দেশে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শাহ সাময়িকভাবে দেশের বাইরে চলে যান এবং ১৯৫৩ সালের আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থানে ড. মুসাদ্দিক ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হন। শাহ দেশে ফিরে আসেন। অনেকে এসব বিষয়ে পশ্চিমাদের নাটক বলে থাকে, ইরানে তেলশিল্প কুক্ষিগত করার মতলবে। দীর্ঘদিন যাবৎ শাহ দেশ পরিচালনার পর পর্যায়ক্রমে দেশে শাহ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। অবশ্য এর পিছনে মদ, নেশা, জুয়া, অশ্লীল পুস্তক, সিনেমা, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা, অসংখ্য পতিতালয় সৃষ্টি, ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্ব শাহ বিরোধী হতে ইরানী জনগণকে উৎসাহ যোগায়।

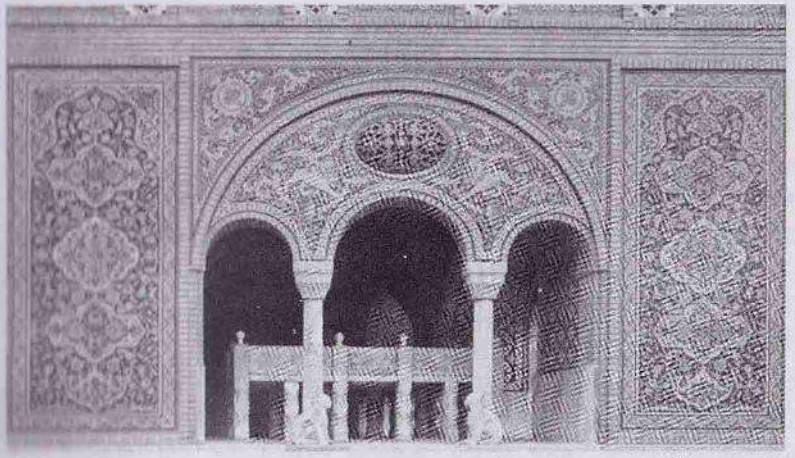

তেহরানস্থ গোলেস্তান প্রাসাদসমূহের একটির সম্মুখভাগ

সমগ্র ইরানে শাহ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকলেও শাহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাগে পেতে তৎপর থাকেন। বিশেষভাবে ১৭টি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর বৃহত্তর অংশের মালিক পাহলভী বংশের সদস্যগণ। ২৫টি লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মালিকও তারা। খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বাজারজাত করার আটটি কোম্পানীর মালিকও শাহ গোষ্ঠী। ২৩টি খাদ্য প্রস্তুত কারখানাও তাদের মালিকানাধীন। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ২৬টি প্রতিষ্ঠানের মালিকও তারা। ইরানের প্রত্যেকটি বড় বড় হোটেলের মালিকানার বড় অংশ পাহলভী বংশের হাতে। ঠিকাদারী কোম্পানী, মার্কিনীদের সাথে বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যে পাহলভী গোষ্ঠী জড়িত।

এখানে উল্লেখ্য, উপসাগরীয় আরব রাজতন্ত্র আর ইরানের রাজতন্ত্র এক নয়। ইরানের তখনকার প্রায় ৫/৬ কোটি জনগণের মধ্যে বেশীরভাগ শিক্ষিত ও সচেতন। অতএব, উপসাগরীয় আরব দেশের রাজতন্ত্র আর ইরানের রাজতন্ত্র ভিন্ন। কাজেই শাহ-এর গোষ্ঠী রাজতন্ত্রের অজুহাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুপে চুপে খেতে থাকলেও ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর যোগ্য নেতৃত্বে বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়নি। ইরান শিয়া অধ্যুষিত দেশ। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুরস্ক সীমান্তের সুন্নী বাদে সারা ইরান শিয়া অধ্যুষিত। তাদের ঈমানী প্রেরণা প্রবল, তেমনি সাহসীও বলা যায়।

১৯৬০-এর দশকের পর থেকে বিপ্লব জাগ্রত হওয়ায় শাহ সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে দমন করতে গিয়ে ভুল করে বসেন। ফলে পর্যায়ক্রমে বিপ্লবীদের ক্ষমতা আরো বাড়তে থাকে। বছর বছর শাহ বিরোধী আন্দোলন বাড়তি ছাড়া কমতি ছিল না। যদিওবা দমন নীতির কারণে সাময়িক স্তিমিত হতো। এই বিপ্লবের মূলে ছিল ছাত্র সমাজ। এতে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের ভূমিকা কম বলা যাবে না। তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিখ্যাত আয়াতুল্লাহগণ এবং সবার উপরে ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনী।

অবশ্য, এর আগেই অর্থাৎ ১৯৬৪ সনে খোমেনী দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। খোমেনী ইরাক ও তুরস্কে ১৪ বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে ১৯৭৮ সালে ফ্রান্সে চলে যান। শাহ-এর দমননীতির কারণে আরো অনেক ধর্মীয় নেতা ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু শাহ মার্কিনী ও সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে দমননীতি চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে লাভের স্থলে ক্ষতি হতে থাকে। যতই দিন যায় ততই বিপ্লবের আগুন বাড়তে থাকে। প্রতিদিন অসংখ্য ছাত্র-জনতা নিহত বা আহত হতে থাকে। শাহ সামরিক বাহিনীকে হাতে রাখতে তাদেরকে নানান সুযোগ সুবিধা দিয়েও পার পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত শাহ সামরিক আইন জারী করেন কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিল না।

সারা ইরানের ছাত্র-জনতা শাহ-এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় মার্কিনীদের পরামর্শে শাহ্পুর বখতেয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে শাহ সপরিবারে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী বিদেশে চলে যান। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ড শাহকে আশ্রয় দিতে রাজী না হওয়ায় শাহ কিছুদিন মিসর হয়ে মরক্কোতে কাটান। অতঃপর নিরাপত্তার খাতিরে মেক্সিকো যান। ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে চিকিৎসার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেলে তেহরানের বিপ্লবী ছাত্ররা আমেরিকান দূতাবাস দখল করে ৬২ জন মার্কিন কুটনৈতিককে জিম্মি হিসেবে আটক করে রাখে।

অবস্থা বেগতিক দেখে যুক্তরাষ্ট্র শাহকে পানামায় পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পানামায়ও নিরাপত্তা না থাকায় ১৯৮০ সালে মিসরে আসলে তথায় শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং পারস্য বা আজকের ইরানের দীর্ঘ ২৫০০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

এদিকে, শাহ্পুর বখতিয়ার প্রধানমন্ত্রী থেকেও দেশকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সামরিক বাহিনীতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শাহ-এর অবর্তমানে শাহ্পুর বখতিয়ার বাহিনী ও ছাত্র-জনতার মধ্যে বহুস্থানে বারেবারে সংঘর্ষ হতে থাকে। অপরদিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে খোমেনী ইরানে নানান দিকনির্দেশনা পাঠাচ্ছিলেন এবং এয়ার ফ্রান্সের বিশেষ বিমানে শাহ্পুর বখতিয়ারের নিষেধাজ্ঞা, বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে তেহরান চলে আসেন ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-৪০ মিনিটে। আয়াতুল্লাহ খোমেনী তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দসহ তেহরান বিমান বন্দরে অবতরণকালে লক্ষ লক্ষ জনতা তাঁকে স্বাগত জানায়। খোমেনীর নির্দেশে ৫ ফেব্রুয়ারী মেহদী বাজারগানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। কয়েকদিন ইরানে দ্বৈত সরকার বিরাজ করলেও ১১ ফেব্রুয়ারী শাহ্পুর বখতিয়ার পদত্যাগ করে আত্মগোপন করেন।

ইরানে খোমেনীর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার চালু হয়। ২৫০০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। অবসান হয় পাহলভী বংশের পিতা-পুত্র দুই শাহ-এর শাসনকাল।

আজকের ইরান

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে আয়াতুল্লাহ খোমেনী ফ্রান্স থেকে ইরানে ফিরে আসেন। এতে ইরানে ২৫০০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। তবে খোমেনীর নেতৃত্বে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে আরো এক যুগ পার হয়ে যায়। খোমেনীর বড় সার্থকতা ও সাফল্য হল তিনি নিজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাঁর নির্দেশে সবকিছু পরিচালিত হত। তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা ছিলেন। খোমেনীর নির্দেশে মেহেদী বাজারগান প্রথম সরকার গঠন করেন এবং শাহ-এর শাহ্পুর বখতেয়ার সরকার বিদায় নেন।

ইরানে সরকার গঠিত হলেও মূল ক্ষমতা সত্যিকার অর্থে ১৫ সদস্যের ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের কাছে রয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে খোমেনী ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। বিপ্লবী পরিষদের ক্ষমতার দাপটের কারণে নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাজারগান বিদায় নেন।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে এক গণভোটে ইরানে বর্তমান খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়। এতে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং ইমামগণের অসাধারণ ক্ষমতার ভিত শক্ত হয়।

১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে আবুল আহসান বনি সদর ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মার্চ মাসে মজলিশে (ইরানী সংসদ) নির্বাচনে ইসলামী বিপ্লবী দল বিজয়ী হয়। বনি সদর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোহাম্মদ আলী রাজাইকে ইরানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দ্বন্দ্বের কারণে ইরানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী খোমেনী প্রেসিডেন্ট বনি সদরকে বরখাস্ত করেন। ফলে বনি সদর গোপনে পালিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসময় তিন সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছিল।

১৯৮১ সালের জুন মাসে ইসলামী বিপ্লবী দলের প্রধান কার্যালয়ে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ইরানের প্রধান বিচারপতি ও ইসলামী বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা আয়াতুল্লাহ বেহেস্তী, চারজন কেবিনেট মন্ত্রী, ছয়জন উপমন্ত্রী, ২১ জন সাংসদ নিহত হন আরো অনেকের সাথে।

১৯৮১ সালের আগস্টে আর এক বোমা বিস্ফোরণে তখনকার প্রেসিডেন্ট রাজাই এবং প্রধানমন্ত্রী বাহোনুর নিহত হন অনেকের সাথে। ১৯৮১ সালের অক্টোবরে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে হুজ্জাতুল ইসলাম আলী খামেনী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মীর হুয়ায়েন মুসাবী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে নির্ধারিত হয়, যে নির্বাচিত একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ ইমাম খোমেনী মারা গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করবে। এতে মোন্তাজারিকে খোমেনীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে কম্যুনিস্ট তুদেহ পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়।

১৯৮৪ সালে এপ্রিল ও মে মাসে মজলিশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালের এপ্রিলে মনমানসিকতা ও বক্তব্য-বিবৃতিতে বিপ্লবীদের বিরোধী হওয়ায় মোনতাজারীকে ইমাম খোমেনীর উত্তরাধিকারী ও ভাবী ওয়ালী ফকিহ হতে পদত্যাগ করতে হয়।

কুখ্যাত সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন ইমাম খোমেনী। এতে ইরানের সাথে বৃটেনের সম্পর্কের অবনতি হয়। কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

১৯৮৯ সালের ৩ জুন ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী ১০ বছর ইরান শাসন করে বিশাল জনপ্রিয়তার মাঝে ইন্তেকাল করেন। তেহরান মহানগরীর উপকণ্ঠে বিশাল এলাকার মাঝে তাঁকে সমাহিত করা হয়। খোমেনীর ইন্তেকালের পরদিন ইরানের সর্বোচ্চ পদবী ইমাম হিসাবে অর্থাৎ খোমেনীর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী নিয়োগ লাভ করেন। (জন্ম ১৫ জুলাই ১৯৩৯ সাল, মাসাদে)।

১৯৭৯ সালে শাহ-এর পলায়ন ও বিপ্লবীদের ক্ষমতা দখলের পর থেকে খোমেনীর নেতৃত্বে ধর্মীয় বিপ্লবীরাই ইরান নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং সংবিধান মতেও বিপ্লবী পরিষদের কথা বলা আছে। ধর্মীয় বিপ্লবীগণই মূলত সংবিধান রচনা করেন এবং গণভোটে তা গৃহীত হয়। কিন্তু সংবিধান মতে ইরানে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ রয়েছে। রয়েছে সাংসদ বা মজলিশ, কিন্তু মূল ক্ষমতা ধর্মীয় পরিষদের হাতে থেকে গেছে এবং ধর্মীয় পরিষদে মূল ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন খোমেনী। খোমেনীর ইন্তেকাল পরবর্তী তাঁরই উত্তরাধিকারী আলী খামেনী।

ইরানের সরকারে, মজলিশে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মাঝে সুন্নীদের কোন প্রভাবের প্রশ্নই আসে না। এমনকি তেহরানে কোন প্রসিদ্ধ সুন্নী মসজিদও নেই।

শাহ-পন্থীদেরকে পাইকারীভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে। এতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ রয়েছেন। এসব বিচার কাজে সরকারের চেয়ে থাকা বাদে গত্যন্তর ছিল না। সরকারের কেউ এদিক সেদিক

বললে তাকে বিদায় নিতে হবে। যেমনটা হয়েছে বারবার। এমনকি খোমেনীর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হওয়া মোন্তাজারীকেও বিদায় নিতে হয় খোমেনী বা খোমেনী-পন্থীদের কাজে নানান মন্তব্য করায়। বিদায় নিতে হয়েছে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে।

বিপ্লবের পর থেকে ইরান নানা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়। এই প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রায় ৫/৭ বছর যাবৎ শুদ্ধি অভিযান চলতে থাকে। এতে বিপ্লবের প্রতিপক্ষ চিরতরে না হলেও দীর্ঘদিনের জন্য ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে বলা যায় এবং খোমেনীর অনুসারীরা বর্তমানে শত্রুমুক্ত বলা যায়।

বিপ্লবীরা প্রথম প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে কুর্দীদের নিয়ে। ইরাক কুর্দীদেরকে উস্কানী দিচ্ছে বলে প্রচার পাচ্ছে এবং কুর্দীরা ইরান সীমান্তে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে অস্ত্র হাতে নিচ্ছে। কিন্তু ইরানের বিশাল বাহিনী ও বিপ্লবী গার্ড কুর্দী দমনে বেশী বেগ পেতে হয় না। ইরান দ্বিতীয় বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় যখন ইরাক একতরফা শাত-ইল-আরব নৌপথ দখল করে নেয়। শাত-ইল-আরব নৌপথ ইরাকের একক দাবী হলেও ১৯৭৫ সালের চুক্তিমত নদীর মাঝখানে সীমান্ত চিহ্ন স্থির হয়। কিন্তু ইরানের প্রতিকূল অবস্থার সুযোগে ইরাক শাত-ইল-আরব দখল করায় বিপ্লবী গার্ডরা বসে থাকেনি। এতে অনিবার্য যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ফোরাত ও দাজলা নদীদ্বয়ের মিলিত ধারা প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ কি. মি. পর্যন্ত ইরাক-ইরান সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত হয়। ইরাকের দাবী হল দু'নদী ইরাকের অভ্যন্তরভাগ হতে প্রবাহিত। অতএব, মিলিত ধারা ইরান সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হলেও ইরানের দাবী থাকবে না। অপরদিকে, ইরানের দাবী হল দু'নদী ইরাক থেকে আগত হলেও মিলিত ধারা ইরান সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত নিম্নায় প্রবাহের মাঝখানে সীমান্ত বা সীমানা হওয়া আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি।

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রের হাত রয়েছে বলে মনে করা হয়। ইরানী বিপ্লবী সরকার রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকায় পশ্চিমা দেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও আরব রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করতে থাকে। ইরান-ইরাক যুদ্ধে আরবরা ইরাককে খোলামেলা নানান সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধে ইরাক ইরানকে পরাজিত করে শাত-ইল-আরব দখল করে ইরানের অভ্যন্তরে খোররম শহর দখল করে কারুন নদী অতিক্রম করে আহওয়াজ ও দেজফুলের দিকে অগ্রসর হয়। ইরাকী বাহিনীর অপরাংশ আবাদান অবরোধ করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে থাকে। ইরাকের একতরফা এই সাফল্য প্রায় বছরকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। বিপ্লব-উত্তর বিশৃঙ্খলার দরুণ ইরান প্রথমদিকে সুবিধা করতে না পারলেও সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী গার্ডদের সাজিয়ে

সংঘবদ্ধ হয়ে পাল্টা আঘাত হানতে থাকে ইরান। এতে ইরাক পিছু হটতে শুরু করে। এখানে উল্লেখ্য, ইরানের প্রায় সমস্ত অস্ত্র, শাহ কর্তৃক আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত। ফলে আমেরিকা তার দূতাবাস দখল করা কুটনৈতিকদের মুক্ত করতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম অতি গোপনে ইরানকে প্রদান করে। যদিও এই সংবাদের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ইরানের পাল্টা হামলায় ইরাক পিছু হটতে হটতে ইরানের দখল করা সমস্ত ভূখণ্ড ছেড়ে শাত-ইল-আরব ছেড়ে ইরাকের অভ্যন্তরে চলে যেতে হয়। ইরানী বাহিনী ইরাকী বাহিনীকে আরো পিছু হঠায়ে দেয়।

বছরকাল ইরানের প্রাধান্য বিস্তারের পর যুদ্ধে সমতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। তখন থেকে ইরাক বারেবারে যুদ্ধবিরতি কামনা করতে থাকে। কিন্তু ইরান তা মানতে রাজী হচ্ছিল না, ইরাক কর্তৃক একতরফা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার কারণে। ওআইসি, জোটনিরপেক্ষসহ নানান পক্ষের প্রচেষ্টা বিফলে যায়। ৭ বছর ১১ মাস ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলিম শহীদ হন। জাতিসংঘ মহাসচিব প্যারেজ ডি কুয়েলারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যুদ্ধবিরতিতে ইরান সম্মত হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হয়ে যায়। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে উভয় মুসলিম দেশে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হলেও এর জন্য একমাত্র দায়ী যে সাদ্দাম হোসেন মনে হয় তাতে কারো দ্বিমত নেই।

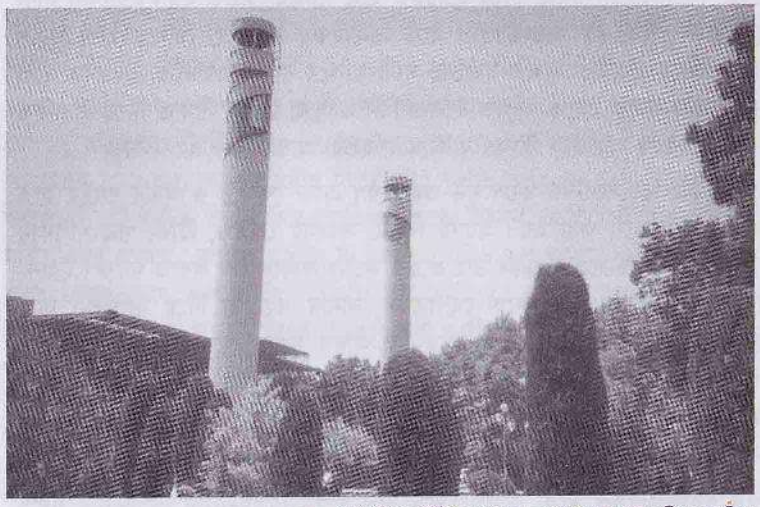

তেহরান ইউনিভার্সিটি মসজিদ তথা ইরানের কেন্দ্রীয় মসজিদ

১৯৮৮ সালের ২০ আগস্ট ৭ বছর ১১ মাসের ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ইরানের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে শুরু করে। ইরান দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে থাকে। তেল রপ্তানীতে বিশাল রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি ইরান শিল্পেও ধারণাতীত সাফল্য লাভ করে। ইরান দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকায় পশ্চিমা বিশ্বের কাছে তাক লেগে যায়।

তার মূলে ৬ কোটি নাগরিকের দেশপ্রেম, সততা, যোগ্যতা, কর্মস্পৃহা। বাংলাদেশের প্রায় ১০ গুণ বড় আয়তনের অর্থাৎ ১৬,৪৮,০০৭ বর্গকিলোমিটারের ইরানের ১৯৯৭ সালের আদমশুমারী মতে ৬,৭৫,৪০,০০০ নর-নারী ইরানে রয়েছে। ইরানে বর্তমানে শতকরা ৯০%-এর উপরে শিক্ষিত। এতে পুরুষের চেয়ে নারীরা এগিয়ে। ইরানীদের যেমনি দেশপ্রেম তেমনি তারা অতি বিলাসী নয় বলা যায়। উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রের মত বিদেশী লোকবল নির্ভরশীল যেমনি নয় তেমনি এই উপমহাদেশের মত অতি ঘনবসতি ও বেকার সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে না ইরানকে। অর্থাৎ যেমনি ইরানের পরিধি তেমনি জনবসতি।

মুসলিম বিশ্বের সাথে ইরানের বড় ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সরকার রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র। রাজতন্ত্র হলে রাষ্ট্রের বিশাল অংকের সম্পদ রাজপরিবার কুক্ষিগত করতে ইতঃস্তত করে না। রাষ্ট্রের সম্পদকে রাজপরিবার নিজেদের সম্পদ মনে করে ভোগবিলাসের সাথে বিদেশী ব্যাংকে সম্পদের পাহাড় গড়তে তৎপর থাকে রাজতন্ত্র হারানোর ভয়ে।

অপরদিকে, গণতান্ত্রিক দেশগুলো গণতন্ত্রের আবরণে সরকার গঠিত হলেও স্বৈরশাসন মুসলিম বিশ্বে স্বাভাবিক ব্যাপার এবং স্বৈরশাসনের আড়ালে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রী-সাংসদসহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ করে বিলাসবহুল জীবন যাপনে মত্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে বিদেশী ব্যাংকে সম্পদের পাহাড় গড়তে সচেষ্ট থাকে। ক্ষমতা হারালে যাতে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়। সাধারণ পরিবার থেকে আসলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের আগে সাধারণ জীবন যাপন করলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে তা বেমালুম ভুলে যায়।

কাজেই রাজতন্ত্রের দেশ হোক বা গণতন্ত্রের দেশ হোক এই দু'অবস্থায়ও দেশকে শোষণ করতে থাকায় জনগণের মাঝেও দেশাত্মবোধের ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগতকারীসহ নানান ঘুষ-দুর্নীতিতে চেয়ে যায় দেশ। কিন্তু ইরান তার ব্যতিক্রম। প্রথমে ইমাম খোমেনীর আঙ্গুলের ইশারায় ইরান পরিচালিত হলেও তিনি রাষ্ট্রীয় কোন পদ গ্রহণ করেন নি এবং তিনি নিজ বাড়ীতে অতি সাধারণ জীবন যাপন করেছেন ইরানের ইমাম হিসেবে। এই সাধারণ

জীবন যাপন অবস্থায় তিনি ১৯৮৯ সালে ইন্তেকাল করেন। এমনকি জীবদ্দশায় রাষ্ট্রের পক্ষে তাঁর ঘরটি সংস্কারের জন্য লোকজন গিয়ে সংস্কারের কাজ শুরু করে। তিনি তা জানার সাথে সাথে রাষ্ট্রের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, তিনি রাষ্ট্রের কোন পদবীধারী নন। অতএব, তাঁর জন্যে রাষ্ট্রের তহবিল খরচ করা এবং তিনি তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

ইমাম খোমেনীর সাধারণ জীবন যাপনের প্রভাব সারা ইরানে তথা সরকারে ও জনগণের মাঝে পড়তে বাধ্য। ফলে ইরানীরা অতি বিলাসী নয়। বিশ্বের নামকরা গরীব দেশের রাজধানী ঢাকার বারিধারা, গুলশান, বনানীতে কোটি কোটি টাকা খরচের শত শত আলিশান দালান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, ইরানের রাজধানী তেহরানের অভিজাত এলাকায় বারেবারে যাওয়া-আসাকালে ঢাকার গুলশান, বারিধারার মত প্যালেস আকৃতির কোন বাড়ি চোখে পড়েনি।

ইরানে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী নেহায়েত কম বলা যাবে। তারা নিজের উপর নিজেরা নির্ভরশীল। বড় বড় শিল্পপতিরা ড্রাইভার রাখে না। ইরানে ট্রেন, গাড়ি উৎপাদিত হয়। কাজেই ইরানের ছোট-বড় প্রত্যেক শহর মোটর-কারে ভরপুর প্রত্যক্ষ হবে। বলা যাবে ইরানের শহরগুলো কারের শহর।

দু'শাহের আমলে সেকেলে আদলের রাস্তাঘাট পুনঃনির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ইরানে ইউরেনিয়াম সহযোগে জ্বালানীসহ নানান দিকে লাভবান হতে এগিয়ে চলেছে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব নাক গলাতে শুরু করেছে। এটা একমাত্র ইরানের ধারণাতীত অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখার অপকৌশল ব্যতীত আর কিছু নয়।

ইরানের এক শহর থেকে অন্য শহরে স্বল্প সময়ে পৌঁছতে পারা যায় বিমানের পাশাপাশি সড়ক যোগাযোগ ভাল হওয়ার কারণে। তাদের খাওয়া-দাওয়া প্রোটিনসমৃদ্ধ। ইরানে ট্রেন নেটওয়ার্কও রয়েছে। তাদের নিজস্ব ট্রেন। ইরানীরা বিলাসী যেমন নয় তেমনি অতি গরীব বা ভিক্ষুকও তেমন চোখে পড়বেনা। মানসিক প্রতিবন্ধী হঠাৎ কোন ভিক্ষুক চোখে পড়তে পারে। ইরানে অপরাধ প্রবণতা নেই বললে চলে। একজন যুবতী একা গভীর রাতে মনে হয় পাহাড় পর্বতে ঘুরাফেরাও করতে পারবে।

ইরানের ৭ কোটি জনগণ ইরানের জন্য বড় সম্পদ। যেহেতু তারা দেশদরদী, কর্মঠ, সৎ ও সাহসী। ইরানীদেরকে দেশদরদী করতে, বিলাসিতা পরিহার করতে, সাহসী হতে উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন ইমাম খোমেনী। তিনি নিজে ভোগবিলাস পরিহার করে সাধারণ জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করায় ইরানীদের মাঝে তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং আগামীতেও তা বজায় থাকবে মনে করা যায়।

তবে শিক্ষার দিক দিয়ে ইরানীরা এগিয়ে গেলেও বিপ্লবের পর থেকে ইংরেজি থেকে তারা দূরে সরে রয়েছে। সাথে সাথে আরবীও। আরব সংলগ্ন পারস্যের অবস্থান হয়েও ইরানীরা ভাষার দিক দিয়ে আরবী আয়ত্তে রাখতে পারেনি। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ফার্সিতে। তবে সাম্প্রতিককালে ইরানীরা বুঝতে শুরু করেছে বিদেশী ভাষা হলেও ইংরেজিকে পরিহার করে চলা কঠিন হবে। বর্তমানকালে যে কেউ ইরান গেলে ভাষা সমস্যায় পড়বেন সহজে। যদি তিনি নিজে ফার্সি না জানেন।

মুসলিম বিশ্বে শিয়া-সুন্নী দূরত্ব দীর্ঘদিনের। শিয়া-সুন্নীর মধ্যে নানা যুদ্ধ, বিদ্রোহ, ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানেও পাকিস্তানে প্রকাশ্যে শিয়া-সুন্নী বিরোধের খবর অহরহ শোনা যায়। সাম্প্রতিককালে ইরাকে শিয়া-সুন্নী বিরোধ প্রকাশ্যে সংঘাতের রূপ নিয়েছে।

কিন্তু ইমাম খোমেনী একটি শ্লোগান রেখে গেছেন তা হল –আমরা শিয়াও নই সুন্নীও নই, আমরা মুসলমান। অর্থাৎ ইমাম খোমেনীর ছত্রছায়ায় বিপ্লবীরা প্রতিপক্ষকে ধূলিস্যাৎ করে দিলেও ধর্মীয় ব্যাপারে একতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি আরবের রাজতন্ত্রকে মেনে নিতে পারেন নি। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলমানদের স্বার্থে কাজ না করে ইসরাইলের পক্ষে থাকায় ইমাম খোমেনী ক্ষুব্ধ ছিলেন। পশ্চিমা বিশ্ব যে মুসলমান-দরদী দেখালেও ভিতরে কিন্তু ইসরাইল-দরদী তা ইমাম খোমেনী ও ইরানীরা বুঝতে পেরে সোচ্চার হন। আজও মুসলিম বিশ্বকে ডিঙ্গিয়ে একমাত্র ইরানই ইসরাইলের ব্যাপারে সোচ্চার।

মুসলিম বিশ্বে খোমেনীই একমাত্র নেতা বা ইমাম ছিলেন যিনি নবী পাক (স.)-র প্রতি সম্মান ও মহব্বতের নিদর্শনস্বরূপ পশ্চিমা বিশ্বকে পরোয়া না করে কুখ্যাত সালমান রুশদীকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন, নবী পাকের সাথে বেয়াদবী করার কারণে। ইমাম খোমেনী ইন্তেকাল করায় সালমান রুশদীর এই মৃত্যুদণ্ড রহিত করার কারও ক্ষমতা থাকল না। এতে কুখ্যাত সালমান রুশদীকে বাকী জীবনও নিরাপত্তাহীনভাবে থাকতে হবে।

ইসলামী বিপ্লবের পরপর প্রচার মাধ্যম আরব রাজতন্ত্রসহ পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক সমালোচনামুখর থাকলেও পরবর্তীতে তা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

কিন্তু ইরান দ্রুততার সাথে উন্নতির দিকে ধাবিত হওয়ায় এবং সাথে সাথে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের গাত্রদাহ হয়ে চলছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ্য হচ্ছে না ইরানের উন্নতি-অগ্রগতি। অতএব, ইরাকের মত পারমানবিক বোমার ধুয়া তুলে ইরানকে কাবু করতে চায় মার্কিনীরা। যেখানে ইরাকে মার্কিনীরা মার খাচ্ছে সেখানে ৭ কোটি সাহসী ইরানীদের দেশে হামলা করলে হয়ত আরো বেশী মাশুল দিতে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রকে। তবে সময়ই তা প্রমাণ দেবে যুক্তরাষ্ট্র কোন্ পথে পা বাড়াচ্ছে।

ইরান গমন

নানাবিধ কারণে ইরান ভ্রমণ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবত মনের গভীরে আশা পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু যথাযথ সহযাত্রীর অভাবে আশা আশাতেই রয়ে যায়।

১৯৯৭ সালে ফিলিস্তিন (জবরদখলকারী ইসরাইল), ইরাক ও জর্দান সফরকালে পরিচয় হয় নরসিংদীর বাসিন্দা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সাখাওয়াত হোসাইনের সাথে। তিনিও আমাদের একইসাথে ঐ প্রাচীন তিন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন।

উক্ত সফরের কারণে পর্যায়ক্রমে সাখাওয়াত সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এতে জানতে পারি তিনি ইরান ও তুরস্কে পাটের সুতা রফতানী করে ঢাকার মতিঝিলে বসে। এরিমধ্যে দুবার ইরান ও তুরস্ক গমন করেন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। তাও অবশ্য একা একা। এতে তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে গমন করলেও একা বিধায় দুবার এর একবারও ইরানের রাজধানী তেহরানের বাইরে যান নি।

আমার ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়ায় যেয়ারত ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগ্রহ ব্যক্ত করায় সাখাওয়াত সাহেব অত্যন্ত খুশি হন। যেহেতু বিশ্বের প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ও নবী-রসূল, সাহাবা, অলী-দরবেশগণের দেশ বলতে ফিলিস্তিন, ইরাক, জর্দান, সিরিয়া, লেবানন, মিশর ও ইরানকে বুঝায়। অন্যান্য দেশকে এরপরে বলা যেতে পারে। আমার ফিলিস্তিন, ইরাক, জর্দান ও মিশরে সফর করার সৌভাগ্য হলেও নানান কারণে ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়া যাওয়া হয়নি। বাংলাদেশে ইরান ও তুরস্কের দূতাবাস থাকলেও সিরিয়ার দূতাবাস নেই।

সাখাওয়াত সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগ চলতে থাকে এবং আলাপে ঠিক হয় ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইরান ও তুরস্ক সফর শুরু করব বলে। এর আগে ঢাকা যাব ভিসার উদ্দেশ্যে। সাখাওয়াত সাহেবের সাথে সফর শেষ করে তিনি দেশে ফিরে আসবেন। আমি রমজানের আগে আগে জেদ্দা যাব পবিত্র রমজান মাস হারমাইন শরীফাইনে কাটানোর জন্য। এরিমধ্যে সাখাওয়াত সাহেব ইরান ও তুরস্ক থেকে উভয়ের জন্য আমন্ত্রণ নিয়ে রাখেন ই-মেইলের মাধ্যমে। তুরস্ক দূতাবাস থেকে ভিসা ফরম নিয়ে একটি ফরম চট্টগ্রামে আমার বরাবরে পাঠিয়ে দেন। ইরান দূতাবাস ফরম দেয় সাক্ষাৎকারের পরপর।

আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান আক্রমণের পর থেকে সারাবিশ্বের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। মুসলমান বলতেই সন্দেহ করা হচ্ছে। ভিসা দিতে ইতস্তত করে। বহু দেশে গমনের ভিসা থাকলেও পুনঃভিসা দিতে ইতস্তত করছে।

এমনি অবস্থায় ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারাদেশে একইসাথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় সারাবিশ্বের মুসলমানগণকে ডিঙ্গিয়ে যায় বাংলাদেশ। অর্থাৎ বিশ্বের মনে করা স্বাভাবিক যে-দেশে একসাথে এক জেলা বাদে প্রতি জেলা সদরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, সে-দেশে উগ্র জঙ্গিবাদী শতকরা ক'জন নয় তার প্রশ্ন এসে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশে ১৪ কোটি জনগণের মধ্যে অধিকাংশই জঙ্গিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এরকম ধারণা করা স্বাভাবিক। এমনি অবস্থায় আমরা উভয়ে ভিসার ব্যাপারে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি।

তেহরান ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

তারপরও সাহস করে অগ্রসর হব ঠিক করি। ২১ আগস্ট রবিবার ঢাকা যাই। উভয়ে টেলিফোনে আলাপ করে পরদিন সকালে তুরস্ক দূতাবাসের গেইটে একত্রিত হয়ে প্রবেশ করব ঠিক করি। আমি থাকব মেয়ে সালমার বাসা বারিধারা ডি.ও.এইচ.এস-এতে। সেখান হতে তুরস্ক দূতাবাস মাত্র এক কিলোমিটার হয়ত হবে। কিন্তু সাখাওয়াত সাহেব থাকেন মতিঝিলের দক্ষিণে গোপীবাগে। সেখানে তাঁর বাড়ী ও ফ্ল্যাট রয়েছে।

আমরা উভয়ে পরদিন ৯টার দিকে গুলশান ২নং-এর উত্তরে তুরস্ক দূতাবাসের গেইটে মিলিত হই। সেখানে আরও ৩/৪ জন ভিসাপ্রার্থী দেখলাম। আমরা তল্লাশীর মুখোমুখি হয়ে দূতাবাসের অভ্যন্তরে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করে বাঙ্গালী অফিসারের মুখোমুখি হই। বাঙ্গালী অফিসার বললেন, Counsellor ছুটিতে গেছেন। Ambassador সাক্ষাৎকার নেবেন। পাসপোর্ট, ফরম, আর্থিক

সচ্ছলতার কাগজপত্র জমা করে দূতাবাস থেকে রাস্তায় চলে আসি। পরপর ঐ ৩/৪ জন ভিসাপ্রার্থীও কাগজপত্র জমা করে রাস্তায় চলে আসে।

এতে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। তারপরও উপায় নেই যেহেতু তাদের দেশে গমনের জন্য ভিসার গরজ। আমরা মাত্র ৫/৬ জনকে তারা ভিতরে বসাতে ভীত। আমরা যদি জে. এম. বি হই, উগ্র জঙ্গিবাদী বা আল-কায়দা হই। যদি দূতাবাসে কোন অঘটন ঘটাই। আমাদের কারণে আজ নিজ দেশে বিদেশী দূতাবাসের ভিতরে অপেক্ষা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রাস্তায় অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে Ambassador তার দেশের পতাকা উড়ায়ে গাড়িযোগে দূতাবাসে প্রবেশ করা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথমে সাখাওয়াত সাহেবের ডাক পড়ে। প্রায় ১০/১৫ মিনিট পর সাখাওয়াত সাহেব তাঁর পাসপোর্টের সাথে আমার পাসপোর্টসহ বেরিয়ে আসেন। সাখাওয়াত সাহেব যেমনি আধুনিক ব্যক্তি তেমনি তা ছবিও স্যুট-টাইওয়ালা। কিন্তু আমি যেমনি টুপি-দাড়িওয়ালা তেমনি ছবিও ঐরকম। ভিসা ফরমে ঐ ছবি দেওয়া হয়েছে।

Ambassador ভিসা ফরমে আমার ছবি দেখামাত্র তার মন বিগড়ে যায়। সাখাওয়াত সাহেব এর আগে দু'বার তুরস্ক গেছেন, এখন ৩য় বার যাবেন। এছাড়া আধুনিক ব্যক্তি বলে সাথে সাথে Ambassador ভিসা ফরমে হাঁ করলেন এবং আমার ব্যাপারে সাক্ষাৎকারের গরজবোধ না করে পাসপোর্ট ফেরৎ দিল সাখাওয়াত সাহেবকে। এতে করে সাখাওয়াত সাহেব আমার ব্যাপারে Ambassador-কে বুঝাতে সচেষ্ট হন। তখন Ambassador শর্ত দেন তুরস্কের রাজধানী আন্কারা আমার ডকুমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন। আন্কারা হতে সম্মতি আসলে আমাকে ভিসা দেওয়া হবে এবং এতে মাসখানেক সময় লাগবে। তুরস্কের ভিসা পদ্ধতি হল ভিসা দিলেও পাসপোর্ট ফেরৎ দেবে। কয়েকদিনের মধ্যে পাসপোর্টের সাথে কনফার্ম টিকেট জমা দিতে হবে। তখন ভিসা দেবে। সাখাওয়াত সাহেব থেকে বিস্তারিত শুনে বিলম্ব না করে উভয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে বারিধারাস্থ ইরান দূতাবাসে চলে যাই। তখন সকাল ১০টা হবে।

আমরা ইরান দূতাবাসে পৌঁছামাত্র বাঙ্গালি অফিসার দূতাবাস দেওয়ালের ছোট ফটক খুলল। আমরা বয়স্ক এবং ইরান থেকে আমন্ত্রণপত্র আছে অতএব আমাদেরকে ভিতরে যেতে এবং অপেক্ষা করতে বলল। আরও ৭/৮ জন ভিসাপ্রার্থী ছিল। ঐ বাঙ্গালি অফিসার তাদের থেকে ৩ জনকে ভিতরে প্রবেশ করালেন।

আমরা ৫ জনকে ঐ বাঙ্গালী অফিসার ভিতরে নিয়ে বসালেন। তবে ইরান দূতাবাসে বাহিরেও বসার মোটামুটি ব্যবস্থা রেখেছে। আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশের জন্য বেশী সময়ক্ষেপণ করতে হয়নি।

দূতাবাস ভবনে প্রবেশ করে প্রায় ১০/১২ জন বসতে পারে মত সোফাপাতা একটি

কক্ষে প্রবেশ করে বসলাম ঐ বাঙ্গালী অফিসারের পরামর্শে। অতপর বাঙ্গালী অফিসার বেরিয়ে গেলেন এবং ৫/৭ মিনিট পর Counsellorসহ কক্ষে প্রবেশ করলেন। Counsellor সোফার একটিতে বসলেন বাঙ্গালী অফিসার নিকটে দাঁড়িয়ে। Counsellor প্রথমে সাখাওয়াত সাহেবকে প্রশ্ন করে সন্তুষ্ট হয়ে বাঙ্গালী অফিসারকে বললেন একটি ভিসা ফরম দিতে। এতে হাতে থাকা ফরম থেকে একটি ফরম সাখাওয়াত সাহেবকে প্রদান করেন। Counsellor আমার দিকে দৃষ্টি দেয়ামাত্র আমি কথা শুরু করে দেই।

ভিসা অফিসারকে ইংরেজিতে বললাম, আপনারা আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে চান অর্থ-সম্পদ নিয়ে, মানুষ হিসেবে নয়। আমি ব্যবসায়িক কারণে ইরান যেতে চাচ্ছি না। ইরান বিশ্বের প্রাচীন সভ্য দেশ। তথায় বহু মহান আল্লাহর অলী শায়িত, তেমনি বহু ঐতিহাসিক স্থানের শহর রয়েছে যেমন: সিরাজ, ইস্পাহান, মাশাদ, গিলান, তাবরীজ, কোম ইত্যাদি। Counsellor আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন আমি কথা বলার সময়। সাথে সাথে বাঙ্গালী অফিসারকে বলেন আমাকে একটি ভিসা ফরম দিতে। ভিসা ফরম জমা করতে হবে কাল মঙ্গলবার না হয়ে পরশু বুধবার। প্রতিদিন ভিসা ফরম জমা নেয়া হয় না। তখন বললাম, আমি চট্টগ্রামে থাকি, কাল জমা করতে পারলে সুবিধা হয়। এতে Counsellor সাথে সাথে বাঙ্গালী অফিসারকে বললেন কাল যেন আমরা দু'জন থেকে ভিসা ফরম জমা নেয়া হয়। দূতাবাসে বিলম্ব না করে আমরা মতিঝিল চলে যাই ট্রাভেল এজেন্সির সাথে কথা বলতে। আমার রুট হবে ঢাকা-দুবাই-তেহরান-দুবাই-জেদ্দা-দুবাই-ঢাকা। সাখাওয়াত সাহেব-এর রুট হবে ঢাকা-দুবাই-তেহরান-ইস্তাম্বুল-দুবাই-ঢাকা।

আমরা উভয়ের টিকেট হবে আমিরাত এয়ারলাইনে। সম্প্রতি চালু হওয়া আইন মতে ওমরাহ্ করতে সৌদি ওমরাহ্ এজেন্সীর হাঁ সূচক ই-মেইল লাগে – যাকে কথিত ভাষায় মোফা বলে।

ঢাকার ওমরাহ্ এজেন্সী বললো সৌদি থেকে আমার ওমরাহ্ ই-মেইল দু/এক দিনের মধ্যে চলে আসবে। অতএব আমাদের পরিকল্পনা মতে ঢাকা ত্যাগে কোন অসুবিধা হবে না।

আমিরাতের ফ্লাইট সিডিউল দেখে আমরা প্রোগ্রাম করি ৮ সেপ্টেম্বর '০৫ বৃহস্পতিবার সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে দুবাই, দুবাই থেকে বিকালের ফ্লাইটে তেহরান রওনা হব। ১৪ দিন ইরানে অবস্থান করে ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার সাখাওয়াত সাহেব সকাল ৭.৪৫ মিনিট ইরান এয়ারে ইস্তাম্বুল যাবেন এবং আমি ১১-৩০ মিনিট আমিরাতের ফ্লাইটে দুবাই রওয়ানা হয়ে তথা হতে জেদ্দা যাব। তবে দুবাই দু'দিন অবস্থানের উদ্দেশ্যে আমিরাত এয়ারলাইনের মাধ্যমে হোটেল বুকিং করাসহ দুবাইয়ের Transit ভিসা নিয়ে নেয়া হয়, সে মতে কথা হয় ট্রাভেল এজেন্সির সাথে।

বিকেলে সাখাওয়াত সাহেবের মতিঝিলস্থ অফিসে বসে দু'জনে ইরান দূতাবাস প্রদত্ত ফরম পূরণ করি এবং পরদিন যথাসময় সকাল ১০টায় উভয়ে দূতাবাস গেইটে মিলিত হয়ে ফরম জমা করি। ফরম জমা করাকালীন বাঙ্গালী অফিসারকে বললাম ঢাকায় সিরিয়ান দূতাবাস নেই। আমরা ইরান থেকে সিরিয়ার ভিসা নিয়ে সিরিয়া যাব। অতএব আমাদেরকে ডাবল এন্ট্রি ভিসা দেয়া হোক। সাথে সাথে বাঙ্গালী অফিসার দূতাবাসের অভ্যন্তরে গিয়ে ফিরে এসে ডবল এন্ট্রি ভিসা দেয়া হবে বললেন এবং আমরা দুজনের ভিসা ফিসের একটি স্লিপ দিলেন। আমরা তৎমতে নিকটস্থ গুলশানে গিয়ে নির্ধারিত ব্যাংকে ভিসা ফি জমা করে স্লিপটি পুনঃ ইরানী দূতাবাস কাউন্টারে বাঙ্গালী অফিসারকে প্রদান করি। ২ দিন পর বাঙ্গালী অফিসার উভয়ের পাসপোর্ট নিয়ে যেতে বললেন।

অতপর সাখাওয়াত সাহেবসহ নিকটস্থ আমার মেয়ে সালমার বাসায় গিয়ে ব্যাগটি নিয়ে মতিঝিল চলে যাই এবং বাসের টিকেট খরিদ করে দুপুরে সাখাওয়াত সাহেবের আতিথেয়তা গ্রহণ করে বিকেলের দিকে চট্টগ্রাম রওনা হই।

এখানে উল্লেখ্য, ইরান ও সৌদি আরবে সফরের পর দেশে ফিরে সংবাদ পেলাম তুরস্ক দূতাবাস আমাকে যোগাযোগ করতে বলছে ভিসার জন্য। যেহেতু তাদের রাজধানী আংকারা থেকে আমাকে ভিসা দেয়ার জন্য বলেছে। আমি ঢাকা গেলে তাদের সাথে দেখা করি। তারা ভিসা দিতে আগ্রহ দেখায়। তখন বললাম, আমিতো এখন তুরস্ক যাব না। একা একা এত দূরে সফর করা আমার জন্য উচিত হবে না। আগামী সেপ্টেম্বরে সাখাওয়াত সাহেবসহ হয়ত একসাথে যেতে পারি। তখন ভিসার জন্য আবার আসতে পারি, এ বলে চলে আসি।

দু'দিন পর সাখাওয়াত সাহেব ইরান দূতাবাস থেকে ডাবল এন্ট্রি ভিসাসহ আমরা উভয়ের পাসপোর্ট ফেরৎ নেন। অতপর তিনি টিকেটসহ পাসপোর্ট তুরস্ক দূতাবাসে জমা করে তার ভিসা নিয়ে নেন।

এরিমধ্যে আমার সৌদি থেকে ওমরাহ্ ভিসার ই-মেইল আসতে বিলম্ব হতে থাকে। ওমরাহ্ এজেন্ট সাখাওয়াত সাহেবকে আজ বিকেলে আসবেন কাল সকালে আসবেন বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার সময় এসে যায়।

ফলে বাধ্য হয়ে দুবাই-জেদ্দা-দুবাই টিকেট রেখে রওনা হতে হয়। অর্থাৎ আমাকে দুবাই থেকে পুনঃ দেশে আসতে হবে ওমরা ভিসার জন্য। সাখাওয়াত সাহেবের মাধ্যমে ওমরা এজেন্টকে জানালাম ২১ সেপ্টেম্বর তেহরান থেকে দুবাই পৌঁছে দু'দিন থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে ঢাকা পৌঁছে ওমরাহ্ এজেন্সীতে পাসপোর্ট জমা করব এবং ৬ দিন পর ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সৌদি এয়ারলাইনে ঢাকা থেকে জেদ্দা রওনা হব। সে মতে যাতে সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখে ওমরাহ্র এজেন্ট।

৭ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকা রওনা হই। বারিধারাস্থ সালমার বাসায় অবস্থান নিয়ে বিকেলে মতিঝিলে সাখাওয়াত সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি এবং টিকেট, ভিসা একনজর দেখে নিই কোন ভুল-ত্রুটি হল কি না। এরমধ্যে সাখাওয়াত সাহেব ওমরাহ্র এজেন্টের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। যেহেতু আমি দেশে এসে পুনঃ জেদ্দা রওনাকালীন সময়ে সাখাওয়াত সাহেব তুরস্কে থাকবেন। সন্ধ্যায় বারিধারাস্থ সালমার বাসায় ফিরে গেলাম। সালমাকে জানিয়ে দিলাম সাখাওয়াত সাহেব সকালে মতিঝিলের দক্ষিণ সংলগ্ন গোপীবাগস্থ তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বিমান বন্দর যাওয়ার পথে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন। অতএব সালমার গাড়ীর প্রয়োজন পড়বে না। সকাল ৮-৫০ মিনিটে সম্ভবত আমাদের ফ্লাইট। সাখাওয়াত সাহেব সকাল ৭টার আগে আমাকে তাঁর কারে তুলে বিমান বন্দর রওনা হয়ে যান।

কিন্তু আমরা বিমান বন্দর পৌঁছার পূর্বে অধিকাংশ যাত্রী লাগেজ জমা করে Boarding Card নিয়ে নেন। আমরাও দু'জনে একসাথে লাগেজ জমা করে Boarding Card নিয়ে ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বিমান বন্দরের অপর প্রান্তে চলে যাই। মাইকে ঘোষণা হওয়া মাত্র বিমানে গিয়ে আসন গ্রহণ করি।

বিমানে প্রবেশ করে বুঝতে পারি এ Aircraft আমিরাত এয়ারলাইনের 777 Boeing. প্রায় ৩৫০ আসনের এ Boeing বিশ্বের আধুনিক Aircraft গুলোর মধ্যে অন্যতম বলা যায়। আমিরাত এয়ারলাইনের মান ও সেবার অনেক সুনাম রয়েছে। কিন্তু বিদেশী তথা পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিমা বিমানবালারা বিমানের অভ্যন্তরে সেবার সুবিধার অজুহাতে কামিজ বা কোট খুলে ফেলে শুধুমাত্র ব্লাউজ গায়ে রেখে সেবার অজুহাতে দৌড়াদৌড়ি, ঘুরাঘুরি করা একটি আরব রাষ্ট্রের বিমানের ক্ষেত্রে খুবই অশোভনীয় মনে করি।

ইউরোপ-আমেরিকার একাধিক এয়ারলাইনে ভ্রমণ করতে গিয়ে এরকম অশোভন পোশাক আমার চোখে পড়েনি।

মাত্র ৫ ঘন্টারও কম সময়ে আমরা আকাশযাত্রায় দুবাই বিমান বন্দরে অবতরণ করি। আমাদের লাগেজ তেহরানের উদ্দেশ্যে বুক করা। সাথে হালকা ব্যাগ। তা নিয়ে হেঁটে হেঁটে দুবাই বিমান বন্দরে প্রবেশ করে হাঁটাহাঁটি, চা/কফি পান, সময়মত নামাজ পড়া এভাবে ৪/৫ ঘন্টা পার করে দিই। অতপর বিকেলে আমিরাত এয়ারলাইনের অপর বিমানে মাত্র ১.৪০ মিনিটের যাত্রায় তেহরান রওনা হই। প্রায় ২০০ আসনের 330-Aircraft. তবে আতিথেয়তা ও ব্যবহার ঢাকা-দুবাই এর চেয়ে দুবাই-তেহরান উন্নত মনে হল।

বিমানের ভেতর মাগরিবের নামাজ পড়ে নিই। মাত্র ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটের যাত্রা বিধায় বিমানের ভিতরে টয়লেট ব্যবহার না করতে সচেষ্ট হই। তেহরান বিমান বন্দরে নামার আগে বিমানের জানালা দিয়ে সন্ধ্যারাতের বৈদ্যুতিক আলোতে

তেহরান শহর প্রত্যক্ষ করি এবং তেহরান বিমান বন্দরে অবতরণকালীন বিমান বন্দরকে ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল। ১ কি ২টি বাদে আর কোন Aircraft বিমান বন্দরে চোখে পড়ছিল না। তেহরান বিমান বন্দরে অবতরণ করে ইমিগ্রেশনের আগে টয়লেট ব্যবহার করতে গিয়ে টয়লেটের স্বল্পতা অনুভব করি। পাশাপাশি মাত্র ২টি টয়লেট। তাও একটি হাই কমোড ও একটি ফ্লেট কমোড। ফলে লাইন ধরতে হল ফ্লেট কমোড ব্যবহারের জন্য।

বিশেষ ওজর বাদে আমি হাই কমোড পরিহার করে চলি। এমনিতে গণ হাই কমোড নামাজীদের পাক-পবিত্র থাকতে প্রতিকূল মনে করি। টয়লেট ও ইমিগ্রেশন সেরে আমরা প্রতিজনে ২০০ U.S. ডলার করে চারশত ডলার বদলিয়ে নিই। এতে এত বেশী ইরানী নোট হাতে আসে যে, আমরা উভয়ের পকেটে রাখা সম্ভব না হওয়ায় ব্যাগে রাখতে হল অধিকাংশ নোট। আমেরিকান এক ডলার ইরানী ৮০০ রিয়াল সমমান। ইরানে এক লক্ষ রিয়াল, দশ হাজার রিয়াল, পাঁচ হাজার রিয়াল, পাঁচশত রিয়ালের নোটের ব্যবহার রয়েছে। মনে হয় পাঁচশত রিয়ালের নিচে নোট থাকলেও ব্যবহার নেই আমাদের দেশের ১০ ও ৫ পয়সার কয়েনের মত।

ডলার বদলিয়ে ইরানী রিয়াল নিয়ে আমরা গেট থেকে লাগেজ নিয়ে ট্রলি সহযোগে বাহির হয়ে সাখাওয়াত সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ইরানী এজেন্ট তৌহিদী সাহেবকে খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। এতে ট্রলি নিয়ে টেক্সি কাউন্টারে যাই। তৌহিদী সাহেব আমাদের জন্য তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে প্রসিদ্ধ Mar Mar Hotel বুক করে রেখেছেন তা ই-মেইলে জানিয়ে রেখেছিল। সে মতে আমরা টেক্সি কাউন্টারে Mar Mar Hotel-এ যাব বলায় তারা আমাদের থেকে তাদের নির্ধারিত ভাড়া তথা রিয়াল গ্রহণ করে রসিদ প্রদান করে এবং অপেক্ষা করতে বলে টেক্সি আসার জন্য। এ সুযোগে আমি হাঁটাহাঁটি করতে থাকি বিমান বন্দর দেখতে। বিমান বন্দরকে কেন জানি ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল। ঐ সময় আমাদের ফ্লাইট বাদে মনে হয় স্বল্প সময়ে আর কোন আন্তর্জাতিক ফ্লাইট নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে টেক্সি আসলে পরে আমরা ট্রলি নিয়ে টেক্সির নিকটে যাই। চালক নিজে আমাদের লাগেজ তার টেক্সির পিছনে নিল। তেহরান নগরীর প্রাণকেন্দ্রে আমার হোটেলের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। ৫/৭ মিনিট চলার পর বিমান বন্দর এলাকা পার হয়ে আমরা অন্ধকার মহাসড়কে পৌঁছে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকি।

এখানে উল্লেখ্য, নতুন নির্মাণের পর চালু ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক এ বিমান বন্দরে বিদেশী এয়ারলাইনের বিমান উঠা-নামা করে থাকে। সাথে সাথে ঐ রুটের ইরান এয়ারের বিমানও উঠা-নামা করে। তবে ইরানের মূল মেহেরাবাদ বিমান বন্দর শহর সম্প্রসারণ হয়ে অভ্যন্তরে হলেও এখনো ইরানী সরকারী / বেসরকারী

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট চলাচল তথা উঠা-নামা করছে। ফলে এখনো ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর প্রাণ ফিরে পায়নি বিমান চলাচলের স্বল্পতার কারণে। অপরদিকে, বিমান বন্দর ও রানওয়ে নির্মাণের ত্রুটির অজুহাত দেখিয়ে পশ্চিমা দেশের কিছু কিছু এয়ারলাইন এই ইমাম খোমেনী বিমান বন্দর পরিহার করছে। ফলে ইরানের সাথে তাদের বিমান যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

ইমাম খোমেনী বিমান বন্দর তেহরান মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র থেকে ৬০/৭০ কিলোমিটার হবে। এতে যেতে বা আসতে ঘন্টার কাছাকাছি সময় লেগে যায়। আমাদের বহনকারী টেক্সি ৩০/৩৫ মিনিট চলার পর তেহরান শহরে প্রবেশ করে এবং আরো ১৫/২০ মিনিট চলার পর অভীষ্ট হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন রাত প্রায় ১০.৩০ মিনিট হবে। হোটেলের বয় টেক্সি থেকে লাগেজ নামিয়ে রিসিপশনের নিকটে রাখে। অতপর আমরা আমাদের জন্য রুম বুকিং করা আছে বলায় রিসিপশনিস্ট বুকিং চার্ট দেখে একটু হতচকিত হয় এবং আমাদেরকে কিছু না বলে দু'জনার দু'সিটের একটি কক্ষ প্রদান করে। পরদিন তৌহিদী সাহেব সাক্ষাৎ করতে এলে জানতে পারি তিনি ভুলক্রমে আমাদের জন্য হোটেল কক্ষ বুক করেছিলেন এর পরদিন থেকেই।

বড় রাস্তা সংলগ্ন লম্বালম্বি পাঁচতলা দালানের এ হোটেল তেহরানে প্রসিদ্ধ হলেও হয়ত তিন তারকা দাবি করা যাবে। চার বা পাঁচ তারকা হবার নয়।

হোটেল বয়ের সহযোগিতায় চারতলায় আমাদের সাথে কক্ষে লাগেজ পৌঁছে যায়। এশারের নামাজ পড়ে রাতের খাবার খেতে নিচে চলে যাই। ইংরেজি সংবাদপত্র Tehran Times-এ নামাজের সময়-সূচী দেখে নিই। ইরানে আমাদের দেশের মত ইংরেজির প্রচলন না থাকলেও হোটেল গেস্টগণের জন্য ইংরেজি সংবাদপত্রের ব্যবস্থা রাখা আছে। ইরানের প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রে নামাজের সময়-সূচী দেয়া তাকে।

ফজরের নামাজের সুবিধার্থে ব্যাগ থেকে টেবিল ঘড়ি বের করে এলার্ম ও ইরানী টাইম ঠিক করে নিই। সাখাওয়াত সাহেব ও আমি উভয়ে একমত যে, রাতে এসি বন্ধ করে ঘুমাতে। সে মতে এসি বন্ধ করে কম্বল চাদর পরিহার করে কিছুক্ষণ টিভি দেখে রাত প্রায় ১২টার দিকে ঘুমিয়ে পড়ি।

তেহরান কেন্দ্রিয় মসজিদে জুমার নামাজ

৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ শুক্রবার তেহরানে পৌঁছে হোটেলে অবস্থান নিয়ে ঘুমাতে গভীর রাত হয়ে যায়। টেবিল ঘড়ির এলার্মের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। টয়লেট, অজু সেরে ফজরের নামাজ পড়ে পুনঃ ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল ৮টার দিকে নিচে যাই নাস্তা করতে। মানসম্পন্ন হোটেলে সকালের চা-নাস্তা ফ্রি। সকালের নাস্তা সেরে রুমে ফিরে এসে পুনরায় শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ ঘুমাই। এরিমধ্যে সাখাওয়াত সাহেবের সাথে আলাপ হয় জুমা পড়া নিয়ে। তিনি আগ্রহ দেখান নিকটে কোন মসজিদে জুমা পড়তে। আমি কিন্তু তেহরানের সুন্নী মসজিদ বা শিয়া কেন্দ্রিয় জামে মসজিদে যেতে আগ্রহী। তারপরও সাখাওয়াত সাহেবের আগ্রহকে প্রাধান্য দিই।

গতরাতে হোটেলের কক্ষ থেকে এবং আজ সকালে আমাদের হোটেল কক্ষ ও রিসিপশন থেকে বারবার সাখাওয়াত সাহেব চেষ্টা করতে থাকেন তৌহিদী সাহেবের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে। কিন্তু তৌহিদী সাহেবের টেলিফোন বারবার বন্ধ পাচ্ছিলেন। আগেই বলেছি ইরানী তৌহিদী সাহেব সাখাওয়াত সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তাঁর ব্যবসায়িক এজেন্ট। সাখাওয়াত সাহেব অন্যান্য বন্ধুদের সাথে সৌজন্যে আলাপ করে টেলিফোনে এবং পরে টেলিফোনে আলাপ করে দেখা হবে বলে কথা হয়। হোটেলে আসতে সাখাওয়াত সাহেব অনাগ্রহ দেখান। যেহেতু ইরানে দু'সপ্তাহ থাকব অতএব পরে দেখা হবে। এরমধ্যে আমি Tehran Times পড়া শেষ করে টিভি ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকি।

টিভি ঘাঁটাঘাঁটি করে বুঝতে পারলাম ইরানে CNN, BBC ও Aljajira দেখা যায়। সাথে সাথে জর্দান ও সিরিয়ার সরকারী/বেসরকারী টিভি চ্যানেল। ইরানের অভ্যন্তরীণ ৫/৭টি চ্যানেলও দেখা যায়। তবে ইরানী চ্যানেলগুলো ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত। নারীরা উপস্থাপনা ও সংবাদ পাঠ করতে দেখা যায়। কিন্তু কঠোর পর্দা তথা শুধু মুখমণ্ডল বাদে মাথা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা। গান বাজনা প্রচুর, তবে শালীন। ভাবের গান বেশী, ফূর্তির গান নেই বললেই চলে। শিয়া আকিদামতে, ইমামগণের শাহাদাতকে সামনে রেখে তাদের জীবন কাটাতে হবে। এতে তাদের আনন্দ উৎসবেও ভাবের, বিরহ-বিচ্ছেদের কথা থাকে। বেলা ১১টা পর্যন্ত টিভি ঘাঁটাঘাঁটি করে গোসল সেরে জুমার প্রস্তুতি নিতে থাকি।

নিকটতম মসজিদে যখন জুমা পড়ব অতএব তাড়া নেই। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টার পর নিচে নেমে যাই। দেখি রিসিপশনে দু'জন যুবতী। রাত্রে পুরুষ দেখেছিলাম। হোটেল স্টাফ থেকে জেনে নিলাম নিকটে মসজিদ রয়েছে। তবে সুন্নী মসজিদ খোঁজাখুঁজি করতে সাহস করিনি অন্য কিছু কেউ মনে করবে এই ভয়ে।

মুক্ত মনোরম আবহাওয়ায় শহরের ফুটপাত দিয়ে উভয়ে হাঁটতে শুরু করি এবং পথিক থেকে ইঙ্গিতে জেনে নিই মসজিদ কোন্ দিকে। আমাদের হোটেলের ৫/৭ শত মিটার দূরত্বে প্রকাণ্ড মসজিদ দেখলাম বড় রাস্তা সংলগ্ন। কিন্তু মসজিদের গেইট বন্ধ। তখন ১২.৩০ পার হয়ে গেছে। এতে আমরা হতচকিত হই। এক বৃদ্ধের সাথে ইশারায় আলাপ করলাম মসজিদ কবে খুলবে। তৎক্ষণাৎ ঐ বৃদ্ধ ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে। আমরাও তার সাথে হাঁটতে থাকি। প্রায় ৫০/৬০ মিটার হাঁটার পর বড় চৌরাস্তায় দাঁড়াই বৃদ্ধের সাথে। আমরাও কৌতূহলী হই বৃদ্ধ আমাদের নিয়ে কি করতে চায় এ নিয়ে। দেখি একটি বাস আসামাত্র আমাদেরকে অনেকটা জোর করে বাসে তুলে দিল এবং সে সাথে আমাদের দুজনের ভাড়াও দিয়ে দিল। বাসের সিট পূর্ণ হয়ে অনেকে তখন দাঁড়ানো অবস্থায়। বাসে উঠামাত্র একজন নিজ থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে দিল। সাখাওয়াত সাহেব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সীমিত কথা বলার মানুষ। আমি তার বিপরীত, আমি সফরে বিশেষ কারণ ছাড়াও কথা বলতে চাই। জানতে চাই, বুঝতে চাই।

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জুমার নামাজে সমাগমের অংশবিশেষ

আমি হালকা পাতলা লম্বা মানুষ। গায়ে সাফারী, মাথায় ক্যাপ। অতএব আমি একজন বিদেশী তা অনায়াসে ভেসে উঠত। সাখাওয়াত সাহেবের প্যান্ট-শার্ট বিধায় অনেকটা ইরানী পোশাকের সাথে মিলে যায়। এতে সাখাওয়াত সাহেবকে ইরানীরা সহজে আমার মত বিদেশী মনে করত না। আমি সিটে বসামাত্র দাঁড়ানো ইরানীদের সাথে আলাপ জুড়ে দিই। ইশারায় বললাম মসজিদে যাব জুমা পড়তে। তারা ইংরেজি না বুঝলেও আমার কথার ভাব বুঝে বলল, বাসের সবাই মসজিদে যাচ্ছে জুমা পড়তে, তেহরান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে।

তারা আকারে ইঙ্গিতে আমার দেশ কোথায় জানতে চাওয়ায় বললাম বাংলাদেশ। এতে নিকটের সবাই চিনে ফেলল। মাত্র ৫/৭ মিনিট চলার পর রাস্তার মাঝখানে বাস থেকে সবাই নেমে যাচ্ছে।

বাস থেকে নেমে অবাক হয়ে যাই। প্রশস্ত সড়কের চৌরাস্তার মাথায় সব যাত্রী নামিয়ে দিয়ে বাস ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আর বাস থেকে নেমে অসংখ্য নর-নারী হাঁটতে শুরু করে। আমরাও উৎফুল্ল মনে নামাজীর স্রোতের সাথে হাঁটতে থাকি।

প্রায় আধা কিলোমিটার হাঁটার পর দূর থেকে মাইকের শব্দ শুনতে পাই। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছে। সব নামাজীর দেহ তল্লাশী করা হচ্ছে। ২ কি ৩ তল্লাশী পার হয়ে বিশাল শেড-এ প্রবেশ করি।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মাঝখানে মসজিদ। মসজিদ হিসেবে দালান নির্মাণ না করে বিশাল ও বিশেষ শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এক কোণায় ৮/১০ ফিট উচ্চতার স্টেজ। আয়াতুল্লাহ হাশেমী রফসানজানি মাইকে বক্তব্য রাখছেন। পরে বুঝতে পারি এ বক্তব্য হল জুমা'র খোতবা।

তখন একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। স্টেজের প্রায় ২/৩শ' মিটার দূরত্বে লক্ষাধিক মুসল্লির মাঝে আমরা বসে পড়ি। তখন নিকটময় অনেকে আমার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে বিদেশী সুন্নী বুঝতে পেরে। সফরে মুসাফির বিধায় সুন্নত নফল হলেও সুযোগ মতো জুমার সুন্নত পড়ে নিলাম।

আয়াতুল্লাহ হাশেমী রফসানজানির বক্তব্য বা খোৎবা শেষ হচ্ছিল না। ফার্সিতে খোৎবা দিতে থাকলেও খোৎবার বিষয়বস্তু বুঝতে বাকী থাকল না। তিনি কারবালার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন এবং চোখের পানি মুছতে ছিলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখি অনেকের চোখে পানি। তেমনি ইসরাইল ও আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন তাঁর ফারসী ভাষায় প্রদত্ত খোৎবায়।

বিশাল শেডের মসজিদে অসংখ্য টিভি ক্যামেরা সরাসরি রিলে করছিল জুমার নামাজ। ইমামের মেহরাবের দু'দিকে হযরত মোহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),

হযরত আলী (র.), হযরত মা ফাতেমা (র.), হযরত ইমাম হাসান (র.), হযরত ইমাম হোসাইন (র.) ছোট ছোট ভাল্ব দ্বারা দিনের আলোতে দেখা যায় মত নাম ফলক দেখা যাচ্ছিল।

পরের সপ্তাহে সিরাজ নগরীতে কেন্দ্রিয় মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে গিয়ে মেহরাবের দু'পার্শ্বে ইমাম খোমেনী ও বর্তমান ইমাম খামেনী-এর বৃহদাকারের ছবি দেখা যাচ্ছিল এবং খোৎবার পর নামাজ শুরু করাকালীন সুইচ টিপে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ পর্দা দ্বারা ঐ প্রকাণ্ড ছবি ২টি ঢেকে দেয়া হয়।

মুসল্লীদের শতকরা ৯০/৯৫ জন প্যান্ট-শার্ট পরিহিত ও মাথায় টুপিবিহীন। অধিকাংশের মুখে হালকা দাড়ি। কিন্তু টাই ব্যবহার নেই দেখলাম। ইরানিরা অধিকাংশ প্যান্ট-শার্ট পরে টাই পরিহার করে চলে।

মুসল্লীদের মধ্যে শতকরা ৫/৭ জন সূফী বা মাওলানা। তাদের পোষাক পৃথক। মাথায় বৃহদাকারের পাগড়ী। শরীরে লম্বা কোর্তার উপর কাল জোব্বা।

দীর্ঘক্ষণ খোৎবার পর প্রায় ১:৪৫ এ আজান দেয়া হয়। এ দীর্ঘ সময়ে নামাজীর ঢল চলতে থাকে। চতুর্দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। এক পার্শ্বে কঠোর পর্দায় মহিলাগণের নামাজের ব্যবস্থা আছে। অজুর ব্যবস্থা হলো ২০/৩০ মিটার দূরত্বে দূরত্বে ১০/১২টি করে বেসিন বসানো। তারা আমাদের মত দুই পা ধৌত করেনা। চামড়ার মোজা পরাকালীন আঙ্গুল দিয়ে পায়ের উপরিভাগে একবার মুসেহ করতে হয়। যথা আমাদের সুন্নী মতে অজু করে চামড়ার মোজা পরে মুকিম অবস্থায় একদিন এক রাত এবং সফর অবস্থায় তিন দিন তিন রাত মোজা পরিধানে থেকে পায়ের উপরিভাগে চামড়ার মোজার উপর মুসেহ করলে চলে। কিন্তু শিয়ারা তা নিয়মিত গ্রহণ করে। অর্থাৎ অজু করতে দু'পা ধৌত না করে পায়ের উপরিভাগ একবার মাত্র মুসেহ করবে। এতে করে ৩/৪ ফিট উপরে বেসিনে অজু করা তাদের জন্য সহজতর। ইরানের মসজিদে অজুর জন্য তাই বেসিনের ব্যবস্থা।

ইরানে আজান আস্তে আস্তে টেনে টেনে দেয়া হয় এবং আজানে শেষের দিকে ক'টি শব্দ বেশি থাকে। ফলে ইরানে আজান দিতে ৫/৭ মিনিট সময় নেয়। তারা আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ বলার পর আসহাদু আন্না আলীও অলিওল্লাহ এবং আসহাদু আন্নাহ অলিও হুজ্জতুল্লাহ বলে। অবশ্য সুন্নী মতে আমাদের মাজহাবের সাথে অন্য মাজহাবও আহলে হাদীসের এক্কামতে কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। শিয়াগণের আযান হল:

আল্লাহু আকবার (২ বার)
আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার)
আসহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (২ বার)
আসহাদু আন্না আলীওল অলিউল্লাহ
আসহাদু আন্না আলীওল হুজ্জতুল্লাহ
হাইয় আ'লাস সালাহ (২ বার)
হাইয়া আ'লাল্ ফালাহ (২ বার)
হাইয়া হাইরিল আলম
হাইয়া হাইরল আমল
আল্লাহু আকবর (২ বার)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার)

একামত শুরু হবার সাথে সাথে সবাই জামাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। হাশেমী রফসানজানি মঞ্চ থেকে নেমে আসলেন। কিন্তু মঞ্চে মুয়াজ্জিন বা মুকাব্বির মুসল্লিগণের দিকে তথা কেবলাকে পিছনে রেখে জামাত নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মাইকের মাধ্যমে।

জামাত শুরু হলে সাথে দাঁড়ানো ব্যক্তি তথা মুকাব্বির কেবলা পিছ দিয়ে মুসল্লিগণকে সামনে রেখে মাইকের সহায়তায় ইমামের অনুসরণ করছিলেন। জানিনা তিনি আমাদের দেশের মত তথা সুন্নীগণের মত জামাতে থেকে মোকাব্বির হলেন না কি জমাতের বাইরে থেকে মোকাব্বির হলেন।

জামাতে সালাম ফিরানোসহ কিছুটা ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করি। জমাত শেষে কয়েকবার দরুদ শরীফ পড়ল সমস্বরে। তাদের অতি প্রচলিত দরুদ হল "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মোহাম্মদ, ওয়াআলা আলে মোহাম্মদ"। অতপর কয়েকবার করে স্লোগান দিল। স্লোগান হল "আল্লাহু আকবর; খামেনী রাহবর"। স্লোগানের পরপর মোকাব্বির বা পরিচালক ১৫/২০ মিনিট বক্তব্য বা নসিহত রাখেন। অতপর আসরের জামাত শুরু হল। আমি এ সুযোগে জুমার নামাজ পুনঃ যোহর কসর হিসেবে পড়ে নিই।

আমাদের দেশ থেকে রমজানে হারমাইন শরীফাইনে গেলে উভয় হারামের বিতির ইমামের পিছনে পড়লে পুনরায় পড়ে দিতে অনেক বিজ্ঞ আলেমের অভিমত। শুধুমাত্র মাজহাব ভিন্নতার কারণে। যেখানে মাজহাব ভিন্নতার কারণে উভয় হারম শরীফে বিতির জমাত পড়ে পুনরায় পড়ে দিতে অনেকে বলে থাকেন সেখানে শিয়া আকিদা আরো অনেক দূরত্বে বিধায় পুনরায় যোহর পড়ে নিলাম।

ইরানীরা যোহর-আসর পরপর এবং মাগরিব-এশা পরপর পড়ে থাকে। মধ্যখানে ১০/২০ মিনিট বিরতি দেয়া হয়। কিন্তু হানফী মাজহাব বাদে বাকী সব মাজহাবও আহলে হাদীসের আকিদা মতে সফরে যোহর-আসর ও মাগরিব-এশা পরপর পড়ার অনুমতি তথা সুযোগ আছে। কিন্তু ইরানীরা সারাজীবন যোহর-আসর ও মাগরিব-এশায় মাত্র ১০/২০ মিনিট বিরতি দিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

আমরা জামাতে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকে আসর না পড়ে মুসল্লি স্রোতের সাথে বেরিয়ে আসি প্রায় ২:৩০ মিনিটের দিকে। আধা কি. মি. হেঁটে আসার পর টেক্সিযোগে হোটেলে চলে আসি। পরে বিকেলে তৌহিদী সাহেব থেকে জানতে পারি তেহরানে দু'টি বৃহদাকারের জামাত হয়ে থাকে, একটি তেহরান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অপরটি বাজার মসজিদে। তবে ভার্সিটি ক্যাম্পাস মসজিদের জুমা সরকারী/বেসরকারী টিভি সরাসরি রিলে করে থাকে এবং ভার্সিটি ক্যাম্পাস-এর এ জামাতে কম করে হলেও ২/৩ লাখ লোকের সমাগম হয়ে থাকে। তৌহিদী সাহেব আরও বললেন, সমগ্র তেহরানে মাত্র ৪/৫টি মসজিদে জুমার জামাত হয়। সব মসজিদে জুমা হয় না।

তেহরানে যেয়ারতগাহ

আমাদের হোটেল রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার শেষে কক্ষে গিয়ে সাখাওয়াত সাহেব তৌহিদ সাহেবকে টেলিফোনে পেয়ে যায়। সাখাওয়াত সাহেব রাগ-দুঃখ দেখালেও তৌহিদী সাহেব আশ্চর্য হয়ে যান আমরা একদিন আগে তেহরান আসলাম বলে। তাঁর জানা মতে আমরা আজ শুক্রবার রাত্রে তেহরান পৌঁছাব। সেমতে তিনি হোটেল বুকিং করা এবং আমাদেরকে স্বাগত জানানোসহ যাবতীয় কিছু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অর্থাৎ তৌহিদী সাহেবের জানা মতে আমাদের আগমন একদিন পিছে মনে করেছিলেন। এতে গত রাত্রে আমরা হোটেলে পৌঁছামাত্র রিসিপশনিস্ট কিছুটা হতচকিত হয়ে যান। যেহেতু তার রেজিস্টারে আমাদের বুকিং লেখা আছে আজ শুক্রবারে। কিন্তু আমরা আগের রাত্রে চলে আসলাম। কক্ষ খালি ছিল বলে তিনি কথা না বাড়িয়ে আমাদেরকে প্রদান করেন।

তৌহিদী সাহেব টেলিফোনে কথা না বাড়িয়ে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে আমাদের কক্ষে চলে আসেন। দেখলাম প্যান্ট-শার্ট পরিহিত পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের ভাল ইংরেজি বলতে পারেন। যেহেতু তিনি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা করেন।

তৌহিদী সাহেব সরল ছটফটে। সাখাওয়াত সাহেবের সাথে প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হলে আমি আলাপে বসি। প্রথমে তেহরানে যেয়ারত করার কথা বলি এবং বোস্তাম কোথায় জানতে চাই। তিনি বোস্তাম নাম শুনেছেন। তবে কোথায় তাঁর জানা নেই। তাঁর এক বন্ধু জানে বলে তৎক্ষণাৎ তার সাথে টেলিফোনে আলাপ করে জানালেন সেমনান প্রদেশের প্রসিদ্ধ শাহরূদ শহরের নিকটে বোস্তাম। তৌহিদী সাহেব আমাকে তাঁর সাথে দেখা করাবেন বললেন। আজ শুক্রবার সবকিছু বন্ধ। অতএব আমার অতি আগ্রহ বিধায় তৌহিদী সাহেব বিলম্ব না করে আমাদের নিয়ে যেয়ারতে বেরিয়ে পড়লেন। আমরা তিনজন প্রথমে চলে যাই তেহরান মহানগরীর প্রায় ১৫/২০ কি. মি. দূরত্বে এক পাহাড়ের পাদদেশে হযরত শহর বানু (রা.)-এর যেয়ারতে।

তৌহিদী সাহেব নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন। তেহরান মহানগরীকে পিছনে রেখে বড় রাস্তা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের গাড়ী উপরের দিকে উঠতে থাকে। অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক বড় পাহাড়ের পাদদেশে মাজারের কাছাকাছি পৌঁছলে আমাদের কার রাস্তার পার্শ্বে শত শত কারের সাথে থামিয়ে দেয়া হয়। রাস্তার পার্শ্বে গাড়ী রেখে আমরা হাঁটতে থাকি। প্রায় ২/৩ শত মিটার হেঁটে হেঁটে উপরের দিকে যাওয়ার পর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকি।

তার মাজারের নিকটে একটি গুহা। যে গুহায় তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বলে কথিত।

এখানে উল্লেখ্য, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের পর সারামুসলিম জাহানে এজিদসহ উমাইয়া বংশের প্রতি ঘৃণা জন্মে। কোন কোন স্থানে আন্দোলন, বিক্ষোভ, প্রতিবাদও হয়েছিল। উমাইয়ারা কঠোর হস্তে সবকিছু দমন করে এবং সাথে সাথে মদিনা মুনাওয়ারায় আহলে বাইতসহ নবী বংশের প্রতি নজরদারী, খবরদারী বেড়ে যায় মদিনা মুনাওয়ারাস্থ উমাইয়া প্রশাসনের। ফলে নবী বংশের অনেকেই পশ্চিমে মিশরে এবং পূর্বে পারস্যে হিযরত করেন। উভয়স্থানে উম্মতে মুহাম্মদীগণ নবী বংশধরগণকে সসম্মানে গ্রহণ করে। আবার উভয়স্থানে উমাইয়া কঠোরতার কারণে অনেকে শহীদ হন এবং অনেকে আত্মগোপন করেন।

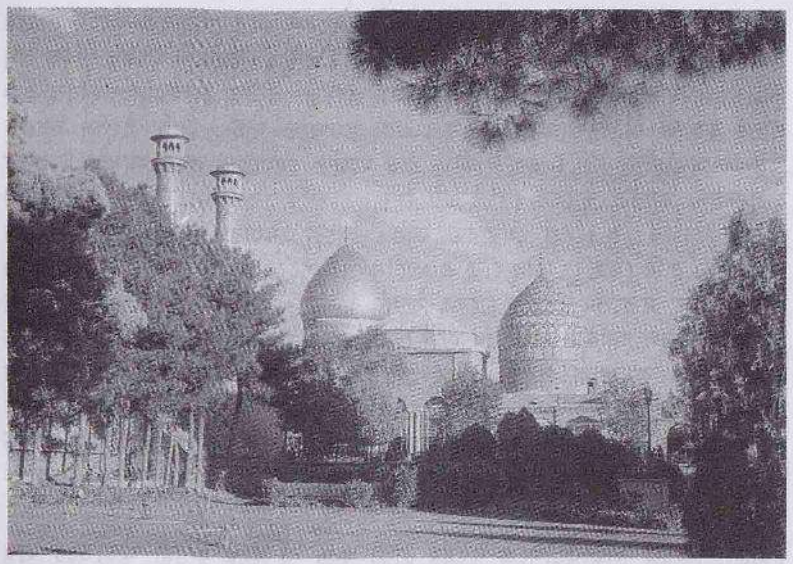

তেহরানের উপকণ্ঠে সাবেক রেই শহরে ইমামজাদা হযরত আবদুল আজিম (র.) সহ অন্যান্য মহান অলিগণের মাজার কমপ্লেক্স

আজও কায়রো শহরে নবী বংশের বহু মাজার বিদ্যমান। তেমনিভাবে পারস্য তথা আজকের ইরানে হাজার হাজার ইমামজাদার মাজার বিদ্যমান বলে কথিত আছে। জানিনা ১৪০০ বছর পরে এসব কথার কতটুকু সত্যতা রয়েছে। তবে একটা প্রবাদবাক্য আছে – যা কিছু রটে তা কিছু না কিছু বটে। কাজেই চার হাজার ইমামজাদা হউক বা না হউক বহু নবী বংশ যে ইরানে শায়িত আছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু হযরত শহর বানু (রা.)-এর মাজার যে তেহরান নগরীর উপকণ্ঠে পাহাড়ের পাদদেশে এ কথা কতটুকু সত্য বলা মুশকিল। যেহেতু কারবালা ঘটনাপ্রবাহের পর আহলে বাইতের কাফেলা কারবালা থেকে কুফা হয়ে দামেস্ক পৌঁছেন। দামেস্ক হতে ইমাম হোসেনের (রা.) সহোদর বোন হযরত যয়নাব (রা.)-এর নেতৃত্বে মদিনা মুনাওয়ারা ফিরে আসেন। পরবর্তীতে হযরত যয়নাব (রা.) সহ অনেকে মিশরের কায়রো নগরীতে হিযরত করেন এবং হযরত শহর বানু (রা.) মদিনা মুনাওয়ারা ইন্তেকাল করে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। তবে পারস্য হিজরত করে তেহরানের উপকণ্ঠে শায়িত তাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেহেতু তিনি পারস্যের রাজকন্যা ছিলেন। আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে পারস্য বিজিত হলে যুদ্ধবন্দি হিসেবে হযরত শহর বানু (রা.) মদিনা মুনাওয়ারা গমন করেন এবং হযরত ইমাম হোসেনকে (রা.)-কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁর ঔরষে হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.) এর জন্ম।

আমরা তিনজন গুহা পরিদর্শন করে মাজারে প্রবেশ করে যেয়ারত করি। ইরানে ইমামের প্রায় প্রত্যেক মাজার সুন্দর ও কারুকার্য খচিত। তেমনি হযরত শহর বানু (রা.)-এর মাজারও। তথায় কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা তেহরান শহরের এক প্রান্তে হযরত আবদুল আজিজ (র.)-এর যেয়ারতে যাই। তিনি হলেন হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.)-এর নাতী। তাঁর মাজার যেয়ারত করে আমরা নিকটস্থ ইমামজাদা হযরত তাহের (রা.)-এর যেয়ারত করি। অতপর সংলগ্ন ইমামজাদা হযরত জাফর (র.)-এর যেয়ারত করি। আরো যেয়ারত করি হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (রহ.)। তাঁর জন্ম এ প্রাচীন রেই শহরে বিধায় রাযি। তবে তাঁর এ মাজার নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেহ বলেন অন্যত্র। বর্তমানে ঐ এলাকাটির নাম হযরত আবদুল আজিম নামকরণ হয়ে গেছে এবং তেহরান মহানগরী সম্প্রসারিত হয়ে মাজার কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এককালের এ প্রাচীন রেই শহর বর্তমানে তেহরান মহানগরীর সাথে সংযুক্ত। সেখানে এ তিন ইমামজাদা বাদে আরো অনেক মহান অলী শায়িত আছেন। মাত্র ৫/৭ বছর আগে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রায় এক কিলোমিটার এরিয়ার বিশাল মাজার কমপ্লেক্সকে মনোরম চোখ ঝলসানোভাবে সংস্কার করা হয়েছে।

ইরানে শতশত মাজারগুলিতে রাষ্ট্রের টাকা খরচ না করে ধনীরা অকাতরে ব্যয় করে থাকে তা ভাবতে অবাক লাগে। আবদুল আজিম এলাকায় পৌঁছে আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ি। তখন তেহরানে ৭:৪০ মিনিটে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। মাজার

কমপ্লেক্সে যেয়ারত করতে দীর্ঘক্ষণ সময় লেগে যায়। সেখানে আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিই। মাজারকে ঘিরে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের আবাসিক হোটেল ও বহু রেস্টুরেন্ট রয়েছে। রয়েছে ক্লিনিক, মিউজিয়াম, গেস্ট হাউস, কালচারাল সেন্টার ইত্যাদি। সেখানে রাতের খাবার শেষে রাত ১০টার দিকে তৌহিদী সাহেব আমাদেরকে হোটেলে পৌঁছে দেন।

এর চারদিন পর মঙ্গলবার সাখাওয়াত সাহেবের আরেক বন্ধু হামিদ কাবিরী সাহেব আমাদেরকে সকালে কোম নিয়ে যান। বিকেলে ফেরার পথে তেহরান শহরের উপকণ্ঠে ইমাম খোমেনীর মাজার কমপ্লেক্সে থামি।

বিশ্বের বুকে রাজা-বাদশাহগণের সমাধি বলি বা মাজার বলি হযরত আলী (ক.) ও হযরত ইমাম রেজা (রা.) বাদে ইমাম খোমেনীর মাজারের সাথে তুলনা করার মত আর কোন মাজার আছে কি না আমার জানা নেই। প্রায় এক কিলোমিটার এরিয়া নিয়ে বিশাল মাজার কমপ্লেক্স। বিগত ৮/১০ বছরের মাজার কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজে মনে হয় শত শত কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এ কাজ শেষ হতে আরো কত বছর লাগবে জানি না।

সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, গবেষণাগার, পাবলিক হল, মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, টয়লেট, গাড়ি পার্কিং, বাগানসহ নানান স্থাপনায় ভরপুর থাকবে। মাজার কমপ্লেক্স সংলগ্ন "বেহেশত জাহরা" নামক তেহরানের বিখ্যাত কবরস্থান। তথায় হাজার হাজার শহীদের কবর রয়েছে। ইসলামী বিপ্লবে শহীদ হওয়া আয়াতুল্লাহ বেহেশতী, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী রজায়ীর মত বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ শায়িত।

ঐসব এলাকায় সকাল-বিকেল লোক সমাগত জারি থাকে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক সেখানে অবস্থান করে যেয়ারত করি।

তেহরান ত্যাগের ২ দিন পূর্বে তৌহিদী সাহেব আমাদেরকে নিয়ে যান আল্-বুরুজ পর্বতের পাদদেশে ইমামজাদা হযরত ছালেহ (রা.)-এর যেয়ারতে। মাগরিবের সময় আমরা সেখানে পৌঁছি। তৌহিদী সাহেব আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যান। রাত্রে আমাদের আর কোন প্রোগ্রাম না থাকায় মাজার কমপ্লেক্সে দীর্ঘক্ষণ সময়ক্ষেপণ করি। টুকটাক কেনাকাটা করি। বাগদাদে শায়িত ইমাম মূসা কাজেম-এর পুত্র এ ইমামজাদা হযরত ছালেহ (রহ.) বলে জানতে পারি। এ মাজারে শত শত লোকের সমাগম প্রত্যক্ষ করি এবং সেখানে মাগরিবের পর ঘুরাফেরা করে এশার নামাজ পড়ে নিই। অতপর টেক্সিযোগে হোটেলে ফিরে আসি।

তেহরান মহানগরীর বাজার এলাকায় শেখ নাসির উদ্দীন (রহ.) ও এক ইমামজাদার মাজার রয়েছে বলে জানতে পারি। তবে সময় ও পরিচিত লোকের অভাবে ঐ যেয়ারতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ২য় বার তেহরান গমন করলে পুরাতন তেহরান শহরে হযরত ইমামজাদা হাসান (র.) এর যেয়ারত করি। যার বর্ণনা পরবর্তীতে রয়েছে।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)

ইরানের সেমনান প্রদেশের বোস্তামে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মহান অলী হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.)। চট্টগ্রাম মহানগরীর নাসিরাবাদের এক পাহাড়ে তাঁর অপর মাজার রয়েছে। তবে এটি তাঁর চিল্লার স্থান এতে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ রয়েছে এ মহান অলী চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন কি না। চট্টগ্রাম সফর করে থাকলে চিল্লার স্থান নিয়ে হয়ত মতভেদ থাকবেনা। কিন্তু তাঁর চট্টগ্রাম সফর করা নিয়ে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেহেতু চট্টগ্রামের এ চিল্লার মাজারকে সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী মাজার বলা হয়ে থাকে। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, সেকালে প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থায় উত্তর ইরান থেকে স্থলপথে চট্টগ্রাম আসা হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর পক্ষে অসম্ভব বলা চলে। অপরদিকে, দিল্লীর সুলতানী আমলে পারসী সুলতানগণের মধ্যে যুদ্ধ- বিগ্রহের কারণে কোন রাজা বা যুবরাজ পলায়ন করে শাহ সুজার মত চট্টগ্রামের দিকে আসতে পারে। যেহেতু তখন চট্টগ্রাম অবাঙ্গালী তথা আরাকানী মগ বা ত্রিপুরাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে সুলতানী কোন রাজা বা যুবরাজ চট্টগ্রামের নাসিরাবাদস্থ উক্ত পাহাড়ে আত্মগোপনে থাকা অসম্ভব নয়। অতএব, নাসিরাবাদের এ চিল্লা প্রকৃতই কার চিল্লা তা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। এতে চট্টগ্রাম মহানগরীর মাজার নিয়েও মতভেদ থেকে যায়।

হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.)-এর পুরো নাম হলো ত্বাইফুর ইবনে ঈসা ইবনে সুরুশান বাস্তামী। উপনাম আবু ইয়াজিদ বা সংক্ষেপে বায়জিদ। তবে তাঁর উপাধি হলো সুলতানুল আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেকীন, কুতুবে আলম, খলিফায়ে ইলাহী ইত্যাদি।

তাঁর জন্মস্থানের নাম বাস্তাম বিধায় তিনি নামের পরে বাস্তামী হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে বাস্তামীর স্থানে বোস্তামী বলা হয়ে থাকে।

যেমন বড় পীর হযরত আবদুল কাদের গিলানীকে আমরা জিলানী বলে থাকি। সারাবিশ্বে তিনি গিলানী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে জিলানী হিসাবে পরিচিত। ইরানের গিলান প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী বিধায় তিনি গিলানী।

উমাইয়া শাসনের শেষভাগে ১৩১ হিজরিতে হযরত বায়েজিদ (রহ.) সেমনান প্রদেশের বাস্তামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন।

হযরত বায়েজিদ (রহ.) তিন ভাই-এর মধ্যে মেঝ এবং তাঁর দু'বোন। বড় ভাইয়ের নাম আদম এবং ছোট ভাই-এর নাম আলী। হযরত বায়েজিদের এক সন্তানের নামও বায়েজিদ। এতে তাকে বায়েজিদ সানি বলা হত।

হযরত বায়েজিদ (রহ.) মায়ের গর্ভে থাকাকালীন তাঁর করামত প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর মাতা ঐ সময় সন্দেহযুক্ত খাবার মুখে দিলে গর্ভের শিশু মোচড় দিয়ে উঠতেন যতক্ষণ না ঐ খাদ্য ফেলে দেয়া হয়।

শৈশবে মক্তবে পড়াকালীন পবিত্র কোরআন মজিদের একটি আয়াত নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে। সূরা লোকমানে আল্লাহপাক বলছেন, "তুমি আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় কর"। এ আয়াত নিয়ে তাঁর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং হঠাৎ অসময়ে মায়ের কাছে চলে যান। অসময়ে বাড়ী আসায় মায়ের কৌতূহলে হযরত বায়েজিদ (রহ.) বললেন – আল্লাহতা'আলা তাঁর এবং আপনার খেদমত করতে বলেছেন। কিন্তু আমি একসাথে দুদিকে খেদমত কিভাবে করতে পারি? হয়ত আপনি আল্লাহতা'আলাকে লে আমাকে আপনার খেদমতে নিয়ে নেন নতুবা আমাকে আল্লাহতা'আলার কাছে সোপর্দ করুন যাতে আমি পুরোপুরি তাঁর হয়ে যাই। মা বলেন, তোমাকে আল্লাহতা'আলার কাছে ন্যস্ত করলাম এবং তোমার উপর আমার হক মাফ করে দিলাম।

মকতব শিক্ষা সমাপ্তির পর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হযরত বায়েজিদ (রহ.) বাস্তাম ত্যাগ করেন এবং মূলকে শামে ৩০ বছরের দীর্ঘ কৃচ্ছসাধন করে আল্লাহপাকের দিদার পেতে মোরাকাবা মোযাহেদা করে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। ঐ সময় তাঁকে নিদ্রাহীনতার ও ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। ঐ দীর্ঘ সফরে তিনি ১১৩ জন পীরের খেদমত করেন এবং সবার কাছ থেকে ফয়েজ হাসেল করেন। তিনি সবার কাছ থেকে ফয়েজ হাছেল করতেন ঠিকই কিন্তু মুরিদ হতেন না। তিনি দ্রুত কশফ, এলহাম- এর মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে নেন।

একবার ইমাম জাফর সাদেক (র.) তাঁকে কক্ষের তাক থেকে একটি কিতাব নিতে বললেন। তখন হযরত বায়েজিদ (রহ.) বললেন কোন্ তাক, কোন্ কিতাব? তখন হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) বললেন, এতদিন এখানে আছ অথচ তাক, কিতাব কিছুই চিন না। তখন হযরত বায়েজিদ (রহ.) বললেন, তাক নিয়ে আমার কি কাজ? আমি ত আপনার খেদমতে এসেছি, এদিক সেদিক দেখতে আসিনি।

তখন হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) বললেন, তুমি ফিরে যাও আমার এখানে তোমার অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ অর্জন পূর্ণ হয়ে গেছে।

তিনি দীর্ঘ বার বছর পথ চলে মক্কা মোকাররমা পৌঁছেন সফরে গমনে তাড়া করলে বেয়াদবী ভেবে। এবং মক্কা মোকাররমা পৌঁছে হজ্ব করে মদিনা মুনাওয়ারা গমন

করেন নি নবী পাকের শানে বেয়াদবী ভেবে। অর্থাৎ হজ্ব করতে এসে মদিনা মুনাওয়ারা যাওয়াটা তিনি নবী পাক (স.)-এর শানে বেয়াদবী মনে করে পরের বছর পৃথকভাবে শুধু মদিনা মুনাওয়ারা গমন করেছিলেন যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

তিনি যখন কোন শহরে গমন করতেন বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর অনুসরণে জড়ো হয়ে যেত। শহর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও লোকেরা তাঁর পেছনে অনুসরণ করে চলত। হযরত বায়েজিদ (রহ.) লোকদের দিকে ফিরে তাকাতেন এবং জানতে চাইতেন, আপনারা কারা? লোকেরা উত্তর দিত, আমরা আপনার সাহচর্য পেতে চাই।

এতে হযরত বায়েজিদ (রহ.) আল্লাহতা'আলার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন 'ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, মানুষকে দিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে আড়াল হয়োনা।'

হযরত বায়েজিদ (রহ.) চাইতেন যে, মানুষের মন থেকে তাঁর প্রতি ভালবাসা দূরীভূত হউক এবং আল্লাহতা'আলার সাথে থেকে চলার পথের ঝামেলা চুকে যাক।

সূফি-সাধকগণ আল্লাহপাকের সাথে মিলনের মকামে ইত্তেহাদের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু হযরত বায়েজিদ (রহ.) সেই রহস্য ও তত্ত্বকথাকে অকপটে বেপরোয়াভাবে বর্ণনা করেছেন।

মূলত: আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী বায়েজিদ (রহ.)-কে ঘিরে ধরেছিল। যার ফলে তিনি নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহপাকের অস্তিত্বে বিলীন দেখতে পেয়ে বলে ফেলতেন, "সুবহানী মা আ'যামু শানী"। (আমি পবিত্র সত্তা আমার শান কত মহান!)

হযরত বায়েজিদ (রহ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি তাসাওফের উপর লেখালেখি করেন। সাথে সাথে তাঁর কাব্যচর্চার কথাও জানা যায়। ইমাম গায্যালী (রহ.) তাঁর রচনাবলীতে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর রচনা হতে সাহায্য নেন।

ইলমে তাসাউফের সর্বোচ্চ মাকাম হচ্ছে ফানা। সূফী-সাধক যখন ফানার স্তরে পৌঁছে যান তখন নিজের অস্তিত্ব ও সমগ্র জাগতিক চেতনা হারিয়ে ফেলেন। একান্তভাবে আল্লাহপাকের মহান সত্তায় সমর্পিত ও সমাহিত হন। ঐ অবস্থাকেই বলা হয়ে থাকে ফানাফিল্লাহ।

হযরত বায়েজিদ (রহ.) প্রথম সূফী সাধক যিনি আধ্যাত্মিক দর্শনের এ স্তরটির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "সুবহানী মা আ'যামু শানী"।

পরবর্তীকালে হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর এই উক্তির প্রতিধ্বনি করেন ভিন্ন ভাষায়, "আনালহক্ব" উক্তির মাধ্যমে।

মূলত 'সুবহান' পরিভাষাটি একমাত্র আল্লাহপাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই এ পরিভাষা নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, খোদায়ী দাবী করার শামিল এবং শিরক।

বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.)'র মাজার গেইট

কিন্তু বিশ্বের বিখ্যাত সূফী-সাধক হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) সহ অনেকে এ উক্তির যে ব্যাখ্যা দেন তার সারমর্ম হল–হযরত বায়েজিদ (রহ.) আল্লাহপাকের তাওহীদের সাগরে ডুবে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যান। তখন চতুর্দিকে আল্লাহপাকের অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না। কাজেই তিনি যে 'সুবহানী' উক্তি করেছেন মূলত তা তাঁর উক্তি নয়। বরং আল্লাহপাকের উক্তি এবং হযরত বায়েজিদ (রহ.) তন্ময় অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ করেছেন।

তাসাউফে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর আরেকটি অবদান হচ্ছে তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার পথ দেখিয়েছেন যা ইলহাম বা Infusion হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীকালে সূফী-সাধকগণ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন।

হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মতে ধ্যানের মগ্নতায় আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে। তখন সরাসরি আল্লাহপাকের কাছ থেকে জ্ঞান সাধকের মনে উদ্ভাসিত হবে। একজন ফকিহ তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, জ্ঞান কার কাছ থেকে এবং কোথা থেকে পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন আল্লাহর দান হতে।

এক মজলিশে হযরত বায়েজিদ (রহ.) উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচনা হল অমুক হতে অমুক কর্তৃক বর্ণিত, শুনে হযরত বায়েজীদ (রহ.) মন্তব্য করলেন, "বড় মিসকিন মুর্দার কাছ থেকে অন্য মুর্দা জ্ঞান আহরণ করছে। আর আমি এমন যিন্দার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করছি, যিনি কখনো মরবেন না।"

সূফী-সাধকের অন্যতম মতবাদ হচ্ছে আল্লাহপাকের ভালবাসার সাগরে ডুব দেয়া। সে ভালবাসা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

সংসারের মধ্যে থেকেও কিভাবে সংসার বিরাগী হওয়া যায় তার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। হযরত বায়েজিদের (রহ.) কাছে জানতে চাওয়া হয় আপনি এ মকাম কিসের বিনিময়ে অর্জন করলেন? বললেন, কিছুর বিনিময়ে নয়। লোকেরা বলল, তা কি করে হয়? তখন তিনি বললেন, আমি নিশ্চিত জানলাম দুনিয়া কিছুই নয়। তখন তাকে ত্যাগ করেছি এবং এতে এ মকাম অর্জন করেছি।

হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রহ.) বর্ণনা করেন, 'একবার হযরত বায়েজিদ (রহ.)- কে বলা হল অমুক জায়গায় এক বড় বুযুর্গ আছেন। শুনে হযরত বায়েজিদ (রহ.) তার সাথে সাক্ষাতে যান। যখন তার কাছে পৌঁছলেন দেখলেন ঐ বুযুর্গ কেবলার দিকে থুথু ফেললেন। এতে হযরত বায়েজিদ (রহ.) তার সাথে দেখা না করে চলে আসেন এবং বললেন এ লোক যদি তরীকতের কিছু অর্জন করে থাকত তবে শরীয়তের বরখেলাপ আচরণ প্রকাশ পেত না।

বর্ণিত আছে – তার ঘর থেকে মসজিদের দূরত্ব ছিল চল্লিশ কদম। তিনি মসজিদের সম্মানার্থে কখনো পথে থুথু ফেলেন নি।

হযরত বায়েজিদ (রহ.) বলেন, আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহর সন্ধান করছিলাম। যখন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলাম, দেখলাম যে আমি নই, তিনি আমাকে সন্ধান করছেন।

হযরত বায়েজিদের বিনয় ও নম্রতা প্রসঙ্গে হযরত শেখ সাদী (রহ.) "বুস্তান" কাব্যগ্রন্থে বর্ণনা করেন–এক ঈদের দিন ভোরে হযরত বায়েজিদ হাম্মামখানা থেকে গোসল সেরে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। এ সময় কেউ অজ্ঞাতসারে ছাই-এর পাত্র তার মাথার উপর ফেলে দেয়, এতে তার পাগড়ী ও চুল নষ্ট হয়ে যায়। হযরত বায়েজিদ (রহ.) নিজ হাতে মুখ ঢেকে নিলেন এবং শোকর করে বললেন–ওহে আমার নফ্স, ছাই এর কারণে তোমার অসন্তুষ্টির কিছু নেই। কেননা তুমিতো আগুনের উপযুক্ত। হযরত শেখ সাদী (রহ.) এ ঘটনার বর্ণনান্তে উপদেশের সূরে বলেন, বিনয় তোমার সম্মানের শির আরো উন্নত করবে। অহংকার তোমাকে ধূলায় লুটাবে।

হযরত বায়েজিদ (রহ.) এক ইমামের পেছনে নামাজ পড়েন। ইমাম বললেন, শেখ, আপনি কোনো আয় উপার্জন তো করেন না, আপনার খাবার জোটে কেমন করে? হযরত বায়েজিদ বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি নামাজটা পুনঃ পড়ে আসি। ইমাম বললেন কেন? তিনি বললেন, যে লোক নিজের রিযিকদাতাকে চিনে না সে লোকের পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ হয় নাই। তিনি আরো বললেন, যে

ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, মুসলমানদের জানাযায় শরীক হয় না, অসুস্থদের দেখতে যায় না, এতিমদের খোঁজ-খবর নেয় না, অথচ তাসাউফের দাবী করে সে ভণ্ড।

তিনি বলেন, আগুন ঐ লোকের জন্য যারা আল্লাহকে চেনেনা, আর যারা আল্লাহকে চেনে তারা আগুনের জন্য আযাব, আর যারা আল্লাহকে চিনেছে আল্লাহ ছাড়া তার মুখ দিয়ে অন্য কথা বের হয় না। যে বলে আমার প্রভুকে স্মরণ করছি, তার জন্য বিস্ময় হয়। আমি কি তাকে এক মুহূর্ত ভুলে গেছি যে স্মরণ করব। আমি প্রেমসুধা পান করেছি পেয়ালায় পেয়ালায় ভরে। শুরাও শেষ হয়নি আমিও পরিতৃপ্ত হইনি।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ইসলামী দার্শনিক আল্লামা ইকবাল হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর প্রতি অতুলনীয় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর কবিতায়। তিনি তাঁকে "কামেলে বাস্তাম" নামে অভিহিত করেছেন।

একবার হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হল 'যাহেদ' ও 'আরেফ'-এর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ? হযরত বায়েজিদ (রহ.) বললেন, 'আরেফগণ'। তিনি ব্যাখ্যায় বলেন, "যাহেদরা নেক্কার লোকদের স্মরণ করে, কিন্তু আরেফগণ স্মরণ করে আল্লাহকে। যাহেদরা এবাদত করে দোযখের ভয়ে, আরেফরা এবাদত করে আল্লাহ থেকে বিচ্ছেদের ভয়ে। যাহেদরা কবরের দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়, আরেফরা আল্লাহর প্রেমাসক্তিতে অস্থির হয়। যাহেদরা আল্লাহর ভয়ে যমীনে শির লুটিয়ে দেয়, আরেফরা আত্মিক প্রেরণায় অন্তরকে আল্লাহর আরশের সাথে যুক্ত রাখে। যাহেদরা নিজের দুঃখ- দুশ্চিন্তার কথা বলে আপনজনদের কাছে, আরেফরা বলে দয়াময় আল্লাহর দরবারে।

হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর বক্তব্য হচ্ছে তাসাওফ দর্শনের মূল কথা কোরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এক ব্যক্তি তাঁর থেকে জানতে চাইলেন অলী হবার চিহ্ন কি? এতে তিনি বল্লেন, অলী হবার চিহ্ন হচ্ছে, তার এক হাতে থাকবে আল্লাহর কিতাব

কোরআন, অপর হাতে থাকবে রসূলুল্লাহর (স.) সুন্নত। তার চোখ দুনিয়ার প্রতি বন্ধ থাকবে এবং নির্লোভ হবেন।

হযরত বায়েজিদ (রহ.)-কে বলা হল অমুক অতি বড় মাপের বুযুর্গ। তিনি রাতের মধ্যে মক্কা মোকাররমায় পৌঁছে যান। তিনি বললেন, ইবলিস এক ঘন্টায় পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে যায়। অথচ প্রতিনিয়ত আল্লাহর অভিশাপের মধ্যে রয়েছে।

তাঁকে বলা হল অমুক ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে চলে আর বাতাসে উড়ে। তিনি বললেন, মাছও পানির উপর দিয়ে চলে আর পাখি আকাশে উড়ে। কাজেই এগুলো বুযুর্গীর চিহ্ন হতে পারেনা।

হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমী (রহ.) বিশ্বখ্যাত সাধক, কবি, আরেফ। তাঁর

জীবনে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর এক প্রসিদ্ধ উক্তি। হযরত মাওলানা রূমীর আধ্যাত্মিক গুরু হযরত শামমে তাবরীযী হযরত মাওলানা রূমীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবান্তর আসার মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে হযরত বায়েজিদ (রহ.) একটি উক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

হযরত মাওলানা রূমী কৌনিয়ায় মাদরাসায় পাঠদান শেষে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। সাথে তাঁর অনেক শিষ্য। কৌনিয়ার তুলারে বাজারের রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, ভবঘুরের মত এক লোক এসে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলেন। এতে মাওলানা রূমী একটু বিরক্ত বোধ করেন। পরক্ষণে আগন্তুক প্রশ্ন করেন, মাওলানা! আচ্ছা বলুনত, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বড় নাকি বায়েজিদ (রহ.) বড়? মাওলানা রূমী জওয়াব দিলেন, অবশ্যই আখেরী নবী (স.) বড়। তাঁর শানের সাথে অন্য কারো তুলনা হতে পারে না। তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে বলুন বায়েজিদ (রহ.) কেন বললেন যে, 'সুবহানী মা আ'যামু শা'নী? আমি পবিত্র সত্তা, আমার শান কত মহান! অথচ হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন যে, 'সুবহানাকা মা আরাফনাকা হাক্কক্কা মাআরিফাতিকা'–হে আল্লাহ তুমি অতি পবিত্র। তোমাকে যেভাবে চেনা কর্তব্য সেভাবে আমি চিনতে পারিনি'। এ প্রশ্নের পর মাওলানা রূমীর মাথা ঘুরে যায়। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং ভবঘুরে লোকটির হাত ধরে চলে যান। নির্জন কক্ষে গিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ ও ভাববিনিময় হতে থাকবে। একটানা চল্লিশ দিন মাওলানা রূমী এতদিনকার মাদরাসা ছাত্র শিক্ষক সংসার ত্যাগ করে ভবঘুরে লোকটির জন্যে পাগলপারা হয়ে যান। এর মাধ্যমেই তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটে। দীওয়ানে শামমে তাবরীযী ও মসনবী শরীফ সেই আধ্যাত্মিক বিপ্লবেরই ফসল।

সে ভবঘুরে আগন্তুক আর কেহ নয় মাওলানা রূমীর আধ্যাত্মিক গুরু হযরত শামমে তাবরীযী।

আমাদের দেশে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর ত্যাগ ও ছবরের দুটি ঘটনা বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন মজলিশে ওয়াজে বারেবারে এ দু'টি কথা শোনা যায়। তা হলো : এক রাতে হযরত বায়েজিদের (রহ.)'র আম্মাজান তাঁর কাছে পানি চান। কলসিতে তখন পানি ছিল না। বাইরে গিয়ে কুয়া থেকে পানি আনতে কিছু সময় নিলেন, পানি এনে দেখেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। প্রচণ্ড শীতের রাত ছিল। পানির পাত্র হাতে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মায়ের ঘুম ভাঙলে দেখেন পুত্র তখনো দাঁড়িয়ে আছে। জানতে চাইলেন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। হযরত বায়েজিদ বললেন–আশঙ্কা হচ্ছিল আপনার যখন ঘুম ভাঙবে তখন যদি আমাকে না পান, যদি পানি পেতে বিলম্ব ঘটে। মা এ অবস্থা দেখে পুত্র বায়েজিদকে প্রাণভরে দোয়া করেন।

অনেক জীবনীকাররা লিখে গেছেন মূলত মায়ের দোয়ার বরকতেই হযরত বায়েজিদ এত উচ্চ আসনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

আরেক ঘটনা হলো : হযরত বায়েজিদ (রহ.) প্রায়ই কবরস্থানে যাতায়াত করতেন। এক রাতে কবরস্থানে গিয়ে দেখেন যে, অভিজাত পরিবারের এক যুবক কবরস্থানের পাশে বেহালা বাজাচ্ছে। যুবকটি হযরত বায়েজিদের (রহ.) কাছে আসলে তিনি বলে উঠেন–লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা।

যুবক রাগে চটে গিয়ে বেহালা দিয়ে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাথায় আঘাত করে। তাতে বেহালা ভেঙে যায়। সাথে সাথে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাথাও ফেটে যায়। হযরত বায়েজিদ (রহ.) নীরবে ঘরে চলে আসেন যুবকের ফেলে দেয়া ভাঙা বেহালা নিয়ে। সকালে এক মুরিদকে দিয়ে বাজার থেকে একটি বেহালার দাম জেনে নেন। বেহালার মূল্য পরিমাণ টাকা ও কিছু মিষ্টান্ন প্রদানের সাথে এও বলে পাঠান যেন যুবককে বলে যে, বায়েজিদ আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন গত রাতে আপনার বেহালা দিয়ে পেটাতে গিয়ে বেহালা ভেঙে যায়। কাজেই নতুন আরেকটি বেহালা কিনতে তৎমূল্য পাঠিয়েছেন এবং আপনার মনের রাগ দূর করতে কিছু মিষ্টান্ন পাঠিয়েছেন।

এতে যুবক অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর কাছে এসে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তওবা করে। সাথে সাথে পথহারা যুবক সৌভাগ্যবান হয়ে ধন্য হয়।

হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর উপর একাধিক গ্রন্থ আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সাথে সাথে আউলিয়াগণের জীবনীতেও তাঁর প্রসঙ্গ রয়েছে। এসব লিখনীতে তাঁর কারামতের ভাণ্ডার দৃষ্টিগোচর হয়।

তাসাউফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আত্মাকে যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি তাসাউফকেও ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এখলাছ, সবর, তাওয়াক্কুল, আল্লাহপাক ও নবী পাকের প্রতি মহব্বত প্রভৃতির চর্চা ও বিকাশের জন্য তাসাউফের বিকল্প নেই।

তবে দেশে একালে তাসাউফকে বেদায়াত বলতে অহরহ শোনা যাচ্ছে। ধর্মীয় ডিগ্রী লাভ করে অহমিকায় ভরপুর হয়ে একালে একটি ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠী তাসাউফকে অস্বীকার করছে। অস্বীকার করছে তরিকতকে, সূফীবাদকে। অপরদিকে তাসাউফের নামে, সূফীর নামে, তরিকতের নামে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড ও ভণ্ডামীর প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজ সারাদেশে তাসাউফ বিদ্বেষীরা যেমনি সোচ্চার তেমনি তাসাউফের নামে, সূফীর নামে, তরিকতের নামে বেপর্দা, বেনামাজীরাও সোচ্চার, সক্রিয়, দুনিয়া ভোগে মত্ত।

কিন্তু মহান আল্লাহপাকের খাস অলী হযরত বায়েজিদ (রহ.) দুনিয়াকে পদদলিত করে তাসাউফকে গ্রহণ করেছেন। সাথে সাথে শরীয়তের সীমারেখার বাহিরে পা রাখেননি। এ মহান অলী ২৩৪ হিজরিতে ১০৩ বছর মতান্তরে ৭৪ বছর বয়সে তাঁর জন্মভূমি বোস্তামে ইন্তেকাল করেন।

দেশের ইতিহাসবিদগণ সবাই একমত যে, হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মূল মাজার ইরানে। তবে চট্টগ্রামে যে তাঁর আরেকটি মাজার রয়েছে তা মূলত হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর দেহ মোবারকবিহীন মাজার। এ মাজারের রহস্য উদঘাটন করতে সচেষ্ট হই নিজে চট্টগ্রামের সন্তান হিসেবে। কেউ কেউ লিখেছেন হযরত বায়েজিদ (রহ.) কোন এক সময় চট্টগ্রামে এসে ঐ পাহাড়ে চিল্লা করেছিলেন বিধায় তাঁর সম্মানার্থে এ মাজার। কিন্তু তিনি কখন কিভাবে চট্টগ্রাম আসেন তার ন্যূনতম লেখাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ মন্তব্য করেন, সিন্ধুতে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর ওস্তাদ ও মুরিদ ছিলেন বিধায় তিনি সিন্ধু সফর করেন। পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বলা চলে সিন্ধুকে। কিন্তু সিন্ধু থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব অনেক। সেকালে পারস্য থেকে চট্টগ্রাম আসতে হতো সাগরপথে। অপরদিকে, ইতিহাসবিদগণ গুরুত্ব দিয়েছেন হযরত বায়েজিদ মূলত বারেবারে পশ্চিমে মূলকে শাম ও হেজাজ সফরে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। পারস্যের পূর্বদিকে সফরের তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়না।

এক্ষেত্রে পারস্য থেকে সুদূর চট্টগ্রামে কখন কিভাবে আসলেন ও গেলেন তা বুঝে উঠা কঠিন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর নামের আগে সুলতান ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি মূলত রাজা-বাদশাহ, সুলতান পরিবারের সদস্য ছিলেন না। এতে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ করছেন সুলতান বায়েজিদ নামে অন্য কেউ চট্টগ্রামে সফর করেছিলেন। প্রায় ১৩০০ বছরের ব্যবধানে কালের আবর্তে ঐ সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী হিসেবে ভুল করে চালু হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মূলত চট্টগ্রামের এ মাজার নিয়ে সন্দেহটা রয়েই যাচ্ছে এবং আমি চট্টগ্রামের সন্তান হয়েও পাঠক মহলে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

সেমনান হয়ে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর যেয়ারত

১২ সেপ্টেম্বর '০৫ সোমবার ভোরে তেহরান থেকে ৪২৫ কি. মি. দূরত্বে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর যেয়ারতে যাওয়ার প্রোগ্রাম। গত শুক্রবার ভ্রমণসাথী সাখাওয়াত সাহেবের বন্ধু ও তাঁর ইরানী এজেন্ট তৌহিদী সাহেবের সাথে প্রথমে আলাপ করি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর যেয়ারত নিয়ে। ইরানের অনেক তথ্য আমার জানা থাকলেও হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজার ইরানের কোন্ স্থানে তা আমার জানা ছিল না। অপরদিকে, ইরানে অবস্থানকারী বা ইরান ভ্রমণ করা আমাদের দেশীয় অনেকের সাথে আলাপ করেও হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজারের অবস্থান জেনে নিতে সক্ষম হইনি।

তৌহিদী সাহেবও সঠিক তথ্য দিতে পারলেন না। তবে তিনি ২/১ জায়গায় ফোন করে জানলেন, তেহরান থেকে দু'শ কিলোমিটার পূর্বে সেমনান ইরানের একটি প্রদেশের রাজধানী শহর। ঐ শহর থেকে আরো দু'শ কিলোমিটার পূর্বে শাহরুদ প্রসিদ্ধ শহর। শাহরুদ শহরের নিকটতম কোন স্থানে বাস্তাম নামক গ্রাম রয়েছে এবং সেখানে হযরত বায়েজিদ (রহ.) চিরনিদ্রায় শায়িত। তেহরান থেকে ইরানী ট্যুরিস্ট ম্যাপ ও বই পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করে ও জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিই ট্রেনে বা বাসে করে শাহরুদ শহরে যাব। তথা হতে সংবাদ নিয়ে টেক্সিযোগে বাস্তাম যাব। তেহরান থেকে সেমনান, শাহরুদ হয়ে মা'শাদ পর্যন্ত ট্রেন ও বাস সার্ভিস রয়েছে। কিন্তু শাহরুদে বিমান সার্ভিস নেই। অপরদিকে, সাথী সাখাওয়াত সাহেবও সোয়া চারশত কিলোমিটার দূরত্বে অজানা এলাকায় যেতে ইচ্ছুক নন। তারপরেও আমি সিদ্ধান্ত নিই ট্রেনে বা বাসে শাহরুদ শহরে যাব। তথা হতে টেক্সি করে বাস্তাম যাব বলে। কিন্তু তৌহিদী সাহেব চাপের সাথে পরামর্শ দিতে থাকেন ট্রেনে, বাসে না গিয়ে হোটেলের মাধ্যমে টেক্সি রিজার্ভ করে যেতে। ইরান অপরাধপ্রবণ দেশ না হলেও ভাষায় সমস্যা রয়েছে। এবং শাহরুদ শহর থেকে বাস্তাম কত দূরত্বে তাও জানা নেই। অতএব, হোটেলের মাধ্যমে টেক্সি রিজার্ভ করে যাওয়াটা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। হয়ত ভাড়া বেশী আসবে।

১১ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেল তৌহিদী সাহেবের বন্ধু হামিদ কাবিরী সাহেবের চেম্বারে সাখাওয়াত সাহেবের প্রোগ্রাম। তিনি শিল্পপতি হলেও ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তি। শাহরুদ গিয়েছেন একাধিকবার। প্রোগ্রামে হামিদ কাবিরী বললেন, বাস্তাম

শাহরূদের নিকটে তিনি নিশ্চিত। তবে দূরত্ব কত তার পরিষ্কার জানা নেই। তিনিও তৌহিদী সাহেবের সাথে একমত পোষণ করে আমাকে বললেন, বাসে-ট্রেনে না গিয়ে হোটেলের মাধ্যমে টেক্সি রিজার্ভ করে যেতে। এতে সহায়ক, নিরাপদ। ফলে ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেল তৌহিদী সাহেব হোটেল রিসিপশনে আলাপ করেন এবং টেক্সি বুকিং সেন্টারে টেলিফোন মাধ্যমে যোগাযোগ করে ইংরেজি জানা ড্রাইভারসহ একটি টেক্সি বুক করা হয়। তেহরান সময় মতে ঐ দিন সুবেহ সাদেক হবে ৫.৩৫-এর দিকে। কাজেই রিসিপশনে টেক্সিকে আসার সময় দিলাম ভোর ৬টায়। আমাকে বহনকারী টেক্সি যাওয়া-আসা করবে কিলোমিটার হিসেবে ভাড়ায়।

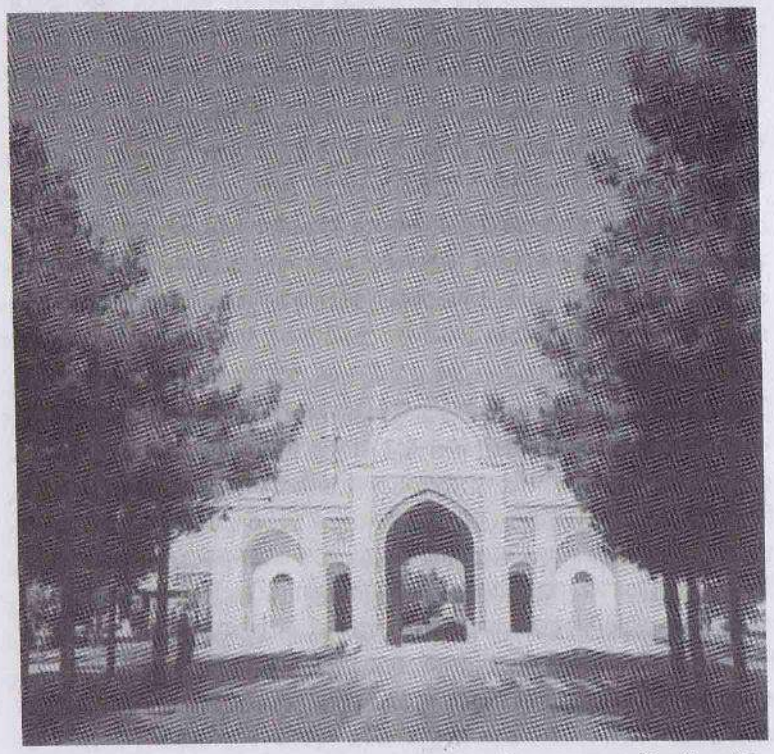

সেমনানে সেকালের একটি প্রসিদ্ধ গেইট

বিকেল থেকে আমার টেনশন বেড়ে যায়। চারশত কিলোমিটার দূরত্বে শাহরূদ শহর। তথা হতে আরো দূরত্বে বাস্তাম পল্লী। তাও শাহরূদ শহর থেকে কত দূরত্বে কারো জানা নেই। শাহরূদ ৪০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে

কক্সবাজার-এর মত দূরত্ব। এবং দিনে দিনে যাওয়া-আসা। শাহরূদ থেকে কতদূরে যেতে হবে তা অজানা। যদি ড্রাইভার খারাপ লোক হয়, যদি বলে গাড়ি খারাপ হয়ে থাকে ইত্যাদি নানা বিষয় মনে জাগছিল। এতে আরো টেনশন বেড়ে যায়। সাখাওয়াত সাহেব আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন না যাওয়ার জন্য। টেনশনে আমার রাতের খাবারও স্বাভাবিক হয়নি। নিরাপত্তার জন্য হোটেল কক্ষের বড় ব্যাগে পাসপোর্ট, টিকেট, ডলার রেখে তালা মেরে দিই। সাথে রাখব বলে ব্যাগের বাইরে রাখি দু'শ ডলার, ইরানী কয়েক হাজার রিয়াল ও ইরানী ভিসাসহ পাসপোর্টের ফটোকপি।

রাতে ভুলক্রমে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সাখাওয়াত সাহেব ঘুমাবার সময় স্বাভাবিক নিয়মে এসি বন্ধ করে দেন। এতে কক্ষের তাপমাত্রা বেড়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় রাত ১২টার দিকে। নানান ভাবনা-চিন্তায় টেনশনে আর ঘুম না আসায় সারারাত বিছানায় এদিক-ওদিক পাশ ফিরে কাটিয়ে দিই। শেষরাতে বিছানা থেকে উঠে তৌহিদী সাহেব প্রদত্ত আঙ্গুর দিয়ে রুটি খেতে থাকি। চনার আকৃতির মত ইরানী ছোট আঙ্গুরগুলো মনে হয় মধুর টুকরা; এত মিষ্টি কবে কোথায় সকালের নাস্তা করব তা অজানা বিধায় খাওয়া যে পথের সহায় সে হিসেবে রুটি ও আঙ্গুর খেতে থাকি। এরি মধ্যে সুবেহ সাদেক হলে ফজরের নামাজ পড়ে নিই। সাখাওয়াত সাহেবও নামাজ পড়ে নিয়ে আমার সাথে লিফ্টযোগে নিচে রিসিপশনে আসেন। তখন ঠিক ভোর ছয়টা এবং ঐ মুহূর্তে হালকা পাতলা গড়নের চালক কারটি হোটেল সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রিসিপশনের সামনে আসলো। বয়স্ক রিসিপশনিস্ট জানতে চাইলে – চালক বলল, সে রাস্তা চিনে এবং ইংরেজি জানে। চালকের নাম বলল আলী রেজা ইব্রাহিম জাদে, আমি সংক্ষেপে আলী রেজা বলতাম।

চালকের সাথে মোবাইল না থাকায় হোটেল রিসিপশনিস্ট চালককে তিরস্কার করল। তখন চালক মোবাইল আনতে ফিরে যেতে চাইলে সাখাওয়াত সাহেবের সাথে পরামর্শ করে চালককে মোবাইলের জন্য না যেতে বললাম। যেহেতু ফিরে গিয়ে মোবাইল যোগাড় করে আনতে ১/২ ঘন্টা বা আরো বেশী সময় লেগে যেতে পারে। অতএব, মোবাইল ছাড়া চালককে নিয়ে যেতে রাজি হলাম। যাওয়ার সময় সাথে হোটেল কক্ষ থেকে ছোট এক বোতল পানি নিয়ে রাখলাম।

হোটেল থেকে বের হওয়া মাত্র দেখলাম কালো রঙের নতুন কার। বৈদ্যুতিক লাইটের আলোতে কারের পেছনে বসে পড়লাম। অজু ছিল; দোয়া দরূদ পড়তে লাগলাম। এরিমধ্যে চালক দ্রুত তেহরান মহানগরী ত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছে। তখন দেখে অবাক হই তেহরান মহানগরে রাস্তায় গাড়ীতে ভরপুর দেখে। ঐ সময় যানজট না থাকলেও দিনের মত কার-বাসে রাস্তা ভরপুর। রাস্তার পার্শ্বে যুবকদের পাশাপাশি যুবতীরাও বাসের প্রতিক্ষারত দেখলাম।

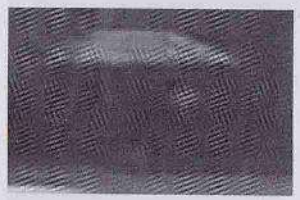

উপরে : বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)'র মাজার কমপ্লেক্স
পার্শ্বে : বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)'র মাজার শরীফ

বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল তেহরান মহানগরী ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে পেছনে ফেলে আমাকে বহনকারী কালো রঙের নতুন কার Devided Highway'র দিকে ধাবিত হতে থাকে। ২০/৩০ মিনিটের মধ্যে শহর পেরিয়ে মরুভূমিতে পৌঁছে যাই। দেখতে পাচ্ছিলাম বাম পার্শ্বে অর্থাৎ উত্তর দিকে কিছুটা দূরত্বে পাহাড় এবং দক্ষিণে মরুভূমি। ভোর প্রায় ৬:৪০টার দিকে সূর্য উদিত হতে বুঝতে পারলেও পাহাড়ের আড়ালে থেকে যায়। চালক টেক্সির গতি দ্রুত বাড়াতে থাকে। কারটি মৃদু কাঁপতে শুরু করে। পেছনের সিটে বসলেও কারের গতির কাঁটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক আইনে স্থলপথে গতি ১২০ কিলোমিটারের বেশী নেয়া বিশেষ কারণ ছাড়া অবৈধ। কিন্তু চালক গাড়ির গতি ১৬০ থেকে ১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠা-নামা করাচ্ছে। কারের মৃদু কম্পনে বুঝতে পারি আমাদের দেশী জাপানী কার না হয়ে ইরানের কিছুটা দুর্বল প্রযুক্তির বিধায় নতুন কার হয়েও মৃদু কাঁপছিল। পিছনের আয়না দু'দিকে বন্ধ করেও সামনের আয়না খোলা থাকায় বাতাস সহ্য করতে পারছিলাম না আর্দ্রতা না থাকার কারণে।

গত শুক্রবার থেকে তৌহিদী সাহেবের গাড়িতে চড়াকালীন গাড়িতে উঠামাত্র সাখাওয়াত সাহেব তৌহিদী সাহেবকে সাথে সাথে বলে দেন দু'পার্শ্বে চার আয়না যেন বন্ধ রাখে। ইরানের মরু অঞ্চলে বাতাসে আর্দ্রতা না থাকায় আমরা অনভ্যস্ত বিধায় বাতাস সহ্য করতে পারতাম না। যেমনটা সিরাজ, ইস্পাহান, হামদান প্রভৃতি শহরে। তবে গীলানে ব্যতিক্রম অনুভব করি অর্থাৎ গীলানে সবুজের সমারোহ এবং চালক গাড়ির আয়না খুলে রাখলে ভাল লাগত বাতাসে আর্দ্রতা থাকার কারণে।

ইরানে কারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রকের ব্যবস্থা থাকলেও ব্যবহার কম করে থাকে। হয়ত দুর্বল প্রযুক্তি বা বিলাসিতায় অনভ্যস্থ কোন একটি হবে। গ্লাস বন্ধ করতে বলায় চালক এ.সি. চালিয়ে দেয়। ইরানে গরমকালের শেষদিকে হলেও তাপমাত্রা ৩০-এর উপরে রয়েছে।

অতি দ্রুততার সাথে প্রায় ৭০/৮০ কিলোমিটার অতিক্রম করার পর আমাকে বহনকারী কার উপরের দিকে উঠতে থাকে। মনে হলো প্রায় ২০/২৫ কিলোমিটার এভাবে উঠল। তবে ভারতের শৈল শহরের মতো খাড়া উচ্চতায় নয়। এরিমধ্যে চালককে বললাম তার অভ্যাসমতো গান-বাজনা ও ধূমপান ইচ্ছা করলে করতে পারে। যেহেতু অভ্যাসকে চেপে রাখা নিরাপত্তার প্রতিকূল হতে পারে। আমার অনুমতি পেয়ে চালক গান চালু করে। করুণসুরে ভাবের গান মনে হচ্ছিল। মনের ভিতর নানান ভয় বিরাজ করতে থাকায় চালকের সাথে মেপে মেপে কথা বলি।

আমরা প্রায় ২০০ কিলোমিটার যাবার পর সকাল ৮টার দিকে সেমনান শহরে প্রবেশ করি। তখন ড্রাইভারকে বললাম রাস্তার ধারে রেস্টুরেন্টের সামনে থামাতে সকালের নাস্তা করার জন্য।

সেমনান ড্রাইভারের পরিচিত শহর বিধায় রাস্তার ধারে এক রেস্টুরেন্টে গাড়ি থামে। ড্রাইভারকে বললাম, আমি রুটি ও মাখন খাব। সে তার রুচিমত যেন উভয়ের অর্ডার দেয়। সাথে চা। ড্রাইভারকে অর্ডার দিতে বলে আমি ওয়াশরুমে (টয়লেট) যাই। দেখি গণ- শৌচাগার হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রয়েছে ফ্ল্যাট কমোড।

ইরানের প্রায় জায়গায় ফ্ল্যাট টয়লেটের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি। টয়লেট সেরে এসে দেখি চালক আমরা উভয়ের জন্য রুটি ও মাখন অর্ডার দিয়েছে এবং টেবিলে খাবার তৈরী।

ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম সেমনান। সেমনানের রাজধানী শহরের নামও সেমনান। এ সেমনানের উপর দিয়ে তেহরান থেকে মহাসড়ক ও রেলপথ খোরাসান প্রদেশের মা'শাদ-এ চলে গেছে। মা'শাদ থেকে আফগানিস্তান ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর বর্তমান স্বাধীন দেশ তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ইত্যাদি দেশে যাওয়া যায়।

আমি মূর্খ, শরিয়তের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না। অতপর মাজার হতে পুনঃ আওয়াজ আসল, হে আবুল হাসান, আমাকে যা কিছু দান করা হয়েছে তা তোমার বদৌলতেই। তখন হযরত খেরকানী বললেন, আপনি আমার অগ্রজ। অতএব, আমার বদৌলতে হওয়ার অর্থ কি? তখন আওয়াজ আসল, হযরত বায়েজিদ দাহিস্তান বা অন্য কোথাও খেরকান হয়ে যেতে সেখানে এক নূর আসমানের দিকে উঠতে দেখতেন। হযরত বায়েজিদ ৩০ বৎসর ধরে আল্লাহপাকের দরবারে একটি মকসুদ চাইতেন কিন্তু তা পূর্ণ হতো না। অবশেষে একদিন খেরকানীর নূরের মর্যাদাকে মকসুদ পূর্ণ হওয়ার উছিলা দিয়ে দোয়া করায় মকসুদ পূর্ণ হয়ে যায়।

হযরত খেরকানী ঐ রাতের ঘটনার পর থেকে ২৪ দিনে কোরান মজিদ তেলাওয়াতের সাথে সাথে মুখস্ত হয়ে যায়। এক ব্যক্তি হাদিস শরীফ শিখবার জন্য ইরাকে গমন করতে হযরত খেরকানীর পরামর্শ চাইলেন। যেহেতু ইরাকে সেকালেও বহু বিখ্যাত মোহাদ্দেস ছিলেন। এতে হযরত খেরকানী বলেছিলেন, তিনি মূর্খ ও নিরক্ষর লোক, কিন্তু আল্লাহতা'আলা তাকে সবকিছু দান করেছেন। তিনি এ সমস্ত এহসান গোপন রাখতে ইচ্ছুক। তারপরেও লোকটি ভাল মনে করলে হযরত খেরকানী (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদীস শরীফ শিখে নিতে পারেন। এতে লোকটি প্রশ্ন করে, হযরত খেরকানী কার কাছ থেকে হাদীস শরীফ শিখেছেন? এতে হযরত খেরকানী বললেন, তিনি স্বয়ং নবী পাক (স.) থেকে হাদীস শরীফ শিখেছেন। এতে লোকটি হতচকিত হয়ে যান। কিন্তু রাত্রে শয়নে লোকটিকে নবী পাক (স.) স্বপ্নে দেখান যে, আবুল হাসান যা বলেছেন ঠিক বলেছেন। পরবর্তী দিন থেকে লোকটিকে হযরত খেরকানী (রহ.) হাদীস শরীফ শিখানো শুরু করে দেন। কোন কোন সময় লোকটি কৌতূহলী হয়ে হযরত খেরকানী (রহ.)-এর থেকে হাদীস শরীফের সত্যতা নিয়ে জানতে চাওয়ায় হযরত খেরকানী বলেছিলেন, তিনি হাদীস শরীফ পড়াকালীন নবী পাক (স.)-এর ভ্রুযুগলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কাজেই হযরত খেরকানীর শিক্ষা সঠিক, তাতে ইতস্ততের অবকাশ নাই।

একবার সুলতান মাহমুদ গজনী খেরকান এলাকায় পৌঁছলে হযরত খেরকানী (রহ.)-কে সুলতানের তাঁবুতে ডেকে পাঠান। কিন্তু হযরত খেরকানী তাঁবুতে গেলেন না। এতে সুলতান নিজে ভৃত্যের পোষাক এবং ভৃত্যকে সুলতানের পোষাক ও ১০ জন বাঁদীকে পুরুষের পোষাক পরায়ে হযরত খেরকানীর দরবারে পৌঁছলেন। কিন্তু হযরত খেরকানী সালামের জওয়াব বাদে তেমন সম্মান প্রদর্শন করেন নি। ভৃত্যবেশী সুলতান পোষাকের সুলতানকে সম্মান না করা প্রসঙ্গে বললে হযরত খেরকানী বললেন, সবইতো নকল। আরও বললেন, পুরুষবেশী নারীদেরকে সেখান থেকে সরায়ে দিতে। এতে সুলতান মাহমুদ হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং হযরত খেরকানীর নিকট সুলতানী দাম্ভিকতা পরিহার করে দোয়া প্রার্থী হন। তখন হযরত খেরকানী সুলতান মাহমুদ গজনীকে চারটি উপদেশ দেন:

১. নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।
২. জামাতে নামাজ পড়া।
৩. মানুষের প্রতি দয়া-দানশীলতার প্রাধান্য দেওয়া।
৪. মানুষের প্রতি মমত্ববোধ বজায় রাখা।

সুলতান মাহমুদ হযরত খেরকানীকে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া প্রদান করেন। কিন্তু হযরত খেরকানী তা গ্রহণ না করে বরং উল্টা সুলতান মাহমুদকে তার একটি খেরকা হাদীয়া দেন এবং সুলতান মাহমুদকে বিদায়কালীন সম্মান প্রদর্শন করায় সুলতান হতবাক হয়ে জানতে যান, আগমনের বেলায় তাচ্ছিল্য করলেন, যাওয়ার বেলায় সম্মান করছেন। তখন হযরত খেরকানী বললেন, আগমনের সময় সুলতানী ভাব ছিল। যাবার সময় ফকিরের মনোভাব নিয়ে যাচ্ছেন বলে।

হযরত খেরকানী (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন বিশ্বখ্যাত অপর মহান অলি দার্শনিক ও কবি হযরত ফখর উদ্দিন রাজী (রহ.)। কথিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ বায়াত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে গেলে তার দর্শনকাব্য থেকে বিচ্যুত হতে হবে। ফলে তিনি হযরত খেরকানী (রহ.) থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। হযরত রাজী (রহ.) মৃত্যুশয্যায় (সকরাত) শয়তান ঈমান হরণ করতে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিতে থাকলে এ মহান দার্শনিক ও কবি আল্লাহর একত্ববাদের পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি পেশ করতে থাকেন। এভাবে ৩৬০টি অকাট্য দলিল পেশ করে। তার পেশ করা দলিল শয়তান একের পর এক খণ্ডন করতে থাকে। ফলে হযরত রাজী (রহ.) অনন্যোপায় হয়ে তিনি তাঁরই শ্রদ্ধাভাজন পীর আবুল হাছান খেরকানী (রহ.) প্রতি মনোনিবেশ করেন। সাথে সাথে তাঁর মহান পীর অলি আধ্যাত্মিকভাবে জানিয়ে দেন যে – "বেলাদলিলে অর্থাৎ সমস্ত যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হযরত ফখর উদ্দিন রাজী (রহ.) উক্ত রূপ দাবী পুনরাবৃত্তি করতে করতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.)-এর বিশাল কারামতের ভাণ্ডার থেকে মাত্র কয়েকটি কারামত পেশ করলাম।

যেয়ারত : ১২ সেপ্টেম্বর '০৫ সোমবার ভোরে তেহরান থেকে রওয়ানা দিয়ে প্রায় ৪২৫ কি. মি. পূর্বে শাহরূদ শহরের নিকটে বাস্তামে পৌঁছি হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (রহ.)-এর যেয়ারতে। দুপুরে যেয়ারত পর্ব শেষ করে খাদেমগণ-এর সাথে আকারে- ইঙ্গিতে আলাপ শুরু করি। এবং এতে অবগত হই যে, বিশ্বখ্যাত মহান অলি হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ মাত্র ১৫/২০ কি. মি. দূরতে এবং যোগাযোগও ভাল। তৎক্ষণাৎ মাজার কমপ্লেক্সের বাইরে গিয়ে ড্রাইভার ডেকে এনে বললাম, আমি হযরত খেরকানী (রহ.)-এর যেয়ারতে যাব। আপনি খাদেমগণ থেকে রাস্তার নির্দেশনা জেনে নিন।

তেহরান থেকে আগমনকালে টেনশন থাকলেও বাস্তামে পৌঁছলে টেনশন কেটে যায়। হাতে প্রচুর সময় ট্যাক্সিও কিলোমিটার হিসাবে। অতএব, চালককে নির্দেশের

তেহরান থেকে প্রায় ২ শত কি. মি. পূর্বে এ প্রাচীন শহর সেমনান; সেমনানে রয়েছে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস, হযরত সৈয়দ আশরফ জাহাঙ্গীর এ সেমনানেরই বাসিন্দা। তিনি পারস্য থেকে হিজরত করে বাংলায় চলে আসেন। বাংলার প্রাচীন রাজধানী পান্ডুয়ার মহান অলি হযরত শেখ আলাওল (রহ.)'র হাতে বায়াত হন। অতপর এতদঅঞ্চলে থেকে যান। উত্তর প্রদেশের সাবেক বিখ্যাত ফয়েজাবাদ জেলার আমবেদকর নগরে হযরত সৈয়দ আশরফ জাহাঙ্গীর সেমনানী (রহ.)-এর বিশাল মাজার কমপ্লেক্স রয়েছে।

প্রাদেশিক রাজধানী শহর সেমনানে নাস্তা করাকালীন ড্রাইভার রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার থেকে জানতে চায় শাহরূদ থেকে বাস্তাম কত দূরে। তখন ম্যানেজার বলল ৩০ কি. মি. হতে পারে। তাদের কথোপকথন ফারসীতে হলেও আমি বুঝে নিতে পারি। আমি পারতপক্ষে ড্রাইভারের সাথে কথা বলা এড়িয়ে চলি।

সেমনান শহরের আগে পুলিশ আমাদের গাড়ি থামিয়ে চালককে জরিমানা করে অতি দ্রুত গাড়ি চালানোর অজুহাতে। তারপরও ড্রাইভার দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে থাকে। শাহরূদ শহরে পৌঁছার আগে পুনরায় অন্য পুলিশ আমাদের গাড়ি থামিয়ে চালককে জরিমানা করে ঐ একই কারণে। তখন আমার ভয় হচ্ছিল পুলিশ যদি জানতে চায় কোথায় যাচ্ছি, কেন বিদেশীকে একাকি চালক নিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশী জেএমবি নেতা ইরানে এসে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কি না, আমাকে তেহরানে ফেরত পাঠায় কি না এসব চিন্তা নিয়ে ভয় হচ্ছিল আমার মনে মনে। কাজেই আমি ঘাড় বাঁকা করে চালক-পুলিশের কথোপকথন প্রত্যক্ষ করতাম।

তেহরান থেকে শাহরূদ পর্যন্ত এ ৪০০ কি. মি. দূরত্বে রাস্তার পাশে অগণিত পরিবারকে গাড়ি নিয়ে যাত্রাবিরতি করতে দেখি। এতে প্রতীয়মান হয় ইরানীরাও ভ্রমণপিপাসু। বিশাল দেশ বিধায় একস্থান থেকে অন্যস্থান বা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে তাদের নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাতায়াতকালে পরিবার পরিজন নিয়ে যাত্রাবিরতি করতে হচ্ছিল।

তেহরান থেকে সেমনান পর্যন্ত পৃথক যাওয়া-আসা দুটি রাস্তা তিন লাইনের। তবে ত্রিমুখী স্থানে উন্নত বিশ্বের মত ওভারব্রিজ না থাকায় দূর থেকে লাল বাতি দেখে গতি কমাতে হত চালককে। কিন্তু সেমনান থেকে শাহরূদ ২০০ কি. মি. রাস্তা পুরোটা পৃথক পৃথক যাওয়া-আসার রাস্তা নয়। ৩/৪ স্থানে পৃথক রাস্তা নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় ২০/৩০ কি. মি. করে চট্টগ্রাম-ঢাকার মত একই রাস্তায় যাওয়া-আসা। এসব স্থানে ৭০/৮০ কি. মি. গতি থাকলেও ভয় পেতে থাকি সামনের গাড়িকে অতিক্রম করার সময়। অর্থাৎ ওভারটেক করার সময় সামনে থেকে অপরদিকের গাড়ি দ্রুত এসে পড়ে এ ভয়ে। এ ৪০০ কি. মি. রাস্তায় ৩০/৪০ কি. মি.পরপর দোকান-পাট, পেট্রোল পাম্প ইত্যাদি চোখে পড়ছিল। তবে শহর/উপশহর বাদে লোকালয় কম প্রত্যক্ষ করি। দুপুর ১২টার দিকে আমরা শাহরূদ

শহরে প্রবেশ করি এবং চালক বাইপাস সড়ক দিয়ে না গিয়ে শাহরূদ শহরের ভিতরের রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। শাহরূদ সেমনান প্রদেশের একটি বিখ্যাত জেলা শহর। এর উত্তরে আলবুরুজ পর্বতমালা দক্ষিণে লবণ মরুভূমি। তেহরান থেকে ৪ শত কিলোমিটার পূর্বে শাহরূদ শহর।

শাহরূদ অতি প্রাচীন শহর নয়। পর্বতের সন্নিকটে সবুজের সমারোহ বিধায় আবহাওয়া মনোরম। শাহরূদ শহর অতিক্রমকালে চালক রাস্তা সংলগ্ন এক টেক্সিচালকের কাছ থেকে জানতে চাওয়া মাত্র ঐ টেক্সিচালক বলল বাস্তাম শাহরূদ শহরের একদম নিকটে এবং সংক্ষেপে রাস্তার দিকনির্দেশনা দেখিয়ে দিল। আমি চালক থেকে তা জেনে নিয়ে খুশি হই। যেহেতু ৪০০ কি. মি. পথ আমি খুব টেনশনে ছিলাম – বাস্তাম কত দূরে, কবে পৌঁছব এসব নিয়ে। তেহরানে ৭:৪০ মিনিটে মাগরিবের নামায। অতএব তেহরান ফিরতে হাতে বহু সময় রয়েছে। শাহরূদ সবুজের সমারোহ শহর অতিক্রম করে আমরা একটি চৌরাস্তা পাই। ঐ রাস্তার মাঝখানে বামদিকে তীর চিহ্নিত BASTAM লেখা চোখে পড়ে। এতে আমার খুশি আরও বেড়ে যায়। চালক বামদিকে কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার ধারে পথিক থেকে জেনে নেয় যে, সামনের অপর চৌরাস্তার পাশে দেওয়ালঘেরা হল হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজার। তখন চালক সামনে গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার বামপাশে থামায়। ঐ সময় সম্ভবত দুপুর সোয়া ১২টা হবে। আমি সাখাওয়াত সাহেব প্রদত্ত ক্যামেরা সাথে নিয়ে রাস্তা সংলগ্ন মাজারের প্রকাণ্ড গেট পার হতেই বিশাল এরিয়া নিয়ে মাজার কমপ্লেক্স দেখতে পাই। গেট থেকে প্রায় ১৫০/২০০ ফিট দূরত্বে মাজার। সোজা গিয়ে মাজারে প্রবেশ করে হযরত বায়েজিদের মাজার নিশ্চিত হতে খাদেমগণ থেকে জানতে চাওয়ায় বলল মাজারের অভ্যন্তরে হল হযরত ইমামজাদা মুহাম্মদ বিন ইমাম জাফর সাদেক (র.)। তাঁকে ঘিরে মাজার। মাজারের বাহির চত্বরে ছোট আকারে স্টিলের ছাউনি ও ঘেরার ভিতর হল হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজার। তাঁর নিকটে মুঘল বাদশাহ-এর ভ্রাতা মতান্তরে পুত্র হুমায়ুন শাহ্-এর কবর। প্রায় ২০০/৩০০ বছরের মোঘল আমলের নানান যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মোগল সম্রাট পরিবারের কোন না কোন সদস্য পালিয়ে পারস্য ফিরে যাওয়া স্বাভাবিক বলা যেতে পারে।

আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর যেয়ারত হলেও সেখানে আওলাদে রাসুল (স.) এবং ইমামজাদা শায়িত থাকায় প্রথমে তাঁর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মাজারে প্রবেশ করি। যেয়ারত শেষ করে মাজারের বাহির চত্বরে এসে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর ছোট আকৃতির মাজারের ভিতর প্রবেশ করে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে দোয়া-দরূদ ও মোরাকাবা করি। হাতে প্রচুর সময় বুঝতে পেরে মন থেকে তাড়াহুড়া দূর হয়ে যায়। যেয়ারতে সময়ক্ষেপণ করে প্রশান্ত মনে মাজার কমপ্লেক্সের এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকি। দেখলাম প্রায় ৩/৪ একর এরিয়া নিয়ে সমতলে বিশাল মাজার কমপ্লেক্স – তথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুসাফিরখানা

ইত্যাদি রয়েছে। নারী-পুরুষ-শিশু মিলে যেয়ারতে সমাগম প্রত্যক্ষ করি। শাহরূদ ও বাস্তাম পাহাড়ি এলাকা হলেও হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজার কমপ্লেক্স সমতলভূমিতে এবং শাহরূদ শহর সম্প্রসারিত হয়ে বাস্তামকে উপশহর বলা যেতে পারে। ইরানে যেহেতু সীমান্ত এলাকা বাদে সুন্নিগণের আনাগোনা নেহায়েত কম কাজেই অন্যান্য মাজারের মত এখানে শিয়া নিয়ন্ত্রিত হওয়া স্বাভাবিক। শিয়াদের কাছে ইমাজাদার সম্মান মূল্যায়ন ধারণাতীত উপরে ও অতীব শ্রদ্ধাবনত দেখে থাকে। কাজেই হযরত বায়েজিদ (রহ.) বিশ্বখ্যাত আল্লাহর অলি হয়েও মাজার এলাকায় যেয়ারতে সমাগম ইমাজাদার পরে হওয়া স্বাভাবিক।

ইরানের অন্যান্য মাজারের মত এখানেও চাঁদার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শিয়াগণ ইমামজাদাগণের মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনে অকাতরে দান করে থাকে। ফলে অন্যান্য মাজারের মত এখানেও মাজারের বিশালত্ব ও চোখ ঝলসানো সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি।

দীর্ঘক্ষণ যেয়ারতে সময়ক্ষেপণ করে হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.)-এর যেয়ারতে রওনা করি। প্রায় ১৭/১৮ কি. মি. দূরত্বে তথায় যেয়ারত সমাপ্ত করে পুনরায় বাস্তাম হয়ে শাহরূদ শহরে প্রবেশ করি। রাস্তার ধারে ভাল রেস্টুরেন্ট চোখে না পড়ায় সেমনান শহরের দিকে এগুতে থাকি।

সেমনান শহরের নিকটে এসে এক রেস্টুরেন্টে ড্রাইভারসহ দুপুরের খাবার খেতে প্রবেশ করি অনেকটা বিকেলের দিকে। এ রেস্টুরেন্টেও প্রবেশ করে সকালের মত চালককে একই কথা বলি যে, আমার জন্য রুটি ও বাটার অর্ডার দিতে এবং চালক তার রুচিমত খেতে পারে। টয়লেট সেরে ফিরে এসে দেখি একই টেবিলে আমার জন্য রুটি, বাটার এবং চালকের জন্য ভাত, গোশতের কাবাব, সালাদ ইত্যাদি। আমাদের মত অন্যান্য পথিকও যাত্রাবিরতি দিয়ে খাবার খেতে প্রত্যক্ষ করি। আমি ব্যতিক্রম রুটি ও মাখন দিয়ে খেলেও তাদের খাবারে গোশত-সালাদ থাকবেই এবং খাবারের পরপর দুধবিহীন চা। আমি ও চালক একই টেবিলে খাওয়াকালীন চালক থেকে সামান্য গোশত খেয়ে টেস্ট বুঝলাম। বুঝলাম রান্না আমার রুচির অনুকূল। যেহেতু ইরানিরা এ উপমহাদেশের অধিকাংশের মত ঘি, তেল, মসল্লা ইত্যাদি কম খেয়ে থাকে যা আমার রুচির সাথে মিলে যায়। তারা সাদা ভাতের উপরিভাগে অল্প মিষ্টি ভাত দিয়ে থাকে। ইরানি খাবার নিয়ে অন্য সময় লিখব আশা করি। দুপুরের খাবার শেষে চালক দ্রুততার সাথে সেমনানের দিকে চলতে থাকে এবং আমি বলায় চালক বাইপাস দিয়ে না গিয়ে সেমনান প্রাদেশিক রাজধানী শহরে প্রবেশ করে শহরের ভিতর দিয়ে যেতে থাকে। এতে প্রাদেশিক শহরটি মোটামুটি দেখে নিতে আমার সহজতর হয়।

সেমনান ও শাহরূদ উভয় শহর দেখে মনে হল সেমনান প্রাদেশিক রাজধানী শহর হিসেবে বড় হলেও সুন্দর ও সবুজের সমারোহে শাহরূদকে আমার কাছে সুন্দর শহর মনে হয়েছে।

পরবর্তী ইস্পাহান, সিরাজ, হামেদান, গীলান, কোম ইত্যাদি অঞ্চলে ভ্রমণ করে বুঝতে পারি যে ইরানের পূর্বাঞ্চল তুলনামূলকভাবে অনুন্নত। যেমনি রাস্তাঘাট, তেমনি ঘরবাড়ি ও নানান অবকাঠামো।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে অনায়াসে বুঝা যায় বিশ্বের প্রাচীন জনপদ মুলকে শামের নিকটে তথা পূর্বে তেহরান। তেমনি প্রাচীন শহর জনপদ ইস্পাহান, হামেদান, তাবরীজ ইত্যাদি যা তেহরানের দক্ষিণে ও পশ্চিমে। সেকালে তেহরানের পূর্বদিকের প্রসিদ্ধির ইতিহাস আছে বলে মনে হয় না। অপরদিকে মরুপ্রবণ এলাকা তেহরানের পূর্ব ও দক্ষিণে বেশি বলতে পারি। কাজেই ইরানের পূর্বাঞ্চল তুলনামূলক পিছিয়ে রয়েছে বলে আমার অনুমান। যাওয়ার পথে তেহরান-সেমনান ভোরে হওয়ায় চোখে পড়েনি। কিন্তু সেমনান থেকে শাহরূদ যেতে রাস্তার পার্শ্বে নিকটস্থ বাগানের ফলমূলের স্তুপ চোখে পড়ছিল পথিকের কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে টেনশন থাকায় ফলের স্তুপ চোখে পড়লেও জানতে আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বিকেলে ফিরবার সময় পথে পথে ফলাফলারির স্তুপ আরও বেশি চোখে পড়ছিল এবং স্তুপের প্রায় ২০০/৩০০ মিটার আগে রাস্তার পার্শ্বে একজন দাঁড়িয়ে ফলের সেম্পল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পথিক তথা হাইওয়ের যাত্রীরা যাতে বুঝতে পারে সামনে ঐ সেম্পলের ফল সস্তায় কিনতে পারা যাবে। ফিরবার পথে মন উৎফুল্ল থাকায় চালককে বলে দুই-এক জায়গায় ফল ফলারের স্তুপের নিকট থামি। দেখলাম স্তুপগুলোর মধ্যে কোন কোনটি আঙ্গুর, তরমুজ, পেস্তা বাদাম ইত্যাদি। পেস্তা বাদাম কড়া রোদে শুকিয়ে চামড়া-খোসা ফেটে আমাদের দেশে আসে। খোসা ছাড়াও আসে। ঐখানে বাগান থেকে সদ্য আনায় নরম খোসা প্রত্যক্ষ করি। জানলাম আমাদের দেশীয় ৬০/৭০ টাকা কেজি হবে বিনিময় হিসেবে। তবে কেনার উদ্দেশ্যে দরদাম করলে ৩০/৪০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যেত বলে মনে হয়। তরমুজ, আঙ্গুর ইত্যাদি দেশে আনার প্রশ্নই আসে না। তবে পেস্তা বাদাম বহন করে আমিরাত হয়ে দেশে আনা ঝামেলা এবং শুকানো হয়নি বিধায় নষ্ট হতে পারে মনে করে ক্রয় করিনি। হাইওয়ের উত্তর পার্শ্বে পাহাড়ের পাদদেশে অসংখ্য বাগান প্রত্যক্ষ করছিলাম। সেচের বা গভীর নলকূপের পানি দ্বারা ফলিত ইরানের ফল বিশ্বখ্যাত।

সেমনান থেকে তেহরান পৃথক পৃথক দ্বিমুখী রাস্তা হওয়ায় চালক সেই একইভাবে ১৬০/১৮০ কি. মি. গতিতে গাড়ি চালাতে শুরু করে তার অভ্যাসবশতঃ। ফলে পুলিশ কর্তৃক চালক তৃতীয়বারের মতো জরিমানার সম্মুখীন হয়। তারপরও চালকের গতি কমিয়ে গাড়ি চালানোর বোধোদয় হচ্ছিল না। আমাকে বহনকারী কার তেহরানের নিকটে আসলে খুশিমনে চালককে বললাম সামনের রবিবার অর্থাৎ এক সপ্তাহ পর হামেদান যাব গাড়িযোগে। এতে চালক খুশিমনে সম্মত হয়ে হোটেল থেকে টেলিফোনে বুক করতে তার কথা বলতে বলে। আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম করা আছে পরদিন মঙ্গলবার কোম এবং বুধবার থেকে শনিবার ইস্পাহান,

সিরাজ এবং সোম, মঙ্গল গিলান। কাজেই রবিবার তেহরানে থাকব বিধায় ৩৩৭ কি. মি. দূরত্বে হামেদান যাব বলে মনে মনে স্থির করি।

বিকাল ৭টার পরপর আমরা তেহরান শহরে প্রবেশ করে সূর্যাস্তের আধঘন্টা আগে হোটেলে পৌঁছি। হোটেল রিসিপশনিস্ট চালক আলী রেজা ইব্রাহিম জাদে-এর সাথে আলাপ করে ৯৫ আমেরিকান ডলার ভাড়া স্থির করে। আমি তা প্রদান করে তৌহিদী সাহেবের মাধ্যমে সাখাওয়াত সাহেবকে টেলিফোনে আমার আগমনের সংবাদ জানিয়ে হোটেল কক্ষে প্রবেশ করি। কিছুক্ষণের মধ্যে সাখাওয়াত ও তৌহিদী সাহেব বাহির থেকে হোটেল কক্ষে ফিরে আসে। আমি স্বল্প সময়ে এতদূর অর্থাৎ প্রায় ৯০০ কি. মি. যাওয়া-আসা জার্নি করতে পারায় তাঁরাও হতচকিত হন। বিশেষ করে তৌহিদী সাহেব। তাঁর ধারণা ছিল কম করে হলেও রাত ১০টা/১১টা হবেই।

হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) ও তাঁর যেয়ারত

ইরানের শাহরূদ শহর থেকে প্রায় ৩০ কি. মি. দূরত্বে পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্বখ্যাত মহান অলি হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) চিরনিদ্রায় শায়িত।

তাঁর মোবারক জীবনের কারামতের ভাণ্ডারে দৃষ্টি দিলে চমকিত হতে হয়। এই মহান অলি জীবনের একটি বড় অংশ হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজারে ধ্যানে কাটিয়ে দেন। অপরদিকে তাঁর জন্মের বহু আগে হযরত বায়েজিদ (রহ.) তাঁর জন্মের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

আমাদের দেশের বিভিন্ন গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করেও তাঁর জীবনের কারামত বাদে জন্ম, ইন্তেকাল, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির কথা জানতে পারিনি। তবে তিনি যে বিশ্বের বুকে একজন মহান অলি তা সর্বজনস্বীকৃত।

হযরত আবুল হাসান আলী খেরকানী (রহ.) বিশ্বাসে ও নিয়তে পর্বতের ন্যায় অটল-অবিচল থাকতেন। তাঁকে সুলতানুল মাশায়েখ এবং আবদাল ও আওতাদগণের কুতুব বলা যায়। তিনি সর্বদা রিয়াজত এবং সাধ্য-সাধনায় নিজের দেহকে নিয়োজিত এবং মনকে সর্বদা আল্লাহপাকের জিকিরে ও ধ্যানে মশগুল রাখতেন। তিনি অত্যন্ত বেপরোয়া ধরণের উচ্চ সাহস এবং অতি উচ্চ মর্যাদাশীল বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহপাকের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব অসাধারণ। আল্লাহপাকের দরবারে তাঁর আবদার এত নির্ভীক ছিল যা বর্ণনাতীত।

প্রতি বছর হযরত বায়েজিদ (রহ.) দাহিস্তান যেয়ারতে যেতেন। সেখানে বহু শহীদের মাজার রয়েছে। যখন তিনি খেরকান অতিক্রম করতেন তখন সেখান থেকে নিঃশ্বাস উপরের দিকে টানতেন গভীর ঘ্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে। সহযাত্রীর প্রশ্নে হযরত বায়েজিদ বলতেন, এ চোরদের গ্রাম হতে এমন এক ব্যক্তির ঘ্রাণ পাচ্ছেন যিনি তার চেয়ে তিন স্তর উচ্চে হবেন। তিনি হলেন হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.)।

হযরত খেরকানী (রহ.) প্রথম জীবনে ২০ বৎসর এমন দৃঢ় অভ্যাসে ছিলেন যে, খেরকানে এশার নামাজ জামাতে পড়ে হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজারে গমন করতেন এবং মাজারে দাঁড়িয়ে আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করতেন যাতে হযরত বায়েজিদ-এর প্রাপ্তির কিছু পরিমাণ হলেও তিনি প্রাপ্ত হন এবং এশার নামাজের ওযুসহ ফজরের জামাত খেরকানে পড়তেন।

১২ বৎসর এই নিয়ম পালন করার পর একরাতে হযরত বায়েজিদের কবর হতে আওয়াজ আসল – হে আবুল হাসান, এখন তোমার একস্থানে বসে পড়ার সময় এসে গেছে। তখন হযরত খেরকানী বললেন, হে বায়েজিদ হিম্মত দান করুন,

সুরে বলতে ইতস্তত নেই। চালকও খাদেমগণ থেকে হযরত খেরকানী (রহ.)-এর মাজারের অবস্থান জেনে নিয়ে ঐদিকে রওয়ানা হয়ে যাই। খেরকানের অবস্থান বাস্তাম থেকে উত্তরদিকে মনে হচ্ছিল। বাস্তাম শাহরূদের নিকটের শহরতলী এলাকা মনে হলেও হযরত খেরকানী (রহ.)-এর যেয়ারতে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল শহর ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে যাচ্ছি। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট পাড়া, রাস্তায় তেমন দোকানাদি নাই। উভয়মুখী একই রাস্তা হলেও রাস্তার অবস্থা ভাল। গাড়ির সংখ্যা কম থাকায় চালকের ৬০/৭০ কি. মি. বেগে টেক্সি চালাতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

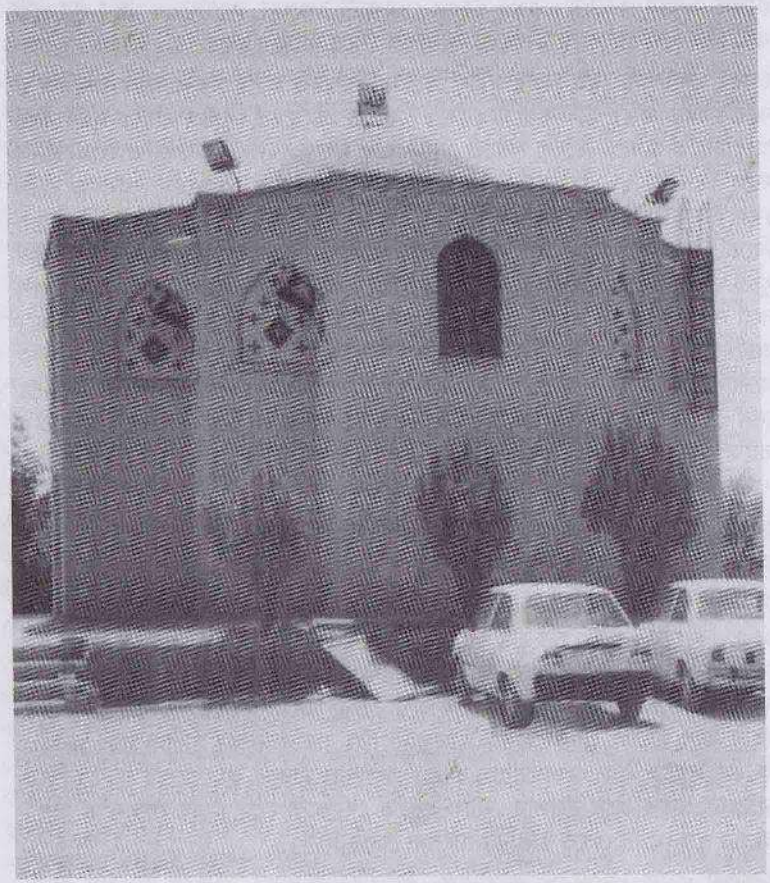

অত্র মসজিদের বারান্দায় হযরত আবুল হাসান হেরকানী (রহ.)'র মাজার শরীফ

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকেই সারা ইরানে উন্নয়নের জোয়ার শুরু হয়, তা আগে অন্যখানে উল্লেখ করা আছে। তেমনিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থাও। এ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সুন্দর মসৃণ রাস্তা মনে হয় অতি সম্প্রতি নির্মিত। চালক ১০/১৫ কি. মি. যাওয়ার পর পথিক থেকে ২/৩ বার জানতে চায়। অবশেষে রাস্তার নিকটে দাঁড়ানো এক পথিক থেকে জানতে চাওয়ায় পথিকের বাড়ি হযরত খেরকানী (রহ.)-এর মাজারের নিকটে বললেন এবং গাড়িপ্রাপ্তির জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বলায় চালক আমার অনুমতি নিয়ে তাকে গাড়ির সামনের সিটে তুলে নেয়। আমি যেমনি চালক ভাল নাকি খারাপ লোক এ নিয়ে চিন্তায় আছি, তেমনি চালকও আমি বিদেশী হোটেলের মাধ্যমে এসেছি বিধায় কড়া আইনের কারণে হয়তো আমার প্রতি ভয়ভীতি রাখছে বুঝতে পারি।

হযরত খেরকানীর মাজারের নিকটের পথিক চালকের সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। এতে আমি কিছুটা ভীত হই। যেহেতু প্রত্যন্ত এলাকা এবং আমি বিদেশী একা, সাথে টাকা-পয়সা থাকা স্বাভাবিক। কাজেই মনে খারাপ পরিকল্পনা অসম্ভব নয় বিধায় মনের গভীরে ভয় অনুভব করতে থাকি। প্রধান রাস্তা থেকে বামদিকে গ্রাম্য রাস্তায় প্রবেশ করে প্রায় ১ কি. মি. যাওয়ার পর পাড়া চোখে পড়ে। গ্রাম্য রাস্তার দুইধারে পাড়ায় প্রবেশ করায় পথিক নেমে যান। নামার পথে চালককে দূরে হযরত খেরকানী (রহ.)-এর মাজার দেখিয়ে দেন। পথিকের দিকনির্দেশনা মতে চালক পাড়ার আঁকাবাঁকা পাকা রাস্তায় যেতে থাকে। পাড়া অতিক্রম করে পাহাড়ের দিকে উঠতে থাকে আবার আঁকাবাঁকা পথে। কম করে হলেও আধা কি. মি. পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে উপরের দিকে যাওয়ার পর মসজিদ চোখে পড়ে। ২/৩টি গাড়ীও দেখা যাচ্ছিল। মসজিদের নিকটে আমাদের গাড়ি থামালে হাঁটতে শুরু করি। দেখি ১০/১৫ জন যেয়ারতকারী রয়েছে তখন এবং মসজিদের বাম পাশের বারান্দায় হযরত খেরকানী (রহ.)-এর কবর শরীফ। মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পড়ে যেয়ারতে মনোনিবেশ করি।

তরীকতের তরতীবে দোয়া-দরূদ পড়ে মোরাকাবায় বসি হযরত বায়েজিদ (রহ.)-এর মাজার এলাকার মতো। দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে পড়ি এবং বাস্তাম, শাহরূদ, সেমনান হয়ে তেহরানের দিকে ফিরে আসতে থাকি।

কোমে প্রখ্যাত দুই আয়াতুল্লাহর মুখোমুখি

১৩ সেপ্টেম্বর '০৫ মঙ্গলবার সারাদিন কোম শহরকে নিয়ে প্রোগ্রাম। ইরান গমনকালে কয়েকটি পরিকল্পনা মনের গভীরে ছিল। তৎমধ্যে একটি হলো ইরানী বিজ্ঞ আয়াতুল্লাহর সাথে শিয়া বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করা।

সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবের বন্ধু ও ইরানী এজেন্ট তৌহিদী সাহেবের সাথে শিয়া বিষয়ে আলাপ করায় তিনি পরামর্শ দিলেন এই বিষয়ে হামিদ কাবিরির সাথে আলাপ করতে। ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেলে তৌহিদী সাহেবের মাধ্যমে হামিদ কাবিরির সাথে প্রোগ্রাম সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে। হামিদ কাবিরি যেমনি একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি তেমনি একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও বটে।

সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক কথার পর দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয় শিয়া আকিদা/বিশ্বাস নিয়ে। আমি একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ আয়াতুল্লাহর সাথে আলাপের আগ্রহ দেখাই। এতে হামিদ কাবিরি খুশিমনে প্রোগ্রাম করলেন পরশু মঙ্গলবার কোম যাবেন আমাদের নিয়ে। যেহেতু কাল সোমবার বললেও আমার বাস্তাম যাবার প্রোগ্রাম করা আছে এবং বুধবার থেকে চার দিনের ইস্পাহান ও সিরাজের প্রোগ্রাম মতে ইরান এয়ারে টিকেট করা রয়েছে। রবিবার সড়কপথে হামাদানের প্রোগ্রাম, সোম-মঙ্গল দু'দিন গীলান প্রদেশে ভ্রমণের প্রোগ্রাম। কাজেই পরশু মঙ্গলবার প্রোগ্রাম ঠিক রাখতে হলো কোম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। হামিদ কাবিরির নিবাস কোম-এ এবং তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রখ্যাত আয়াতুল্লাহ মোস্তফা নাজাফী। সাখাওয়াত সাহেবের সাথে আলাপে একমত হই সকাল ৭:৩০ মিনিটে কাবিরি সাহেব আমাদেরকে হোটেল হতে তুলে নেবেন।

আমাদের হোটেল এর রেস্টুরেন্ট খুলবে সকাল ৭.০০টায়। এখানে উল্লেখ্য, তিন তারকা মান বা তার উর্ধ্বের হোটেলে অবস্থান করলে সকালের নাস্তা ভাড়ার ভিতর ফ্রি হিসেবে দেয়া সাধারণ নিয়ম। সেই মতে সকালের নাস্তার জন্য রেস্টুরেন্ট চালু থাকবে সকাল ৭:০০টা থেকে ১০:০০টা পর্যন্ত। ইরানে খাওয়া-দাওয়া আমাদের

দেশীয় অনেকের রুচির প্রতিকূল হলেও আমার রুচির অনুকূল। বিশেষ করে সকালের নাস্তা। সকালের নাস্তায় ১৫/২০ প্রকারের প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার প্রকৃতই যেমনি রুচিশীল তেমনি শারীরিক সহায়ক।

আমরা সকাল ৭টার পরপর নিচে এসে সেলফ্ সার্ভিসে নাস্তাপর্ব সেরে রুমে ফিরে যেতেই নিচের রিসেপশন থেকে কক্ষে ফোন আসে কাবিরি সাহেব এসে গেছেন কোম যাবার উদ্দেশ্যে। আমরাও মোটামুটি প্রস্তুত ছিলাম বিধায় বিলম্ব না করে রিসেপশন সংলগ্ন ভিজিটর রুমে চলে আসি এবং কাবিরি সাহেবসহ আমরা তিনজন তেহরান থেকে প্রায় ১৬০ কি. মি. দক্ষিণে ইরানের ধর্মীয় শহর কোম এর দিকে দ্রুত যেতে থাকি।

কোম হয়ে ইরানের এক মহাসড়ক তেহরান থেকে ইস্পাহান, সিরাজের দিকে চলে গেছে। অপর সড়ক গেছে কেরমানের দিকে। তেহরানের প্রাণকেন্দ্র তথা আমাদের হোটেল থেকে প্রায় ৫০/৬০ কিলোমিটার যাবার পর মহাসড়কের নিকটে নতুন নির্মিত ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।

কাবিরি সাহেব ভাল ইংরেজী জানেন এবং ব্যবসায়িক কারণে বিদেশেও গিয়ে থাকেন। ফলে তাঁর সাথে নানান আলাপ চলছিল গাড়ি চলাকালীন। গাড়ির গতি তিনি ১০০ থেকে ১২০ কি. মি.-এর মধ্যে রাখতে সচেষ্ট মনে হচ্ছিল আইন ও নিরাপত্তার খাতিরে।

ইমাম খোমেনী বিমানবন্দর অতিক্রম করে কিছুদূর যাবার পর রাস্তার বামপার্শ্বে আমাদেরকে সল্ট লেক দেখাল গাড়ি চলাকালীন। ইরানে এরকম ছোট-বড় আরো কতেক সল্ট লেক রয়েছে। এসব প্রাকৃতিক লবণের হ্রদ থেকে ইরান সরকার প্রচুর লবণ সংগ্রহ করে থাকে। আমরা সকাল ৯টার দিকে কোম শহরে প্রবেশ করি।

কোমে আমরা প্রথমে হযরত মাসুমা (রা.)-এর যেয়ারতে যাই। হযরত মাসুমা (রা.) হযরত ইমাম রেজা (রা.)-এর বোন এবং ইমাম হযরত মুসা কাজিম (রা.)-এর কন্যা।

ইরানের মাজারগুলিকে মাজার কমপ্লেক্স বলা যায় এবং বিশাল এরিয়া নিয়ে চোখ ঝলসানো বহু মাজার রয়েছে ইরানে। তৎমধ্যে হযরত মাসুমা (রা.)-এর মাজার অন্যতম। যারা তেহরান ভ্রমণ করে তারা সাধারণত কোম এসে থাকে যেয়ারত ও বেড়ানোর উদ্দেশ্যে।

কাবিরি সাহেব বললেন, তাঁর নিকটাত্মীয় আয়াতুল্লাহ মোস্তফা নাজাফির কোম ভার্সিটিতে ক্লাস আছে সকালের দিকে। অতএব, দুপুর ১২টায় তাঁর ঘরে গমনের প্রোগ্রাম করা আছে বললেন।

ইত্যবসরে আমরা হযরত মাসুমা (রা.)-এর মাজারে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে পৌঁছি। সেখানে ব্যাপক লোক সমাগম। হযরত মাসুমা (রা.)-এর মাজার সংলগ্ন কতেক শহীদানের কবর প্রত্যক্ষ করি। ঐসব শহীদগণের মধ্যে বিখ্যাত আয়াতুল্লাহগণও রয়েছেন, যারা ইসলামী বিপ্লবের সময় শহীদ হন। মাজারের নিকটে কোম নদী। তখন নদী শুকনা এবং গাড়ি পার্কিং ও ফ্লাইয়িং রেস্টুরেন্ট রয়েছে শুকনো নদীতে। কাবিরি সাহেবও শুকনা নদীতে গাড়ি পার্ক করলেন।

হযরত মাসুমা (রা.)-এর মাজার সংলগ্ন বিভিন্ন মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইরানের বিখ্যাত কোম ভার্সিটিতে চার হাজারের উর্ধ্বে শিক্ষার্থী রয়েছে। আমরা দীর্ঘক্ষণ যেয়ারতে সময়ক্ষেপণ ও ঘুরাফেরা করে কাটিয়ে হালকা কিছু নাস্তা খেয়ে যথাসময়ে আয়াতুল্লাহ মোস্তফা নাযাফির ঘরে চলে যাই। ঐ মুহূর্তে তিনি ভার্সিটি থেকে ফিরলেন। আবাসিক এলাকা দ্বিতল বাড়ির নীচতলায় তাঁর অতিথিশালা। তথায় আমাদেরকে ইরানী ফলফলাদি দিয়ে প্রাথমিক আতিথেয়তা করালেন। অতপর মোস্তফা নাযাফি কাবিরি সাহেবের মাধ্যমে জানালেন ইংরেজি জানা আর এক বিখ্যাত আয়াতুল্লাহর সাথে প্রোগ্রাম করে রেখেছেন। এই বলে বিলম্ব না করে আমরা তিনজনকে নিয়ে ঐ আয়াতুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িও আবাসিক এলাকার অন্যখানে। তাঁর বাড়িও দ্বিতল এবং নীচতলায় অতিথিশালা ও অফিসাদি। তাঁর নাম আয়াতুল্লাহ মাহাদি হাদাবী তেহরানী এবং তিনি পি.এইচডি ডিগ্রীধারী ও কোম ভার্সিটির বিখ্যাত প্রফেসর। সমগ্র ইরানে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। তিনি আমাদেরকে তাঁর অতিথিশালায় স্বাগত জানালেন এবং কেক বিস্কুট জাতীয় নাস্তা দিয়ে আতিথেয়তা করালেন।

আয়াতুল্লাহ মাহাদী হাদাবী অনর্গল ইংরেজি বলতে পারেন। আমি একজন লেখক এবং সাখাওয়াত সাহেবের বন্ধু হয়ে ইরানে এসেছি। শিয়া আকিদা নিয়ে প্রশ্ন করব তা তাঁর জানা থাকায় আমাকে প্রশ্ন শুরু করতে বললেন। তখন তাঁকে বললাম, কয় বছর আগে মদিনা মুনাওয়ারা হজ্বের সময় ইরানের কালচারাল সেন্টারে ইরানী ধর্মীয় নেতা হুজ্জতুল ইসলাম ফালাহিয়ানের সাথে সাক্ষাতকার হয়েছিল। এ কথা বলায় দেখলাম তিনি ফালাহিয়ানকে চিনতে পারলেন এবং বর্তমানে তেহরানে সরকারী উচ্চপদে কর্মরত বললেন।

আমি প্রথম প্রশ্ন করলাম, আপনারা হযরত আলী (ক.)-কে ইমাম মানেন না নবী মানেন? সাথে সাথে আয়াতুল্লাহ মাহাদী হাদাবী দৃঢ়ভাবে বললেন, তারা অর্থাৎ শিয়ারা হযরত আলীকে ইমাম মানেন। তখন পুনঃ প্রশ্ন করলাম, ইরানে এমন কিছু এলাকা, গোষ্ঠী আছে যারা হযরত আলীকে নবী মানেন। এতে তিনি দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করলেন। তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, বিশ্বে এমন কিছু লোক

বা গোষ্ঠী আছে যারা তাদের (শিয়াদের) বিরুদ্ধে দুর্নাম/বিদ্বেষ ছড়ায়। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী এবং হযরত আলীর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা সবকিছু হযরত মোহাম্মদ (স.) থেকে প্রাপ্ত।

আমাদের ভ্রমণকালীন ইরানে ইমাম মেহেদীর জন্মবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি দেখছিলাম বিধায় প্রশ্ন করলাম : আপনারা কি ইমাম মেহেদী জন্মগ্রহণ করেছেন বিশ্বাস করেন? এতে তিনি বললেন, আপনারা (সুন্নীরা) ইমাম মেহেদী এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা (শিয়ারা) ইমাম মেহেদী জন্মগ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহপাক তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন যা সময় হলে প্রকাশ পাবে। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন : ২৫০ হিজরির ১৫ শাবান ইমাম মেহেদী জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি তাদের (শিয়াদের) শেষ ইমাম।

এখানে উল্লেখ্য, শিয়াদের ১২ ইমাম এবং শিয়ারা নবীজী (স.)-এর পর ইমাম প্রথায় বিশ্বাসী। ১ম ইমাম-হযরত আলী (ক.) যিনি ইরাকের কুফা নগরীর ১০ কি. মি. দূরত্বে নজফে শায়িত। ২য় ইমাম-হযরত হাসান (রা.)। তিনি মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে শায়িত। ৩য় ইমাম-হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যাঁর শরীর মোবারক কারবালায় এবং মস্তক মোবারক কায়রো নগরীতে শায়িত। ৪র্থ ইমাম-হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.); মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে শায়িত। ৫ম ইমাম-হযরত বাকের (রা.) জান্নাতুল বাকীতে শায়িত। ৬ষ্ঠ ইমাম-হযরত জাফর সাদেক (রা.)। জান্নাতুল বাকীতে শায়িত। হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন, হযরত ইমাম বাকের ও হযরত ইমাম জাফর সাদেক জান্নাতুল বাকীতে আহলে বায়তের বিশেষ এরিয়ায় পরপর শায়িত। ৭ম ইমাম-হযরত মূসা কাজিম (রা.); ইরাকের রাজধানী বাগদাদে শায়িত। ৮ম ইমাম-হযরত আলী রেজা (রা.); ইরানের মা'শাদ শহরে শায়িত। ৯ম ইমাম-হযরত মোহাম্মদ জাওয়াত তর্কী (রা.) বাগদাদে ইমাম হযরত মুসা কাজিমের পাশে শায়িত। ১০ম ইমাম-হযরত আলী আন-নকী (রা.) ও ১১তম ইমাম-হযরত আল-হাসান আল আসকালী, ইরাকের রাজধানী বাগদাদের দেড়শত কি. মি. উত্তরে সামরায় একই এরিয়ায় শায়িত এবং ১২তম ইমাম হযরত মেহেদী (আ.) জন্ম হলেও প্রকাশ উহ্য রয়েছে।

শিয়া আকিদা মতে বৎসরের বড় উৎসব হলো হযরত ইমাম মেহেদী (রা.) জন্মবার্ষিকী পালন ১৫ শাবান। ঐ দিবসকে সামনে রেখে তারা ব্যাপক উৎসবের আয়োজন করে। আয়োজন করে রাস্তাঘাটে পথিককে খাওয়ানো, অফিস-আদালতে, ঘর-বাড়িতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ঐদিন সমগ্র ইরানে উৎসবের আমেজ বিরাজ করতে থাকে।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল : কলেমা নিয়ে। শিয়া আকিদা মতে মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর পর আলীও অলিউল্লাহ বলে থাকে। এতে আয়াতুল্লাহ বললেন, মূল কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অতপর আলীও অলিউল্লাহ কলেমার অংশ নয়। না বললেও চলে। ৪র্থ প্রশ্ন : নামাজ জমা কেন? অর্থাৎ জোহর, আসর ও মাগরিব, এশার পরপর পড়া হয় কেন? যা সুন্নীমতে সফরে করা হয়ে থাকে। এতে আয়াতুল্লাহ বললেন, হাদীস শরীফ মতে গ্রহণযোগ্য। প্রয়োজনে তারা হাদীস শরীফ দেখাতে পারবেন। ৫ম প্রশ্ন : মসজিদের ভিতরে-বাইরে হযরত আলী (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) ছবি কেন? এবং তা গ্রহণযোগ্য কি না? উত্তরে বললেন গ্রহণযোগ্য নয়। তবে হারামও নয়। ৬ষ্ঠ প্রশ্ন : মোতা এখনও জায়েস মনে করেন কি না? উত্তর-অবশ্যই জায়েস, বর্তমানে আরবের শেখরাও মোতা করতেছেন। তা না হলে তাদের চারের অধিক স্ত্রী থাকে কি করে। মোতার দ্বারা খারাবী রহিত হচ্ছে।

কোমে ইমাম জাদী হযরত মাছুমা (র.)'র মাজার কমপ্লেক্স-এর অংশবিশেষ

৭ম প্রশ্ন : অযুতে পা না ধুয়ে মোছেহ করা হচ্ছে। সুন্নীমতে বিশেষ অবস্থায় করা হয়। আপনারা সব সময় করছেন। উত্তর : হাদীস শরীফমতে গ্রহণযোগ্য। ৮ম প্রশ্ন: সুন্নীগণের কাছে প্রচার আছে আল্লাহতা'আলা জিবরিলকে নবুওয়াত নিয়ে প্রেরণ করেন হযরত আলীর কাছে, কিন্তু ভুলক্রমে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নবুওয়াত দেওয়া হয়। উত্তর : সম্পূর্ণ মিথ্যা। একটু আগেও বলেছি, হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী। এবং হযরত আলীর শিক্ষাজ্ঞান সবকিছু হযরত মুহাম্মদ (স.) থেকে প্রাপ্ত। এসব বক্তব্য আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। ৯ম প্রশ্ন: আযানে হযরত আলীর নাম নেয়া হচ্ছে কেন? উত্তর: এসব শর্ত নয়। না বললেও চলে। ১০ম প্রশ্ন: হযরত আবু বক্কর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-কে খলিফা মানেন কি না? উত্তর: উনারা দু'জনেরই বিশাল খেদমত রয়েছে এবং তাঁরা দু'জন নবিজীর সাথে থেকেই ইসলামের খেদমত করে গেছেন। তাঁরা উঁচুমাপের সাহাবা এবং তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু আমরা (শিয়ারা) ইমাম মেনে থাকি।

আয়াতুল্লাহ মাহাদী হাদাবী-এর সাথে আয়াতুল্লাহ নাজাফি এবং হামিদ কাবিরীও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা সহযোগিতায় ছিলেন। আয়াতুল্লাহ মাহাদী হাদাবী-এর বাড়ীতে ঘন্টাখানেক অবস্থান করে দুপুরের খাবার খেতে পুনঃ আয়াতুল্লাহ মোস্তফা নাজাফির ঘরে ফিরে আসি। যেহেতু তিনি আমাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

খাবারপর্ব শেষ করে বিকেলের দিকে আমরা তিনজন তেহরানের পথে রওয়ানা দিই। এবং তেহরান প্রবেশ মুখেই ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর মাজার কমপ্লেক্সে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে থামি।

ধর্মীয় নেতার সাথে কথোপকথন

মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত ইরানের বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ১৯৯৯ সালে হজ্বের সময় এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ইরান থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে আসা ইরানের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হুজ্জাতুল ইসলাম ফালাহিয়ানের মুখোমুখি বসে শিয়া আকিদা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করতে আমার সুযোগ হয়। PIA যোগে করাচি হয়ে জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছে Saudia-এর আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে করে মদিনা মুনাওয়ারা চলে যাই। আমার প্রোগ্রাম : মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এহরাম পরে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা মোকাররমা আসব। মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালে সপ্তাহখানেক পর একদিন মসজিদে নববীতে মাগরিবের পর আলাপ হয় ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম Ma'shad নগরীর ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি শিক্ষক Hassan Khavari-এর সাথে। মাগরিবের নামাযের পর প্যান্ট-শার্ট পরিহিত মুখে হালকা দাড়িওয়ালা হাসান কাভারী আমাকে ইংরেজিতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আমি মদিনা মুনাওয়ারাবাসী কি না? আমি উত্তর দিলাম: না। বললাম, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। হজ্ব উপলক্ষে পবিত্র আরব ভূমিতে অবস্থানকালে আমার শরীরে সার্বক্ষণিক আরবী আলখেল্লা ও মাথায় লাল রুমাল থাকত। সেজন্য বোধহয় ইরানী শিক্ষক আমাকে মদিনা মুনাওয়ারাবাসী মনে করেছেন।

আমি তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে জানলাম যে, তিনি ইরানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের একজন শিক্ষক। পঞ্চাশের কোটায় আমার সমবয়সী হাসান কাভারীর সাথে ইরান সম্পর্কে, শিয়া আকিদা সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ চলছিল। সাথে সাথে আমাদের দেশ ও আমার নিজের সম্পর্কে জানতে চাইলেন উনি। আমি লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত জানতে পেরে আমার সাথে পরবর্তীতে আরো সাক্ষাৎ ও আলাপের আগ্রহ দেখান। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে পরদিন দুপুরে যোহরের পর তাঁর সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। এও আলাপ হল, পরদিন যোহরের নামাযের পরপর বাবে জীবরিলের সামনে উভয়ের সাক্ষাৎ হলে পর তিনি আমাকে তাঁর থাকার ঘরে নিয়ে যাবেন। সে অনুপাতে পরদিন অর্থাৎ ১৭ মার্চ বুধবার যোহরের নামাযের পর হাসান কাভারীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে

নিয়ে চললেন জান্নাতুল বাকী'র দক্ষিণ পার্শ্বে ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের দিকে। প্রায় ১০/১২ তলা বিশিষ্ট বৃহদাকারের অত্যাধুনিক দালানের উপরে ইরানের পতাকা পত্ পত্ করে উড়তেছিল। ইরানী শিক্ষক হাঁটতে হাঁটতে বললেন যে, তিনি আমাকে তাঁর কক্ষে না নিয়ে সরাসরি নিয়ে যাবেন ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে, সেখানে অবস্থান করছেন ইরানের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তি Hojjatul Islam Fallahian যিনি তেহরানে অবস্থানকারী ইরানের International Relations-এর প্রধান। হাঁটতে হাঁটতে আমরা দু'জন ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিচতলায় প্রবেশ করে দু'তলায় চলে গিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে বসতে না বসতেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-প্রধান এসে আমাকে স্বাগত জানালেন। ২/১ মিনিট আলাপ করেই আমাকে তাঁদের ডাইনিং হলে নিয়ে গেলেন দুপুরের খাবার সারবার জন্য। দেখলাম, প্রায় ৫০/৬০টি চেয়ারসমেত ডাইনিং হলে যারা খাওয়া-দাওয়া করছেন তারা প্রায় সবাই ইরানী বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলা চলে অর্থাৎ সরকারী ডেলিগেট/সরকারী কর্মকর্তা ইত্যাদি। সুপরিসর ডাইনিং হলের এক পার্শ্বে আমরা তিনজন বসলাম। দেখলাম: টেবিলে প্লেট, কাঁটা চামচ, মিনারেল ওয়াটারের বোতল ও কেক সাজানো আছে। আমরা বসার পর প্রথমে সরবরাহ করা হল বড় প্লেটে টক দধি মিশ্রিত সালাদ। তাঁদের সাথে আমিও প্রথমে সালাদ খেলাম। রুচির অনুকূলে সালাদ খেয়েই আমার অনেকটা খাওয়ার চাহিদা মিটিয়ে গেছে বলা চলে। তারপর সরবরাহ করল সবজি মিশ্রিত ভাত, সাথে বড় এক টুকরা ভুনা মাছ। সালাদ খেয়ে আমার ক্ষিধে মিটে গেছে। তারপরও কাঁটা চামচ দিয়ে তাঁদের সাথে যুতটুকু পারি খেলাম। সবশেষে সাদা পানি, কোক খেয়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও হাসান কাভারীসহ লিফটের সাহায্যে আরো উপরের দিকে গেলাম। লিফট থেকে বের হয়ে আমাকে একটি বৃহদাকারের কক্ষে নিয়ে গেলেন। কার্পেট বিছানো কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে গদি ও বালিশ বসানো আছে। আমি হাসান কাভারীর সাথে একপার্শ্বে গদিতে বসলাম। আর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা এ কক্ষের ভিতরের দরজা দিয়ে অন্য কক্ষে গেলেন। ২/১ মিনিটের মধ্যে ঐ কর্মকর্তার সাথে গায়ে ইরানী গাউন বা জুব্বা এবং মাথায় বৃহদাকারের ইরানী পাগড়ী পরিহিত ষাটের কাছাকাছি বয়সের সক্ষম বৃদ্ধ হুজ্জাতুল ইসলাম ফালাহিয়ান আমাদের কক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রথমে ওনার সাথে সালাম, মোছাহাফা হল। এই ইসলামী ব্যক্তিত্ব যে আগে আমার ব্যাপারে এবং সাক্ষাৎকার ব্যাপারে অবগত আছেন তা বুঝতে আর বাকী রইল না। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা বাইরের দিকে চলে গেলেন। আমি আর হুজ্জাতুল ইসলাম ফালাহিয়ান সামনাসামনি বসলাম। আমাদের দু'জনের পার্শ্বে বসলেন ইরানী শিক্ষক হাসান কাভারী।

আমি প্রথমে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলাম, উনার দৃষ্টিতে শিয়া-সুন্নীর মধ্যে পার্থক্য কি? সাথে সাথে হাসান কাভারী হুজ্জাতুল ইসলাম ফালাহিয়ানকে ফার্সীতে অনুবাদ করে দিলেন। তখন বুঝতে পারলাম, ফালাহিয়ান সাহেব ফার্সীতেই আমার সাথে আলাপ করবেন। মধ্যখানে ইরানী শিক্ষক হাসান কাভারী দোভাষীর ভূমিকা পালন করবেন।

এদিকে, আমি কাগজ কলমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় হাসান কাভারী ঐ কক্ষে রক্ষিত সাদা কাগজ থেকে আমাকে কয়েক পাতা কাগজ ও তাঁর কলমটি দিলেন। ইত্যবসরে হুজ্জাতুল ইসলাম ফার্সীতেই উত্তর দিলেন, যা হাসান কাভারী আমাকে ইংরেজিতে জানালেন : শিয়া-সুন্নীর মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই। তবে সুন্নী আকিদায় ইমাম প্রথা নেই; শিয়া আকিদায় ইমাম মানা হয়। আরো বললেন, শিয়াগণ আহলে বাইতের বার ইমাম মানেন। তখন হাসান কাভারীকে আমি বললাম, বার ইমামের কথা আমার জানা আছে।

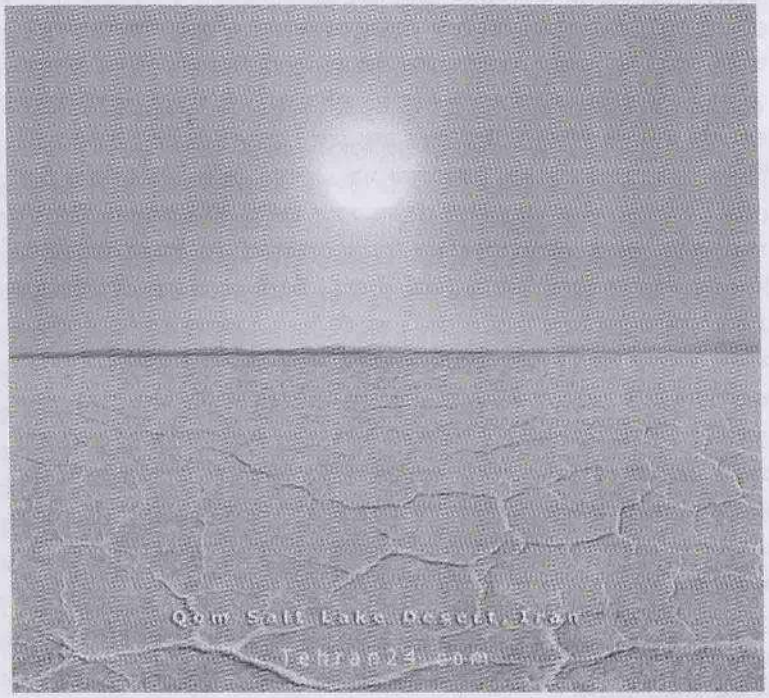

তেহরান থেকে কোম যাওয়ার পথে সল্ট লেক

আমি প্রশ্ন করলাম, হযরত আলী (ক.)-কে আপনারা নবী মানেন; না ইমাম মানেন? উত্তরে বললেন, ইমাম মানেন এবং বারো ইমামের মধ্যে প্রথম ইমাম। পুনশ্চ প্রশ্ন করলাম, ইরানে অনেক দল-উপদল আছে; কোন কোন দল বা উপদল নাকি হযরত আলী (ক.)-কে নবী মানেন – একথা ঠিক কি না? উত্তরে বললেন, ইরানের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন দল বা উপদল নেই। আর সবাই হযরত আলী (ক.)-কে প্রথম ইমাম হিসেবে মানেন। প্রশ্ন করলাম, আপনারা না কি নামাজ তিন ওয়াক্ত পড়েন? উত্তরে জানালেন, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা পরপর পড়া হয় যা ধর্মীয় বিধিসম্মত। পুনঃ প্রশ্ন করলাম, আমি ইরাক সফরকালে কারবালা, নজফ ও কুফায় দেখেছি, নামাজ পড়তে শিয়াগণ মাটির টুকরার উপর সেজদা করতে – তার কারণ কি? উত্তরে জানালেন, ধর্মীয় বিধান মতে মাটিতে সেজদা দিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে কার্পেট বা সুতা জাতীয় দ্রব্যের উপর সেজদা দিতে হচ্ছে বলে মাটির টুকরা ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন করলাম, ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি? উত্তরে জানালেন, তারা তথা শিয়াগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর পর কেবল ইমামই মেনে থাকেন।

এদিকে মনে হচ্ছিল, ফালাহিয়ানের এ সময় অন্য প্রোগ্রাম আছে যার ফলে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধানসহ কয়েক ব্যক্তি বারবার এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ফালাহিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলে যান। কিন্তু হুজ্জাতুল ইসলাম ফালাহিয়ানের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ দেখলাম না। আমার প্রশ্নের প্রতি খুবই আগ্রহ প্রত্যক্ষ করছিলাম। তাতে আমার আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় প্রশ্ন করলাম, শিয়াগণ না কি মনে করে থাকে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে আল্লাহপাক প্রেরণ করেছিলেন হযরত আলী (ক.)-এর নিকট কিন্তু ভুলক্রমে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট আগমন করেন – এটা কতটুকু সত্য। উত্তরে জানালেন, সব মিথ্যা কথা। রাসুলুল্লাহ (স.) খাতেমুন নবীয়্যিন-এ কথা ৩ বার বললেন। আরো বললেন, হযরত আলী (ক.) এর জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছু রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মাধ্যমে পাওয়া। পুনঃ প্রশ্ন করলাম, শিয়া-সুন্নী পৃথক মসজিদ কেন? উত্তরে বললেন, এসব উভয় আকিদার মধ্যে বাড়াবাড়ি। প্রশ্ন করলাম, আপনারা আযানে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নামের পরে হযরত আলী (ক.)-এর নাম নিয়ে থাকেন? উত্তরে বললেন, নাম নিয়ে থাকলেও জরুরী নয়।

হুজ্জাতুল ইসলামের মুখোমুখি হবার প্রোগ্রাম আমার আগে জানা না থাকায় চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্নগুলো নোট করে নেওয়ার সুযোগ হয়নি। ফলে এতটুকু প্রশ্নতেই সাক্ষাৎপর্ব শেষ হয়। আমার প্রশ্নপর্ব শেষ হলে পর ফালাহিয়ান আমার কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চান এবং আমাকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

ইস্পাহান

পারস্যের প্রাচীন নগরী ইস্পাহান। ইস্পাহানবাসী গর্ব করে পৃথিবীর অর্ধাংশ বলে। ইস্পাহান না দেখলে পারস্য দেখা হল না বলে প্রচার আছে।

২ দিন ১ রাতের প্রোগ্রাম নিয়ে তেহরান থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর '০৫ বুধবার ইস্পাহান গিয়েছিলাম। গত রবিবার পুরা একটি বেলা চলে যায় ইস্পাহান, সিরাজ ও গিলানের রাজধানী রাস্ত-এর বিমান টিকেট খরিদ করতে। ভ্রমণসাথী সাখাওয়াত সাহেবসহ দুইজন সকাল থেকে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সিতে ঘুরাঘুরি করতে থাকি ইরান এয়ার বা অন্যান্য প্রাইভেট এয়ারের টিকেট খরিদ করতে। আমাদের MAR MAR HOTELটি তেহরান মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে ছিল বিধায় হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সিতে যেতে সুবিধা হয়। আমরা অনেক চেষ্টার পর ইস্পাহান, সিরাজ ও রাস্ত গমনের টিকেট খরিদ করতে সক্ষম হই ইরান এয়ারে। কিন্তু বারেবারে চেষ্টা করেও মা'শাদ গমনের টিকেট খরিদ করতে ব্যর্থ হই সীটের অভাবে। সময়ের অভাবে তাবরীজ ও কেরমান গমন বাতিল করতে হলো। এ তিন বিখ্যাত শহর তেহরান থেকে হাজার কিলোমিটারের কাছাকাছি কমবেশী দূরত্বে। কাজেই আকাশপথে যেতে হবে। এমনিতে সাখাওয়াত সাহেব স্থলপথে দূরযাত্রায় অনাগ্রহী। আমি কিন্তু দূরযাত্রায় রেলকে পছন্দ করি। ইরানে রেল সার্ভিস থাকলেও সাখাওয়াত সাহেব আমার সাথে একমত নন রেলে ভ্রমণ করতে।

তেহরানের প্রায়ই ট্রাভেল এজেন্সির ৮/১০ জন স্টাফের মধ্যে ২/৩ জন যুবক বাকী সবাই যুবতী। আমরা ট্রাভেল এজেন্সির যে-যুবতীর হাত থেকে টিকেট সংগ্রহ করি সে-যুবতী তার চেয়ারের নিকটে নিচে কার্পেটে তার ৪/৫ মাসের শিশু শুইয়ে রেখেছে। আগে উল্লেখ করেছি, ইরানী নারীরা শিক্ষায় এগিয়ে এবং প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা প্রত্যক্ষ হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনে শিশুদের সাথে রাখে।

আমরা ইরান এয়ারের টিকেট পেলাম ১৪ সেপ্টেম্বর '০৫ বুধবার সকাল ৮.৫৫ মিনিট তেহরান থেকে ইস্পাহান রওনা হওয়ার। পরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর '০৫ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭:১০ মিনিটে ইস্পাহান থেকে সিরাজ রওনা এবং ২ রাত সিরাজ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর '০৫ শনিবার দুপুর ১২:৪০ মিনিটে তেহরান ফিরে আসা।

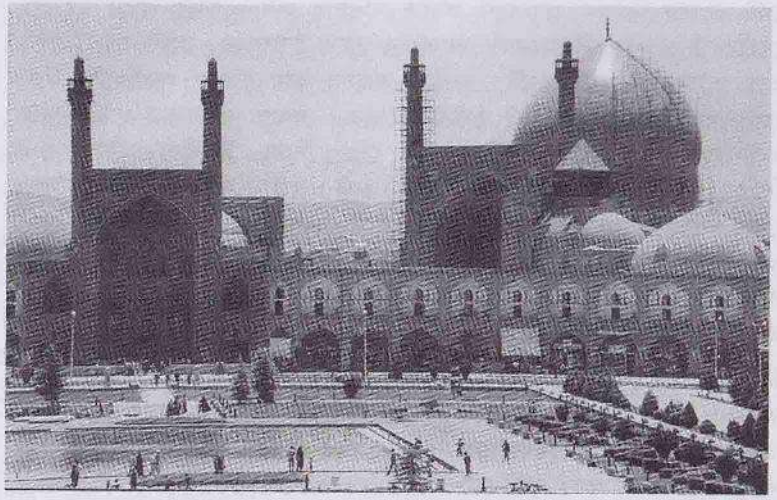

ইস্পাহানে বিখ্যাত লুৎফুল্লা মসজিদ

প্রোগ্রাম মতে বড় ব্যাগ হোটেলে রেখে দিয়ে হাতে বহনযোগ্য ছোট ব্যাগ নিয়ে ভোরে হোটেলে নাস্তা না করে টেক্সিযোগে বিমানবন্দর রওনা হই। আগে উল্লেখ করেছি, তেহরানের প্রায় ৫০/৬০ কিলোমিটার দূরত্বে ইমাম খোমেনী নতুন বিমান বন্দর দিয়ে ইরানের আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হয়নি। এমনকি ইরান এয়ারের সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইটও নতুন ঐ বিমান বন্দর দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়নি। ফলে মেহেরাবাদ পুরানো বিমান বন্দর এখনো তার সরগরম, ব্যস্ততা হারায়নি। মেহেরাবাদ ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরের মত বর্তমানে তেহরান শহরের অভ্যন্তরে বলা যাবে। আমাদের হোটেল থেকে ১৫/২০ কি. মি. দূরত্বে হতে পারে। ভোর ৭:০০টার কিছু আগে তেহরানে সূর্য উদয়। আমরা বৈদ্যুতিক ঝলমল আলোর রাস্তা দিয়ে টেক্সিযোগে হোটেল থেকে মেহেরাবাদ বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই। মেহেরাবাদ বিমান বন্দরের কিছু আগে শহরের একটি মনোরম গোলচক্করে ইরানের আজাদী স্কোয়ার।

টেক্সিচালক হোটেল থেকে প্রায় ২০/৩০ মিনিটে আমাদেরকে মেহেরাবাদ বিমানবন্দরের আভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে নামিয়ে দেয়। আগেই উল্লেখ করেছি, তেহরানে গভীর বা শেষরাতেও রাস্তা ভরপুর থাকে বাস/টেক্সিতে।

টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করে দেখলাম হাজারের অধিক যাত্রীতে টার্মিনাল ভবন ভরপুর। প্রায় ৮/১০টি বিভিন্ন গন্তব্যের কাউন্টারে কাজ চলছে একতলা বিশিষ্ট বিশাল টার্মিনাল ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে। পূর্ব পার্শ্বে প্রবেশ পথ। পশ্চিম পার্শ্বে ৮/১০টি

গেট রয়েছে বিমানে আরোহণ করতে যাওয়ার জন্য। উত্তর পার্শ্বে টয়লেট, রেস্টুরেন্ট ও কয়েকটি দোকান। আমাদের গন্তব্য ইস্পাহান। ফ্লাইট নম্বর নিশ্চিত হয়ে আমরা লাইনে দাঁড়াই। লাইনে অগ্রসর হয়ে উভয়ে পাশাপাশি বসার Boarding Card নিয়ে নিই কাউন্টার থেকে। দেখতে পাচ্ছিলাম প্রায় প্রত্যেক কাউন্টারে যাত্রীরা লাইন ধরে Boarding Card নিচ্ছে। ইরানীরা প্রাচীন সভ্য ও শিক্ষিত জাতি। কোন হইহুল্লা বা হুড়াহুড়ি নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে নিরবতায় কাজ সেরে নিচ্ছে। এসব সুন্দর শৃঙ্খলাবোধ দেখে দেশের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা বাদে কিছু করার নেই। ১৫/২০ মিনিট টার্মিনাল ভবনের আরামদায়ক চেয়ারে বসে অপেক্ষায় থেকে ইরান এয়ারের ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীগণের গতিবিধি, তৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে থাকি।

নির্ধারিত গেট খোলার ঘোষণা ও সিগন্যাল বাতি জ্বলে উঠলে আমরা গেটের দিকে অগ্রসর হই। একতলা বিশিষ্ট টার্মিনাল ভবনের একদিকে গমন অপরদিকে আগমন। মনে হয় আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বিধায় সমস্ত ঘোষণা ফার্সিতে। তবে পুরাপুরি না বুঝলেও কথার মূলটা বুঝে নেয়া যায়।

আমরা হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ নিয়ে গেট পার হয়ে যাই নিরাপত্তা তল্লাশী শেষ করে। অতপর হেঁটে গিয়ে বাসে আরোহণ করি। বাস চালু হয়ে Aircraft-এর সিঁড়ির নিকটে থামলে আমরা বিমানে আরোহণ করে আমাদের নির্দিষ্ট পাশাপাশি

ইস্পাহানে নখশ-ই-জাহানের অংশবিশেষ

সীটে বসি। মনে হলো প্রায় ১৫০/২০০ জনের বোয়িং বিমান। চকলেট সরবরাহ করার পর বিমান আকাশে উঠে বেল্ট খোলার অনুমতি অর্থাৎ ঐ বাতি নিভার সাথে সাথে বিমানবালা দ্রুততার সাথে খাবার প্যাকেট সরবরাহ করতে থাকে। অতিশালীন পোষাক পরা ইরানী যুবতী বিমানবালারা যেমনি শিক্ষিত তেমনি চটপটে। সীটের সামনে প্রতি টেবিলে বড় আকারের একটি করে প্যাকেট ১৫০/২০০ যাত্রীকে সরবরাহ করতে মনে হয় সময় লাগলো মাত্র ৫/৭ মিনিট।

এই রকম বড় আকারের খাওয়ার প্যাকেট ইস্পাহান থেকে সিরাজ, সিরাজ থেকে তেহরান এবং তেহরান থেকে মাত্র ৩২৫ কি. মি. দূরত্বে গিলানের রাজধানী Rast যাওয়া-আসাকালীনও সরবরাহ করে।

প্রতি প্যাকেটে পনির বা চিকেন সমেত নরম বড় আকারে সুস্বাদু বন। একটি খেলেই দুপুর বা রাতের খাবার হয়ে যাবে। সাথে আরো থাকছে বাটার, জেলী, কেক বা মিষ্টান্ন, ফলের জুস, আইসক্রীম, ফল, পানি ইত্যাদি সহ প্রায় ৫/৭ প্রকারের খাবার।

জাতীয় এয়ারলাইন ইরান এয়ারে ভাড়া যেমনি সস্তা তেমনি যাত্রীদের খাবারের ব্যাপারেও উদার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

তেহরান থেকে ৪৪০ কি. মি. দক্ষিণে ইস্পাহান ঘন্টাখানেক-এর যাত্রায় আকাশ থেকে জানালা দিয়ে বাহিরের দৃশ্য দেখছিলাম খাবার খাওয়ার পাশাপাশি। দেখতে পাচ্ছিলাম সবুজের দৃশ্য নেই। বিমানে বিদেশী যাত্রী নেই মনে হলো আমরা দু'জন বাদে। মনে হয় সময়স্বল্পতা বিধায় বিমানে চা সরবরাহ করছিলনা। তা বুঝতে পেরে বিমানবালাকে ডেকে বললাম আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আপনাদের অতিথি, আমাদের চা খাওয়ান। এতে বিমানবালা উৎফুল্ল হয়ে ২/৩ মিনিটের মধ্যে ২ কাপ রং চা ও ৫/৬ টুকরা জমানো চিনি এনে দেয় ছোট ট্রে করে। ইরানে দুধ চায়ের প্রচলন নেই বলা চলে। আমার চা চাওয়ার কাণ্ড দেখে সাখাওয়াত সাহেব একটু হতচকিত হয়। যদিওবা চা পেয়ে তিনিও খুশি। বিমান থেকে পাহাড়, মরুভূমি দেখতে দেখতে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় ইস্পাহান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করি।

আমরা ট্যুরিস্ট কাউন্টারে যোগাযোগ করি। শাহ-এর পতনের পর ইরানে বিদেশীদের আনাগোনা বহুলাংশে কমে গেছে। কিন্তু বিশাল ইরানের ৭ কোটি নাগরিকের মন ভ্রমণ-পিপাসু। অপরদিকে আমাদের ইরান ভ্রমণকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। ফলে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ছিল বেশী।

ইস্পাহান বিমান বন্দরের ট্যুরিস্ট কাউন্টারে প্রবেশ করে আমরা হোটেল বুক ও ভ্রমণ ট্যুর পাবার জন্য তৎপর হই। ট্যুরিস্ট গাইড বা অফিসার বহুক্ষণ টেলিফোনে

চেষ্টা করেও মানসম্পন্ন হোটেলগুলো থেকে আমরা দুজনের জন্য একটি কক্ষও পায়নি। ফলে কম মানের একটি হোটেল থেকে একটি কক্ষ আমাদের জন্য বুক করে দেয়। আমরা অনন্যোপায় হয়ে তা নিতে রাজি হই। অতপর ইস্পাহানের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণের সুবিধা নিয়ে আলাপে জানতে পারি, ইস্পাহানে সকাল-বিকাল ২টি ট্যুর রয়েছে ইরান ট্যুরিজমের আওতায়। আমরা ঐদিন বিকালে ও পরদিন সকাল বেলা ট্যুরের জন্য ইরানী রিয়াল প্রদান করি।

ট্যুরিস্ট কাউন্টারে আলাপের সময় আমি বের হয়ে ইরান এয়ারসহ বিভিন্ন প্রাইভেট এয়ারলাইনগুলোর কাউন্টারে যোগাযোগ করি ইস্পাহান বা সিরাজ থেকে মা'শাদ যাওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ফ্লাইট থাকলেও সীট নেই।

শিয়াদের ১২ ইমামের মধ্যে একমাত্র ইমাম রেজা ইরানের মা'শাদে শায়িত। ইরানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের মৌসুম বিধায় পরিবার পরিজন নিয়ে ঐ সময় মায়াশাদে শিয়ারা গিজগিজ করছে।

পুনঃ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মা'শাদ যাওয়ার আশা বাদ দিয়ে ট্যুরিস্ট অফিসারের সহায়তায় আমরা বিমান বন্দর থেকে টেক্সিযোগে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই।

পারস্যের প্রাচীন নগরী ইস্পাহানবাসী গর্ব করে বলে থাকেন – ইস্পাহান মানেই পৃথিবীর অর্ধাংশ। অনেক ইতিহাসবিদ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এককালে পৃথিবীর অর্ধাংশ ইস্পাহানকে জানত।

সাফাভিদ রাজত্বকালে শাহ আব্বাস প্রথম (১৫৮৭-১৬২৯) এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। যখন পারস্যে নির্মাণ প্রকৌশল, সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্পকর্মের অগ্রগতির ধারা ছিল অকল্পনীয়। তাবরীজ হতে কাজভিন এবং পরবর্তীতে ১৫৯৮ সালে সাফাভিদ-এর সময়ে প্রথম শাহ আব্বাসের আদেশে ইস্পাহানে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। যদিওবা ইস্পাহানে রয়েছে প্রায় চার হাজার বছরের নানান ইতিহাস। ফরাসী কবি বেনিয়ার ষোড়শ শতাব্দীতে ইস্পাহানের ইমাম স্কোয়ার (নখশ-ই-জাহান)-এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই সময় ইউরোপের কোন অংশই ইস্পাহানের মত সুন্দর ছিল না।

ইস্পাহানের দশ হাজার প্রাচীন নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে নখশ-ই-জাহান (সুসজ্জিত পৃথিবী)-এর পূর্বদিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে নির্মিত আলী কাপু (আলীর ফটক) প্রাসাদে রাজ্যের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হতো। নখশ-ই-জাহান স্কোয়ার-এর চতুষ্পার্শ্বে দোতলা অসংখ্য কক্ষ রয়েছে। নিচের কক্ষে ঘোড়ার এবং উপরের কক্ষ সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বর্তমানে সেগুলো দুই শতাধিক দোকান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে গাঢ় নীল বর্ণের গম্বুজ এবং মিনার শোভিত ইমাম মসজিদ এবং পূর্বদিকে শাহ আব্বাস (প্রথম) কর্তৃক

নির্মিত শেখ লুৎফুল্লা মসজিদ স্কোয়ারের সৌন্দর্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। ছয়স্তর বিশিষ্ট আলী কাপু প্রাসাদের সুউচ্চ প্রবেশস্থলের চার কোণা এবং উপরিভাগ এমনভাবে নির্মিত যে, এক কোণায় কোন ব্যক্তি অতি অল্প জোরে কথা বললে উপরের দিকের কোণায় কান দিয়ে শব্দসমূহ পরিস্কার শোনা যায়। যেমনটা ভারতের সুলতানী ও মোঘল আমলে নির্মিত বিখ্যাত কিল্লাগুলোর মত।

নখশ-ই-জাহান-এর প্রথমতলার উচ্চতা প্রায় ১৪ মিটার। ৩য় তলায় ফোয়ারা শোভিত তাম্রের পানীয় ফুল সম্বলিত বেলকনী হতে মসজিদদ্বয়ের গম্বুজ, মিনার, বাগান এমনকি ইস্পাহান নগরী এবং অদূরে পর্বতের শোভা গোচরীভূত হত। এ নখশ-ই-জাহানে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কসরৎ, পোলো খেলা উপভোগ করা হতো। প্রাসাদের ৬ষ্ঠ তলার নিভৃত এক স্থানে রয়েছে সংগীত কক্ষ। সঙ্গীতের মূর্ছনা উপভোগ করার জন্য চতুর্দিকে ওয়ালে এবং উপরিভাগে খোপসমূহ নির্মাণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।

স্কোয়ারের পূর্বদিকে ইমাম মসজিদটি শাহ আব্বাসের আদেশে ১৬১১ সালে নির্মাণ করা শুরু হয়। মসজিদের প্রথম গেট স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত ছিল। এ দরজার বাহিরদিকে আরো একটি দরজা পরবর্তীকালে পাহলভী শাহ-এর আদেশে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য নির্মিত হয়।

বেহেস্তের আট দরজার সংখ্যার সাথে মিল রেখে মসজিদের গম্বুজের নীচভাগের নির্মাণ প্রকৌশল পরিকল্পনা যেভাবে করা হয়েছে সে ব্যাপারে চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয়। প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট আলী আকবর ইস্পাহানী ২৫ বছর সময় নিয়ে বিশ্বের এই ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণ করেন।

দেশ থেকে ইরান যাবার আগে ইরানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ ও ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করি। এতে ইরানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইস্পাহান নগরীর নানান স্থাপনার কথা জানতে পারি। কিন্তু নখশ-ই-জাহান-এর (সুসজ্জিত পৃথিবী) কথা জেনে তেহরান থেকে ইস্পাহান যেতে তৎপর থাকি।

ইস্পাহান বিমান বন্দর থেকে দীর্ঘ প্রায় ২৫/৩০ কি. মি. দূরত্বে শহরের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার মাঝে ও দু'দিকে নানান ফুলের বাগানাদি দেখে অভিভূত হই। ইরানীরা ফলফলাদির পাশাপাশি বাগান-প্রিয়। রাস্তার পার্শ্বে এবং চৌরাস্তার মাঝখানে ফুলের বাগান ইরানী শহরগুলোর শোভা বর্ধনের অন্যতম কারণ বলা যাবে।

টেক্সিতে বসে দু'দিকের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ইস্পাহান নগরীতে প্রবেশ করি। ইরানের ২য় বৃহত্তম নগরী ইস্পাহানে প্রবেশ করে শহর অবলোকন করতে করতে আমাদের হোটেলের সামনে টেক্সি এসে থামায়; মিটার হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়।

রিসেপশনে যুবতী আমাদেরকে যে কক্ষ দিল তা দেখে আমাদের পছন্দ হলো না। আমরা দু'জন বিদেশী অতিথি তাদের দেওয়া কক্ষটি পছন্দ করলাম না–এতে

রিসেপশনিস্ট বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। কয়েক মিনিট চিন্তা করে বলল, কক্ষে বিশ্রাম নিতে। ঘন্টাখানেক পর একটি কক্ষ খালি হবে ঐ কক্ষ আমাদেরকে প্রদান করবে। এই আশ্বাসে আমরা অপছন্দের কক্ষে ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করি। প্রায় ঘন্টাদুয়েক পর আমাদেরকে অন্য কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কক্ষটিও আমাদের মনপুত হয়নি। তবুও থাকতে হলো। কক্ষগুলোতে টিভি-ফোনসহ সবকিছু থাকলেও কক্ষের আকৃতি, টয়লেট, কাঠ এগুলো মানসম্পন্ন নয়। দুপুরের খাবার খেতে নীচতলা তথা হোটেলের মাটির নিচেরতলায় গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। সেখানে রান্নাঘরসহ ১৫/২০ জন বসার ব্যবস্থা আছে। রাঁধুনী ও সরবরাহকারী সবাই মহিলা। আমরা দু'জনে দুপুরের খাবার খেয়ে কক্ষে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই। এরই মধ্যে সাখাওয়াত সাহেব ই-মেইলে আগে থেকে যোগাযোগ থাকা এক ব্যবসায়ীকে টেলিফোন করায় বিকাল ৭টায় তাদের অফিসে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠাবে বলে রাখে।

আমাদের ট্যুর প্রোগ্রাম বিকাল ৩টা থেকে ৬টা এবং কাল ৯টা থেকে ১২টা। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিচে রিসেপশন সংলগ্ন একদিকে সোফায় বসি ৩টার দিকে। যথাসময়ে ট্যুরের গাড়ি আসলে আমরা ঐ গাড়িযোগে রওনা হয়ে যাই। আমরা দু'জনকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় আব্বাসী হোটেলের সামনে। সেখানে বিভিন্ন ট্যুরিজমের অফিসাদি রয়েছে। এই আব্বাসী হোটেল ইস্পাহানের একটি প্রাচীন নিদর্শন। শাফাবিদ যুগের শেষ শাহ সুলতান হোসেনের সময় (১৬৯৪-১৭২৩) শহর হতে শহরে ভ্রমণকারীর জন্য সরাইখানা হিসাবে এটি নির্মিত হয়েছিল। এই আয় হতে সাহারবাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হতো। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকার পর এটিকে দৃষ্টিনন্দন পাঁচ তারকা মানের হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে বর্তমান ইস্পাহানে পাঁচ তারকা মানের হোটেলগুলোর মধ্যে আব্বাসী হোটেল অন্যতম।

ট্যুর গাইড আমাদের আব্বাসী হোটেল ঘুরেফিরে দেখায় এর বর্ণনা দিতে দিতে। আব্বাসী হোটেলের পার্শ্বেই একই সময়ের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ এবং রাজাদের নানান স্থাপনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আব্বাসী হোটেল দেখা শেষ করে আমরা যাই বিখ্যাত খাজু ব্রীজে। যায়ানদেহ নদীতে এ খাজু ব্রীজ নির্মিত হয় ১৬৫০ সালে। দ্বিতীয় শাহ আব্বাস এই দ্বিতল ব্রীজ নির্মাণ করেন ইস্পাহানের দক্ষিণাঞ্চল ও সিরাজ নগরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। এই ব্রীজটি বাঁধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ১৩২ মিটার দীর্ঘ ব্রীজটির নিচের অংশে পানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তৈরী করা ছিল। ইস্পাহান নগরীর প্রাণকেন্দ্র দিয়ে প্রবাহিত এই বিখ্যাত নদীতে ১১টি ব্রীজের অপর একটি পুরাতন ব্রীজ হচ্ছে সিওসেহ ব্রীজ। ১৫৯৯ হতে ১৬০২ সালে এ ব্রীজ তৈরী হয়। এই ব্রীজও বাঁধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

আমরা দু'জন বাদে বাকী সবাই ইরানী বিধায় গাইড সমস্যায় পড়ে ফার্সী ভাষায় বর্ণনা দেবে না কি ইংরেজি ভাষায় বর্ণনা দেবে এই নিয়ে। ফলে তিনি ২ ভাষায় বর্ণনা দিয়ে যেতে থাকে।

এই নদীর উভয়পাড়ে পর্যটক বিনোদনের পার্কসহ নানান স্থাপনা রয়েছে। ফলে শহরের সৌন্দর্য অনায়াসে বুঝা যায়। মতিঝিল-দিলকুশা এলাকার ১৫/২০ তলা দালানাদির মত দালান চোখে না পড়লেও ২/৩ তলা থেকে ৫/৭ তলা নানান সৌন্দর্যমণ্ডিত দালানাদিতে ইস্পাহান নগরীর শোভা প্রত্যক্ষ করি।

শহরের অন্যান্য স্থাপনার গাড়ির ভিতর থেকে দেখে এবং গাইডের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমরা কয়েক কি. মি. দূরে চেহেল সতুন প্রাসাদে পৌঁছি। এ প্রাসাদ রাজকীয় অনুষ্ঠান ও রাজকীয় মেহমানদের আপ্যায়ন করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। এ প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয় ১৬৪৭ সালে দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের আমলে। প্রাসাদ সম্মুখের বারান্দা, সামনে লেক ও ফোয়ারা, বাগান, নানান অবকাঠামো, প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিনোদনের নানান কিছু সত্যিই চমকিত হতে হবে। প্রাসাদে নানান তথ্যচিত্রের মধ্যে দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের সাথে তুর্কিস্তানের নাদের খানের সাক্ষাত, ভারতের যুবরাজ হুমায়ুন ১৫৪৩ সালে পারস্যে আসার পর শাহ তামাসপের সাথে সাক্ষাতও রয়েছে।

ইস্পাহানে বহু প্রাচীন মসজিদ রয়েছে যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং এরকম একটি বিখ্যাত প্রাচীন মসজিদসহ আরো ২/১টি স্থাপনা সংক্ষিপ্তভাবে দেখিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম থাকায় হোটেলে ফিরে আসি পরদিন সকাল ৯টায় ২য় ট্যুরের কথা চূড়ান্ত রেখে।

হোটেলে ফিরে অল্পক্ষণের মধ্যে কক্ষে টেলিফোন আসে। আমাদের নিতে গাড়ি এসেছে বলে। আমরা নিচে এসে দেখি এক মহিলা এসেছে গাড়ি নিয়ে। এ মহিলা ঐ কোম্পানীর অফিসার এবং ইংরেজিতে দক্ষ। মহিলা গাড়িটি চালাচ্ছিল। আমরা দু'জন পিছনে বসলাম।

সাখাওয়াত সাহেবের সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ থাকায় এবং ইস্পাহানে এসে টেলিফোন করায় আলাপের জন্য এ যাত্রা।

মহিলা আমাদের বহন করে তার কারযোগে ইস্পাহান নগরীর শেষপ্রান্তে একটি বড় দালানের সামনে থামে। ঐ দালানের সামনের দিকের অংশে মহিলার কোম্পানীর অফিসাদি। মূল দালান কোম্পানীর আবাসস্থল। তবে তারা কেউ ইংরেজি জানে না বিধায় কোম্পানীর বৃহত্তর স্বার্থে ইংরেজি জানা এ মহিলাকে সম্মানজনক পদে রেখেছে।

সাখাওয়াত সাহেব মহিলার মাধ্যমে ব্যবসায়িক আলাপ করে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন ফলফলার ও নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করে।

এরই মধ্যে মাগরিবের আযান শুরু হয়। আগে উল্লেখ করেছি, ইরানে আযান লম্বা এবং আস্তে আস্তে টেনে টেনে দেয়া হয়। ফলে আযান শুরু থেকে শেষ হতে ৫/৭ মিনিট লেগে যায়। এ নিয়ে আমাদের সাথে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে রসালো আলাপ হয়। সেখানে আমরা পৃথক পৃথকভাবে মাগরিবের নামায পড়ার পর মহিলা আমাদের নামিয়ে দিতে আগ্রহ দেখায় – আমরা টেক্সিযোগে ফিরে আসব বলায়। যেহেতু মহিলার বাড়ী শহরের প্রাণকেন্দ্রে, আমাদের হোটেলের নিকটে। মহিলার কার চালু হলে – সাখাওয়াত সাহেব গম্ভীর কম কথা বলার লোক হলেও আজ আমার মত কৌতূহলী হয়। মহিলার সাথে আলাপ শুরু করে যদিও যাবার সময় তেমন আলাপ করা হয়নি। ঐ আলাপের সময় আমি উল্টো কৌতূহলী লোক হয়েও একদম চুপ ছিলাম। আমাদের মেয়ের বয়সী ঐ মহিলা বলল তার নাম "দানা"। সে ইস্পাহান ভার্সিটিতে ইংরেজি বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে এবং এই কোম্পানীতে চাকুরী করছে। সে একাকী চীন, সিরিয়া, দুবাই ট্যুর করেছে কোম্পানীর কাজে। ইস্পাহানে বসবাসকারী বাবা-মা'র সাথে থাকে। বাবা-মা, দুই ভাই বারেবারে চাপ দিতে থাকলেও বিবাহ করতে ভয় পাচ্ছে – বলল খারাপ লোকের হাতে পড়ে স্বাধীনতা খর্ব হয় নাকি এই ভয়ে। দানা বলল, ইরানে নারী স্বাধীনতা থাকলেও কোন কোন পরিবারে দাম্পত্য জীবনের তিক্ততা রয়েছে।

বর্তমানে তার বয়স ২৬। দাম্পত্য জীবন যে অপরিহার্য তা বুঝেও ভয় পাচ্ছে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় এই ভয়ে। ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে আমরা হোটেলে পৌঁছলে মেয়ে সমতুল্য দানা থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করি। তখন সেখানে হোটেল মালিক ছিল। দেখে ও কথায় বুঝলাম মালিক যেমনি চালু তেমনি প্রভাবশালী। যদিওবা তার হোটেল মানসম্পন্ন নয় এবং মালিক ঘুরেফিরে বারেবারে হোটেলে বসে সময় কাটাবে বলে মনে হচ্ছিল। রাত বেশি না করে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে নিচে গিয়ে নাস্তা সেরে নিই টাকার বিনিময়ে। দুই সপ্তাহ ইরানে থেকে এই হোটেলে ব্যতিক্রম হলো। অর্থাৎ টাকা দিয়ে হোটেলে সকালে নাস্তা সেরে নিতে হলো। সাখাওয়াত সাহেবের নিকটাত্মীয়ের দেশে অসুস্থতার সংবাদ পায়। কাজেই হোটেল থেকে দেখে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে অদ্য সকালে ট্যুরে বের হইনি। আমি ৯টার ট্যুরে গাড়ী আসামাত্র বের হয়ে পড়ি।

আমাদের প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় প্রাচীনকালের বিশ্বখ্যাত মসজিদে। ২৪ হিজরিতে পারস্যবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। এই বিশাল ও বিখ্যাত জামে মসজিদ স্থাপনের সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদিও ১১শ' বছরের পুরানো বলা হয় তবে পারস্যে ইসলাম আগমনের আগে যোয়োস্ট্রায়ানদের অগ্নি উপাসনালয় ছিল এই জামে মসজিদ। প্রাচীন পারস্যের ইয়াজদে যোয়োস্ট্রায়ানদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

বর্তমানে ইরানীদের শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী শিয়া। প্রথম নির্মাণ কাজে দক্ষ কারিগরের মজবুত গঠন এবং বারেবারে সংস্কার করতে থাকায় এই জামে মসজিদকে বিশ্বের প্রাচীন অবকাঠামোর মধ্যে একটি বলে মন্তব্য করা হয়ে থাকে। আমরা পরিদর্শনকালীনও সংস্কার কাজ প্রত্যক্ষ করি। এই মসজিদের বিশাল গম্বুজ, নানান কারুকার্য খচিত দৃষ্টিনন্দন পিলার দেখে চমকিত হতে হয়। গোলাকৃতির অযুর স্থান, বিশাল চত্বর, ফ্লোরে হল রুম ইত্যাদিসহ একটি ইসলামী কমপ্লেক্স বলা যাবে। মসজিদটি এমনভাবে নির্মিত যাতে ইমাম নামাজ ও খুৎবা দেওয়াকালীন বিশাল মসজিদের অধিকাংশ মুসল্লী যেমনি দেখতে পাবে তেমনি সমস্ত মুসল্লী শব্দ শুনতে পাবে। সেকালের বিশাল বিশাল পাথর দেখে ভাবতে হবে সেকালে কি করে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগার বহু আগে এই রকম বিশাল কারুকার্য খচিত স্থাপত্য মসজিদ নির্মাণ সম্ভব হলো।

ঐ মসজিদ হতে আমরা আরো ২/৩টি প্রাসাদ ও মসজিদ প্রত্যক্ষ করে চলে যাই আর্মেনিয়ান এরিয়ায়। ইস্পাহানে বহু আর্মেনিয়ান রয়েছে। রয়েছে আর্মেনিয়ানদের গীর্জা ও যাদুঘর। শাহ আব্বাস আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বসবাস ও ব্যবসা করার জন্য। তাদের গীর্জা ও যাদুঘর ভ্রমণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। তথা হতে আমরা অভিষ্ট ও বিখ্যাত নখশ-ই-জাহান (সুসজ্জিত পৃথিবী)-এর বহিরাঙ্গনে পৌঁছে গাড়ি পার্ক করে হেঁটে হেঁটে নখশ-ই-জাহানের দিকে যেতে থাকি। তবে বাহির থেকে পুরো বুঝা যায় না। কিন্তু যখন নখশ-ই-জাহানের ভিতর প্রাঙ্গণে পৌঁছি তখনই থমকে দাঁড়াতে হলো। এত বিশাল চোখ ঝলসানো স্থাপত্য নিদর্শন জানিনা বিশ্বে কয়টি আছে – যার বর্ণনা এই প্রবন্ধে আগে দেওয়া হয়েছে।

১৬১১ সালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪শ' বছর আগে নির্মিত এই প্রাসাদ এখনো অক্ষত বলা যাবে। চলছে সংস্কার কাজ। কয়েক কি. মি. এরিয়া জুড়ে ডিম্বাকৃতির মধ্যখানে প্রায় এক কি. মি. এরিয়ার ময়দান রেখে এই নখশ-ই-জাহান ভালভাবে ঘুরে দেখতে মনে হয় ২/৩ দিন সময় লেগে যাবে। কিন্তু আমরা মাত্র ৩ ঘন্টা ট্যুরের সময়- স্বল্পতায় এখানে ঘন্টাখানেক সময় ব্যয় করতে পারলাম। অতৃপ্ত মনে হোটেলে ফিরে যেতে হলো।

ইস্পাহান ভ্রমণ করতে হলে কম করে হলেও ৮/১০ দিন সময়ের প্রয়োজন। এত বেশী দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য রয়েছে ইস্পাহানে। শহরের গোলচক্করের বাগান, রাস্তার মাঝখানে বাগান ইস্পাহানের সৌন্দর্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। চারিদিকে মরুভূমি, বাতাসের আর্দ্রতা কম। ফলে প্রাচীন নিদর্শনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধাজনক করে দিয়েছে প্রকৃতি। ইস্পাহানে সারাবছর বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। আকাশ থাকে মেঘমুক্ত।

খবর নিয়ে জানতে পারি ইস্পাহানে দুজন বিখ্যাত ইমামজাদা রয়েছেন। হোটেল মালিক আমাদেরকে একটি টেক্সি ঠিক করে দিল ইমামজাদাগণের যেয়ারত করে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ইস্পাহান থেকে সিরাজ যাওয়ার আমাদের ফ্লাইট সন্ধ্যা ৭:১০ মিনিটে। কিন্তু আমরা দুপুরের খাবার, নামাজ ও ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে ৩টার দিকে বেরিয়ে পড়ি।

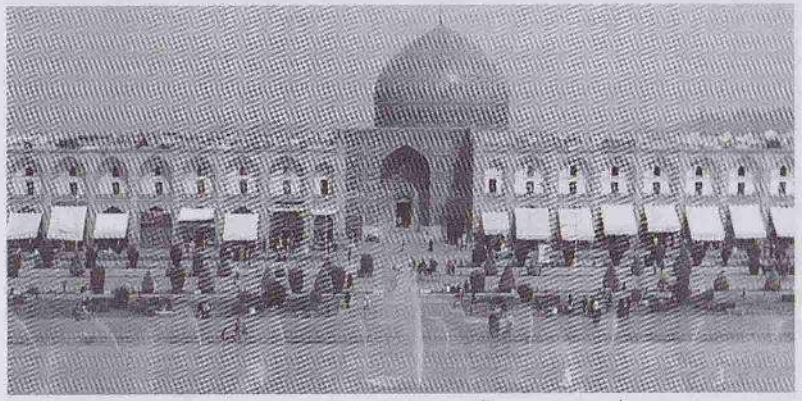

ইস্পাহানে নখশ-ই-জাহানের সম্মুখভাগ

ইস্পাহান শহরের একপ্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল এরিয়া নিয়ে প্রকাণ্ড মাজার এক ইমামজাদার। মাজারের নিচের দিকে পাহাড়ের গায়ে শত শত কবর। এইসব কবর না কি শহীদগণের যাঁরা ইসলামী বিপ্লবের সময় শাহের বোমায় শহীদ হন। তবে প্রায় ইমামজাদার মাজার সংলগ্ন কবরস্থান দেখা যায়। শিয়ারা ইমামজাদার মাজারের নিকট কবর পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার মনে করে থাকে।

ইরাকের নজফে হযরত আলী (ক.)-এর মাজারের নিকটে কয়েক কি. মি. এরিয়া নিয়ে শিয়াগণের কবরস্থান রয়েছে।

আমরা ইমামজাদার মাজার যেয়ারত করে বিমানবন্দরের দিকে যেতে থাকি। বিমানবন্দরের নিকটে আর এক ইমামজাদার মাজার যেয়ারত করে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে করতে বিকাল ৬টা পার হয়ে যায়।

বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমরা প্রায় শতাধিক আসনের Fokker-100 Aircraft-এ প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করি পাশাপাশি। বিমানের ভিতর মাগরিবের নামাজ পড়তে হলো সূর্যাস্ত হওয়ার কারণে।

ইস্পাহান থেকে ৪৮৫ কি. মি. দক্ষিণে ১ ঘন্টা ১০ মিনিটের যাত্রায় আমাদের বিমান আকাশে উড়াল দেয়। আকাশে স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছলে যথানিয়মে বিমানবালারা আমাদেরকে বড় আকারের খাবার প্যাকেট সরবরাহ করে মাত্র ৪/৫ মিনিটের মধ্যে। উড়োজাহাজের ভিতর খাবার খেতে খেতে আমরা যথাসময়ে সিরাজ বিমান বন্দরে অবতরণ করি।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) ও তাঁর যেয়ারত

বালাগাল-উলা বিকামালিহী,
কাশাফাদ্‌দুজা বিজামালিহী,
হাসানাত-জামিওঁ খিসালিহী,
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহী।

তিনি বিজ্ঞগুণে মহিমার শীর্ষে পৌঁছেছেন। আপন সৌন্দর্যে তিনি অন্ধকার বিদূরিত করেছেন। তাঁর সকল স্বভাবই ছিল সুন্দর। তাঁর প্রতি এবং তাঁর (স.) বংশধরদের প্রতি দরুদ ও সালাম।

বিশ্বের অন্যতম আশেকে রসূল, নবীপ্রেমিক, বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক, আধ্যাত্মিক জগতের বিশাল ব্যক্তিত্ব মহান অলী হযরত শেখ সাদী (রহ.) রচিত উক্ত না'ত শরীফ বিশ্বে বহুল পরিচিত, সর্বজনগ্রাহ্য ও সবচেয়ে বেশী পঠিত। এ না'ত শরীফ জানে না এমন সচেতন উম্মতে মুহাম্মদী (স.) বিশ্বের বুকে কম পাওয়া যাবে। এমনকি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও এ না'ত শরীফ বহুল পরিচিত বলা যায়।

এ বিখ্যাত না'ত শরীফ এবং বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থ বুস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ'র রচয়িতা হযরত শেখ সাদী (রহ.) ইরানের সিরাজ শহরে চিরনিদ্রায় শায়িত।

হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর মূল নাম হযরত শেখ মুসলেহ উদ্দীন সাদী। তিনি ৫৭১ হিজরি/১১৮৪ ইংরেজি পারস্যের তৎকালীন রাজধানী সিরাজ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর বলে প্রচার রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ আতাবেগ তোগলার দরবারে চাকরী করতেন। তিনিও একজন শরীফ ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

অল্প বয়সে হযরত শেখ সাদী (রহ.) পিতৃহারা হন। তাঁর বড় ভাই ফল ব্যবসা চালিয়ে অতি সামান্য আয়ে দিন যাপন করতেন।

হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর জীবনকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগ হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন। প্রথম জীবনে তিনি ১২২৬ ইংরেজি পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনে কাটিয়ে দেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ভাগ হল ভ্রাম্যমাণ। ১২২৬ হতে ১২৫৬ ইংরেজি পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর তিনি বিশ্বের নানান দেশ সফর করে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শেষ জীবন তথা তৃতীয় ভাগ হল ১২৫৬ ইংরেজি

হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর মাজার

হতে ১২৯১ ইংরেজি পর্যন্ত। এ সময় তিনি সিরাজ নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে প্রকৃত সূফীতত্ত্বের গভীরে গিয়ে আল্লাহ্‌পাকের ইবাদতে ও কাব্য রচনায় নিমগ্ন থাকতেন। তখনকার আমলে সিরাজ নগরী ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল।

হযরত সাদী (রহ.) সিরাজ নগরীর মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় বিশ্বের তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান নগরী বাগদাদে যান এবং নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। বাগদাদে তিনি আবুল ফারাহ ইবনুল জওযীর (ইন্তেকাল ১২০০ ইংরেজিতে)-এর নিকট দর্শন ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও ভূগোলে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই তফসীরে কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্ প্রভৃতি ইসলামী ধর্মতত্ত্বে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। একজন কঠোর শরীয়ত-পন্থী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি বিখ্যাত সূফিগণের সংস্পর্শে থাকতেন। ফলে তাসাউফে (Mysticism) গভীর জ্ঞানলাভ করেন। সে সময় তিনি বিখ্যাত হযরত শেখ সাহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর (মৃত্যু ১২৩৪ ইংরেজিতে) নূরে নজরে পড়েন। এতে তাঁর কাছ থেকে সূফিতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেন। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় সফর করে জ্ঞান অর্জন করে কাটিয়ে দেন। জীবনের শেষ অংশ

সিরাজে কাটাতে তিনি সংসার-বিরাগী সূফীর মতো কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকলেও হযরত সাদী শরীয়তের লংঘিত কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি বহুভাষাবিদ হয়েও আধুনিক ও ফারসী ভাষাতেই কাব্য রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে হযরত সাদী সিরাজে ফিরে এসে দেখেন তাঁর জন্মভূমি দারুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতান আতাবেগকে শহীদ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উলট-পালট করা হয়েছে। জনসাধারণ লুণ্ঠন ও শোষণের সম্মুখীন হয়।

সিরাজের মানুষের অবস্থা দেখে হযরত সাদীর মন ভেঙ্গে পড়ে। এতে তিনি দেশের মায়া ত্যাগ করে সফরকারী হওয়াকে শ্রেয় মনে করলেন। এ সফরে তিনি একযোগে ত্রিশ বছর অতিবাহিত করে খোরাসান, তাতারী, গজনী, কাশগড়, বলখ, পাঞ্জাব, সোমনাথ, গুজরাট, হেজাজ, ইয়েমেন, আবিসিনিয়া, মূলকে শামের সিরিয়া ও দামেস্ক, ফিলিস্তিন, বালবেক, উত্তর আফ্রিকার দেশসহ এসব দেশ-মহাদেশের বহু বিখ্যাত শহর, অঞ্চল সফর করে জ্ঞান অর্জন করতে সচেষ্ট হন।

ইয়েমেন সফরকালে হযরত সাদীর ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়।

তিনি ১৪ বার পায়ে হেঁটে হজ্বব্রত পালন করেছিলেন। দীর্ঘদিন ২ হারমে অবস্থান করেছিলেন এবং তথাকার যেয়ারতকরীগণকে পানি পান করাতেন।

ফিলিস্তিনে তিনি বন্দী হন এবং আলেপ্পোর এক ধনী বন্ধুর সাহায্যের বিনিময়ে মুক্ত হন। বন্ধুর অনুরোধে তার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু মূর্খ ও উগ্র স্বভাবের ঐ স্ত্রীর সংসার জীবন বিষময় হয়ে উঠে। অতপর নানান দেশ ঘুরে সিরাজে পূর্বতন পৃষ্ঠপোষক আতাবেগ সাদের পুত্র আবু বকর সাদের (৬২৩-৬৫৮ হিজরী) সুশাসন ফিরে এলে তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে সিরাজে ফিরে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

এখানে হযরত সাদীর জীবনের অধ্যাপনা তথা তৃতীয় জীবন শুরু হয়। হযরত সাদী একাগ্র মনে মোরাকাবা মোশাহেদায় মশগুল ও কাব্যচর্চা এবং সাহিত্যানুশীলনে মনোনিবেশ করেন। জ্ঞানলব্ধ হযরত শেখ সাদী তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে লেখনীতে প্রকাশ করেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

হযরত শেখ মুসলেহ উদ্দীন সাদীর শ্রেষ্ঠ অবদান 'বুস্তাঁ' (১২৫৭ইং) গুলিস্তাঁ (১২৫৮ইং) রচিত হয়। সফরশেষে সিরাজ নগরীতে ফিরে এসে তিনি চার খণ্ডে রিসালা, গুলিস্তাঁ'র প্রধান অংশ ও খুবিসাত নামক গ্রন্থের কিছু অংশ গদ্যে রচনা করেন। তাঁর বাণী সমস্ত রচনা কবিতায় রূপ পেয়েছে। তিনি কাছিদা লেখেন আরবী ও ফারসীতে, শোকগাথা লেখেন আরবী ও ফারসীর সংমিশ্রণে এবং তাজিয়াত মুফারাদাত সাহিবিরাহ ও মুকান্নাত, অজস্র রুবাই ও গজল রচনা করেন

প্রধানত ফারসীতে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। নুযহাতুল বাসাতিন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাদী আল্লাহপাকের দীদারের প্রত্যাশায় ৪০ বৎসর রাত্রি জাগরণ করে কাঁদতে থাকেন।

একজন প্রখ্যাত লেখক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, একজন প্রখ্যাত বুযুর্গব্যক্তিত্ব স্বপ্নে দেখেছেন সমস্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী কবিগণের এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত নবী পাক (স.) ঐ সমাবেশে তশরীফ আনেন। উক্ত সমাবেশে কবিগণ হযরত নবী পাকের শানে তাঁদের নিজ নিজ কসিদা শোনান। সমাবেশে হযরত শেখ সাদী (রহ.) নিম্নোক্ত পংক্তি পেশ করেন :

ইমামে রসূল পেশওয়ায়ে সাবীল!
আমিনে খোদা মাহবতে জিব্রাইল!
ছে ওয়াচফত কুনদ সাদীয়ে না তামাম!
আলাইকাস্‌সালামে আই নবীয়াল হারাম!

রসুলগণের ইমাম (হেদায়তের) পথের অগ্রদূত; খোদার বিশ্বস্ত (বন্ধু), জিব্রাইল (আ.) এর অবতরণ স্থল। অপূর্ণাঙ্গ সাদী আপনার কি গুণাবলী বর্ণনা করব! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, হে সম্মানিত নবী।

উক্ত পংক্তিগুলো শোনানো অবস্থায় হযরত রসূলে করিম (র.) দণ্ডায়মান হয়ে হযরত সাদী (রহ.)-এর সাথে আলিঙ্গন করেন। এ মহান অলী, কবি, দার্শনিক ও আশেকে রসূল ১২৯১ইং ইরানের সিরাজ নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

যেয়ারত : ১৫ সেপ্টেম্বর '০৫ বৃহস্পতিবার রাতে ইস্পাহান থেকে ইরান এয়ারে সিরাজে পৌঁছে হোটেলে অবস্থান নিই। শুক্রবার সিরাজের এক গাইডের নিয়ন্ত্রণে সকালবেলা সিরাজ শহরের একপ্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশে হযরত সাদী (রহ.)-এর মাজারের গেটের বাহির প্রাঙ্গণে পৌঁছি। গেটের বাহিরে গাড়ী পার্ক করার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে সরকারী ব্যবস্থাপনায় শৃংখলাবোধ। কিন্তু গেটে টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে।

সফরসাথী সাখাওয়াত সাহেবসহ ইরানী কত রিয়ালের টিকেট কিনলাম মনে নেই। তবে গাইডের পরিচয়পত্র থাকায় এখানেসহ কোথাও তাদের টিকেট প্রয়োজন পড়েনি। গেট থেকে প্রায় ১৫০/২০০ মি. দূরত্বে হযরত সাদী (রহ.)-এর মাজার। সমতল হতে কিছুটা উপরের দিকে। মনে হয় পাহাড়ের পাদদেশে হওয়ায়। হযরত সাদীর মাজারসহ প্রায় ৩/৪ একর এলাকা নিয়ে মসজিদ, লাইব্রেরী, রেস্টুরেন্ট, টয়লেট, ঝর্ণাসহ নানান স্থাপনা। রয়েছে শত শত নাম না জানা বৃক্ষ। ঐসব বৃক্ষের ডালে সাউন্ড বক্স বসানো রয়েছে। কোন এক স্থান থেকে টেপ বজানো হচ্ছে। ঐ টেপের মাধ্যমে হযরত সাদী (রহ.)-এর বিভিন্ন গ্রন্থ হতে শ্রুতিমধুর শব্দের কছিদা পাঠ করা হচ্ছে আবেগাশ্রুত যন্ত্রের শব্দের সহযোগে।

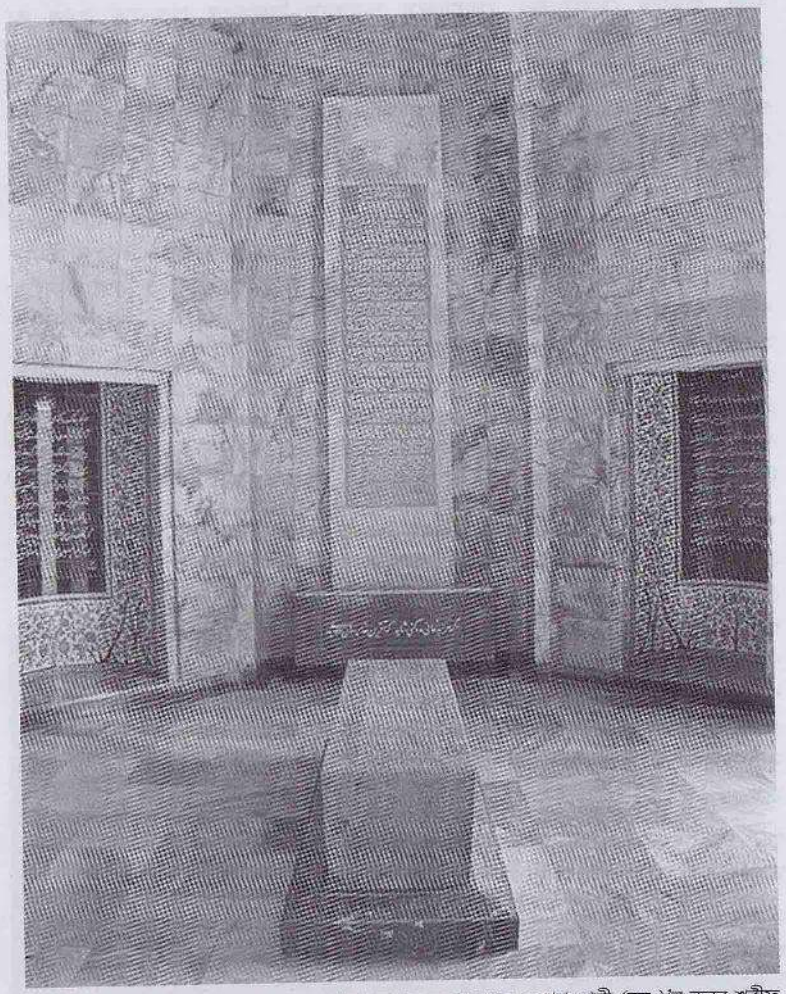

মাজারের অভ্যন্তরে হযরত শেখ সাদী (রহ.)'র কবর শরীফ

এতে গেইট পার হওয়া মাত্র দর্শক তার মনমানসিকতার পরিবর্তন অনুভব করে। শরীরে এক প্রকারের শিহরণ অনুভব করে। শতশত দর্শকের মন মানসিকতা শত শত বছর পিছনে ফিরে যাবে। আমরা হেঁটে মাজারে প্রবেশ করে ব্যথিত হই ইরানী নর-নারীগণের কাণ্ড দেখে। তারা মনে হয় একজন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিকের কবর দেখতে এসেছে। কাজেই মাজারের ভিতরও নর-নারীরা জুতা না খুলে কবরের চতুর্দিকে হাঁটাহাঁটি করছে। ঐ মুহূর্তে আমার মনে তিনি যে মহান অলী

সূফী, প্রখ্যাত মোফাচ্ছের, মোহাদ্দেস সবশেষে বিশ্বখ্যাত আশেকে রসুল তা বেমালুম ভুলে যাই। যেহেতু আমার মনে তখন অনুভূতি জাগরুক থাকে একজন বিখ্যাত জ্ঞানী তথা কবি ও দার্শনিক হিসেবে। ঐ সময় আমার মনে বুস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ'র নানান শিক্ষণীয় কথা মনে আসতে থাকে এবং এমন মানসিকতায় যেয়ারত করে ফিরে যাই। কিন্তু মহান আল্লাহপাকের মহিমায় বিকেলের দিকে হঠাৎ আমার শরীরের আপাদমস্তক শিহরে উঠে। শরীরে কম্পন শুরু হয় যে, আমি হযরত সাদীর মাজারে একজন বিশ্বখ্যাত আশেকে রসূল হিসেবে মন-মানসিকতায় যেয়ারত করি নাই, করি নাই মোরাকাবা এবং বারেবারে মনে পড়তে থাকে "বালাগাল-উলা বিকামালিহী....." যা সারাজীবন পড়ে আসছি। এ বিখ্যাত না'ত শরীফ সকালবেলা যেয়ারতে বেমালুম ভুলে যাই। ঐ মুহূর্ত থেকে আমি সাখাওয়াত সাহেব ও গাইডকে বারেবারে বলতে থাকি পুনরায় হযরত সাদী (রহ.)-এর মাজারে যাব বলে। তখন গাইড আশ্বস্ত করল সন্ধ্যা পর্যন্ত মাজারে প্রবেশের নিয়ম রয়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। সিরাজে অন্যান্য স্থান ঘুরেফিরে গাইড সূর্যাস্তের আগে আমাদেরকে হযরত সাদী (রহ.)-এর মাজার গেটে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

পুনরায় টিকেট নিয়ে প্রবেশ করার সময় আমরা বিকেলে পুনরায় আসলাম বুঝতে পেরে টিকেট কাউন্টারে ও গেটে বলাবলি করছিল, যেহেতু বিদেশী আগমন নেহায়েত কম এবং আমার পোশাক-আশাক ব্যতিক্রম বিধায় তাদের স্মরণ রয়েছে। পুনরায় বিকেলে প্রবেশ করার সময় আমার মন-মানসিকতা সকালের চেয়ে ভিন্নতা অনুভব করতে থাকি। এবং মাজারে প্রবেশ করে জুতা পায়ে অসংখ্য নর-নারীর মাঝে তরীকতের তরতীবে সালাম পেশ ও ফাতেহা শরীফ পড়ে সওয়াব পেশ করে ঐ স্থানে চক্ষু মুদ্রিত করে বসে দীর্ঘক্ষণ এ মহান আশেকে রসূলের মাজার শরীফে মোবাকাবা করে ফয়েজ হাসিল করি। যখন চক্ষু খুলি তখন দেখি অসংখ্য নর-নারী কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

যেয়ারত শেষে প্রশান্ত মনে বেরিয়ে এসে মাজার কমপ্লেক্স-এর ভিতর মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ে আমরা চারিদিক ঘুরাফেরা করে কিছুক্ষণ সময় কাটাই।

তখন ভাবতে থাকি কাল সিরাজ নগরী ত্যাগের আগে যদি মনে না পড়ত মহান আশেকে রসূল হিসেবে মন-মানসিকতায় যেয়ারত না করার কথা তবে সারাজীবন নিজেকে নিজে দাহ করতে থাকত। যেহেতু পুনর্বার কোন সময় ইরান এসেও তেহরান থেকে ৯০০ কি.মি. দূরত্বে সিরাজ আসা হয়ত সম্ভব হতো না।

মাজারের এলাকা থেকে উৎফুল্ল মন নিয়ে আমরা টেক্সিযোগে সিরাজ নগরীর প্রবেশ মুখে বিখ্যাত কোরআন গেটে চলে যাই হযরত খাজু কেরমানীর যেয়ারতে।

সিরাজে ২ রাত ১ দিন

৫ সেপ্টেম্বর '০৫ বৃহস্পতিবার রাত ৮:৩০ মি.-এর দিকে ইরানের ইস্পাহান নগরী থেকে ইরান এয়ারে সিরাজ বিমান বন্দরে অবতরণ করি। সফরসাথী সাখাওয়াত সাহেবসহ আমাদের বহনকারী Aircraftটি টার্মিনাল ভবনের নিকটে এসে থামে। আমরা দুজন অন্যান্য যাত্রীদের সাথে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে হেঁটে হেঁটে টার্মিনাল ভবনের দিকে যাই। ইস্পাহান বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন থেকে ছোট আকৃতির হলেও এ ভবন উচ্চতায় বেশী এবং টার্মিনাল ভবনটি বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছিল।

হাফেজ সিরাজীর মাজার

টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করেই ট্যুরিস্ট কাউন্টারে যোগাযোগ করি। কর্মরত মহিলা আমরা দুজন বিদেশী দেখে সহযোগিতায় বেশ তৎপর মনে হল। এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম টার্মিনাল ভবনটি স্টিল ফ্রেমের উপর নির্মিত এবং একতলা বিশিষ্ট হলেও চতুস্পার্শ্বে দুইতলা বিশিষ্ট মধ্যখানে একতলা বিধায় উচ্চতায় বেশী।

মহিলা আমাদেরকে একটি মানসম্পন্ন হোটেল বুক করে দিল দু'রাতের জন্য। এও বলল, সিরাজে ইস্পাহানের মত গ্রুপ ট্যুর-এর ব্যবস্থা নেই। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সহায়তা করবে। ইস্পাহানের মত আমাদেরকে ভ্রমণ তথ্যের কাগজপত্র দিল ইংরেজি ভাষায়। একটি টেক্সীও ঠিক করে দিল হোটেলে পৌঁছে দেয়ার জন্য। টেক্সী শহরে রওয়ানাকালীন এবং শনিবার শহর থেকে এয়ারপোর্টে আসাকালীন মনে হচ্ছিল সিরাজ শহর বিমান বন্দরের নিকটে। হয়ত শহর সম্প্রসারণ হয়ে বিমান বন্দরের নিকটে চলে এসেছে। সিরাজ নগরীর রাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা নির্দিষ্ট হোটেলের সম্মুখে এসে পৌঁছি।

আমাদের হোটেলের নাম হল ARYO HOTEL. ইস্পাহানে আমরা যে হোটেলে অবস্থান করেছিলাম তা হলো AVA HOTEL. টেক্সির ভাড়া প্রদান করে হোটেলে প্রবেশ করে এর রিসিপশনে রিপোর্ট করে কক্ষে গেলাম। সিরাজ বিমান বন্দরের ট্যুরিস্ট অফিসার কর্তৃক প্রদানকৃত আমাদের এ হোটেলটি তেহরানের হোটেল থেকেও উঁচুমানের। নতুন চকচকে তকতকে মানসম্পন্ন হোটেল। বিদেশী বলে হোটেলের সকলে আমাদেরকে সম্মান করছিল।

হোটেলের রিসিপশনের নিকটেই ট্যুরিস্ট কর্নার রয়েছে। রিসিপশনিস্ট জানালো আগামীকাল শুক্রবার সকালে ট্যুরিস্ট গাইডের দেখা হবে। আমরা রাত গভীর না করে হোটেল রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সেল্‌ফ সার্ভিসে হোটেল রেস্টুরেন্ট থেকে সকালের নাস্তা সেরে রিসিপশনের নিকটে ওয়েটিং রুমে বসে গাইডের জন্য অপেক্ষায় থাকি। আলোচনার ফাঁকে সাখাওয়াত সাহেব রিসিপশনিস্ট থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়ে গাইডকে ফোন করে তাড়াতাড়ি হোটেলে আসার জন্য। হোটেলে আসলে দেখতে পেলাম যুবক গাইড। আলোচনা করে সারাদিনের জন্য টেক্সিসহ তাকে বুক করি সিরাজ নগরীতে যেয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থান দেখার উদ্দেশ্যে।

গাইড ফোন করে সারাদিনের জন্য একটি টেক্সি হোটেলের সম্মুখে নিয়ে আসে। শুরু হলো আমাদের সিরাজে যেয়ারত ও ভ্রমণ।

ইরানের সিরাজ শহরের যেমন নানান ইতিহাস রয়েছে তেমনি ঐতিহাসিক স্থাপনাও রয়েছে প্রচুর। তবে ইস্পাহানের মত নয়। শহরের সৌন্দর্যও উপভোগ করার মত। তবে শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে রাস্তার পার্শ্বে, গোল চক্করে সুন্দর এবং সাজানো বাগান।

গাইড আমাদের দুজনকে প্রথমে হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর মাজারে নিয়ে যায়। তথা হতে করিম খান ২য় প্রাসাদ ঘুরেফিরে দেখলাম। সিরাজ শহরের প্রাণকেন্দ্র। শাহ আমলে এ কিল্লা বন্দীখানা হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিল। অতপর নাসির আলমূলক মসজিদ দেখতে যাই। এটি সিরাজের প্রাচীন ও বিখ্যাত মসজিদ।

তবে সিরাজে এত দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে Ghabam নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তির যাদুঘর। ধনী Ghabam ১৭০ বছর আগে পারস্যের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মূর্তি তৈরী করে একটি যাদুঘর করে সংরক্ষণ করেছেন। যাদুঘরটি একসময় স্থপতি ঐ কোটিপতির প্যালেস ছিল।

হাফেজ সিরাজী, হযরত শেখ শাদী, মহাকবি ফেরদৌসী, ইবনে সিনা, আগ্রার তাজমহল নির্মাতাসহ প্রায় শ'খানেক বিখ্যাত মনীষী, দার্শনিক, কবি, প্রকৌশলী, হাকিমসহ নানান জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির ভাস্কর্য বানিয়ে সংরক্ষণ করা আছে। আমরা দীর্ঘসময় সেখানে কাটানোতে জুমার নামাজের সময় হয়ে আসে। জুমার নামাজের জন্য যাওয়ার পথে হযরত আলী ইবনে হামজা অর্থাৎ ইমাম মুছা কাজিমের নাতির কবর যেয়ারত করলাম। আবদার করায় গাইড সিরাজের প্রধান মসজিদে আমাদের জুমা পড়তে নিয়ে যায়। এ মসজিদও তেহরানের প্রধান মসজিদের মত স্টিলের এঙ্গেলের উপর বিশাল শেড দ্বারা নির্মিত। গত শুক্রবারের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতের তুলনায় এখানে লোক সমাগম কম। তবে জুমার নামাজের ধরন একই রকম। জুমা শেষে আমরা নির্ধারিত টেক্সীযোগে হোটেলে ফিরে আসি দুপুরের খাবার ও ঘন্টাখানেক বিশ্রামের উদ্দেশ্যে।

ইরানের একটা ধর্মীয় প্রথা খুবই ভাল লাগল জুমার খুৎবায় এবং মাজারে। জুমায় ইমাম বা মাজারে কেহ বড় করে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে উপস্থিত সকলে বড় আওয়াজে সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ পড়েন। আর তা হলো "আল্লাহুমা ছল্লিআলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মোহাম্মদ"।

এ দৃশ্য বিভিন্ন মাজারের পাশাপাশি তেহরান ও সিরাজের জুমার খুৎবায়ও বারেবারে প্রত্যক্ষ করি।

বিকাল প্রায় চারটার দিকে গাইড আমাদেরকে নিয়ে টেক্সিযোগে সোজা হযরত হাফেজ সিরাজী (রহ.)-এর মাজারে নিয়ে যায়। সেখানেও হযরত সাদী (রহ.)-এর মাজারের মত টিকেটের ব্যবস্থা করা আছে। প্রায় কয়েক একর জায়গা নিয়ে এ মাজার কমপ্লেক্স এবং রয়েছে অসংখ্য গাছপালা। গাছের ডালে মাইক লাগানো আছে। হযরত সিরাজী'র বিভিন্ন কবিতা সুরে সুর মিলিয়ে আবৃত্তির রেকর্ড বাজছিল মাইকের মাধ্যমে। এতে সমগ্র এলাকায় এক ভাব-আবেগের সৃষ্টি হয়। এ জায়গাও ইরানী নর-নারীর বিনোদন কেন্দ্র। সকলে জুতা পায়ে মাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছে। কারও দোয়া-দরুদ পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। দেখা যাচ্ছিল না ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে শ্রদ্ধাবোধের লক্ষণ।

হযরত সাদী (রহ.) ও হাফিজ সিরাজীর মাজারে ইরানীদের এ আচরণ দেখে ব্যথিত হলাম। তারা মনে হয় ইমামজাদা বাদে আর কাকেও ধর্মীয় দৃষ্টিতে সম্মান করতে ইচ্ছুক নন।

এ মহান কবির নামকরণে সিরাজ শহরের নামকরণ। কবি হাফিজ সিরাজীর মাজারের নিকটে একটি সাদামাটা একতলা দালানে বহু কবর রয়েছে, গাইড বলল। আমরাও দেখলাম লম্বা দালান। তবে কার কবর গাইডেরও জানা নেই।

সিরাজ নগরীর প্রাণকেন্দ্রে শিয়াগণের প্রধান আকর্ষণ হযরত ইমামজাদা হযরত শাহ চেরাগের মাজার। মনে হলো ৫/৭ একর এরিয়া নিয়ে মাজার কমপ্লেক্স। ইরানে ইমামজাদাগণের কয়েকটি বিখ্যাত মাজার ও কমপ্লেক্স রয়েছে। এর মধ্যে সিরাজ নগরীতে এটিও একটি। ইমামজাদা হযরত শাহ চেরাগ হযরত ইমাম রেজা-এর ভ্রাতা। সেখানে সৈয়দ বংশের ইমামের কবরও রয়েছে। আরও রয়েছে ইমাম মুছা কাজিমের পুত্র ইমামজাদা মীর মোহাম্মদ-এর।

গাইড আমাদেরকে নিয়ে বিকেলে আরও দেখাতে সচেষ্ট হয় সিরাজের বিখ্যাত দিলকুশা গার্ডেন ও কমলা, আপেলসহ নানান ফলফলাদির বাগান। সিরাজের শহর থেকে শহরতলীও কম সুন্দর নয়।

সিরাজ নগরীর নদীটি শুকনো দেখলাম। আমরা বিদেশী বিধায় গাইড মন খুলে সময় দিয়ে সাধ্যমতো সবকিছু দেখাতে তৎপর। শহরতলীর বাগানের নিকটে রয়েছে সেখানকার তৈরী এক হেকিমী ঔষধের বিশাল ও বিখ্যাত দোকান। বিভিন্ন লতাপাতা ও গাছের রস থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঔষধ জানলাম। তথায় ক্রেতাসাধারণ যাওয়া-আসা করছে ঔষধের জন্য। বড় বড় কাঁচের ড্রামে বিবিধ প্রকারের ঔষধ দেখতে পেলাম। বিকেলে হযরত সাদী (রহ.)-এর ২য় বার যেয়ারত করে গাইডকে তার প্রাপ্যসহ বিদায় করে আমরা দুজন টেক্সিযোগে সিরাজ নগরীর প্রবেশদ্বারে বিখ্যাত কোরআন গেটে চলে যাই।

কোরআন গেট থেকে আমরা পার্শ্বস্থ পাহাড়ে উঠতে থাকি হযরত খাজু কেরমানী (রহ.)-এর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। পাহাড়ে উঠতে সহজ হয় মত ঐ সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। তবে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে নয়, উদ্দেশ্য মূলত বিনোদন। রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্ট, ছোট ছোট পার্ক রয়েছে। খোলা আকাশে বিখ্যাত অলী হযরত খাজু কেরমানীর কবর। তিনিও একজন বিখ্যাত কবি ও অলী ছিলেন। কেরমান থেকে তিনি হিজরত করে সিরাজ চলে এসেছিলেন। আমরা এ মহান অলীর যেয়ারত করি। আমরা পাহাড়ের এত উঁচুতে উঠি যে, সমস্ত সিরাজ নগরী দেখা যাচ্ছিল। এমনিতে কোরআন গেট পাহাড়ের উপর। বর্তমানে ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে প্রধান সড়ক কোরআন গেটের পার্শ্ব দিয়ে সিরাজ নগরীতের প্রবেশ করেছে। যেহেতু বর্তমান আধুনিক যুগ সেকালের বৃহদাকারের কোরআন গেটের ফটকও একালে অপ্রতুল।

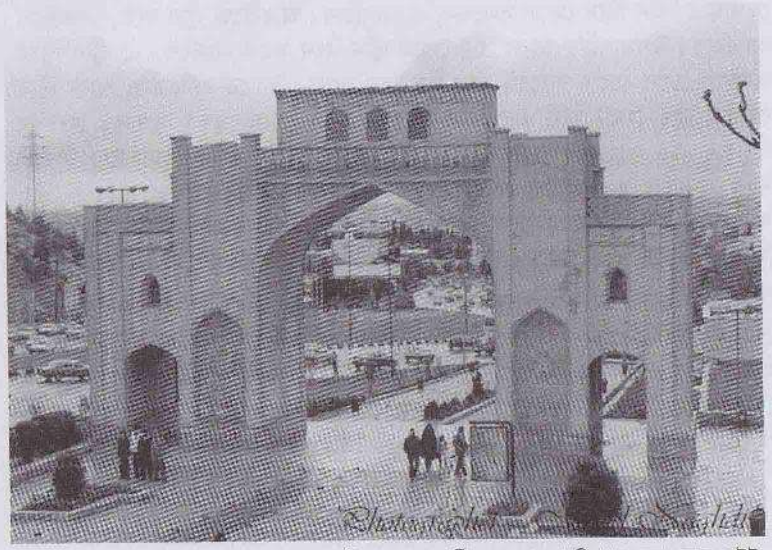

সিরাজ মহানগরীর প্রবেশমুখে বিখ্যাত কোরআন গেইট

সেখান থেকে রাত ১০টার দিকে আমরা টেক্সিযোগে হোটেলে ফিরে আসি। হোটেল এর রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল ৭টার পর হোটেল এর রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তা সেরে আমরা উভয়েই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। সিরাজ থেকে তেহরান আমাদের ফ্লাইট দুপুর ১২:৪০ মিনিটে। সকাল ১০টার দিকে একটি টেক্সি দর-দাম ঠিক করে সিরাজ বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। কিন্তু টেক্সিচালক শহরে ইরান এয়ার অফিসের সামনে আমাদের নামিয়ে দিতে চায়।

ইরানে এসে আমরা এ প্রথম দুষ্ট লোকের হাতে পড়লাম। লোকটি আমাদের বিদেশী দেখে মিটারে না নিয়ে দরদাম করছিল মনে হয় ঠকানোর উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে বিমান বন্দরে পৌঁছতে হল। ২ সপ্তাহ ইরানে অবস্থানকালে এই একজনই দুষ্ট লোক পেলাম।

১২:৪০ মিনিটে ফ্লাইট, তখন মাত্র ১১টা। আমি কৌতুহলী লোক; এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকি। মধ্যখানে খোলা, চতুষ্পার্শে দোতলা রয়েছে, টার্মিনাল ভবনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যাই। এক দোকানে গ্লাসের প্যাকেট করা শুকনো ফল দেখে চিনতে পারলাম না। পরিচয় জানতে চাইলে বলল আনজীর, ফল চিনতে না পারলেও নামটা কিছুটা পরিচিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু পুরোপুরি স্মরণে আনতে

পারছিলাম না। তারপরও এক প্যাকেট কিনে নিলাম। ঐ প্যাকেট তৌহিদী সাহেব দেখামাত্র তিনি চিনে ফেলে বললেন, এ আনজির। আরবীতে ত্বীন বলে, ফারসীতে আনজির। উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র থেকে ত্বীন এনে থাকে এদেশে। ঐ ত্বীন পাকা অবস্থায় চেপে চেপে প্যাকেট করা হয় মনে হলো। ইরানে ব্যতিক্রম; পাকা ত্বীন শুকালে মুখ ফেটে যায় এবং কিছুটা শক্ত হয়। খেতে খুবই সুস্বাদু। সেম্পল হিসেবে এক প্যাকেট কিনলাম, তেহরান থেকে পরে কিনব এ আশায়। সিরাজ নাকি আনজির তথা ত্বীনের জন্য বিখ্যাত। বিমানবন্দরে ঘুরাফেরার সময় কাটিয়ে যথাসময়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ৯০০ কি.মি.-এর যাত্রার বিমানে আরোহণ করি। এটি ইরান এয়ারের এয়ার বাস। প্রায় দুইশ'জনের উপরে যাত্রী হবে।

বিমানের ভিতর ইরান এয়ারের দেয়া প্যাকেট খুলে মজাদার সব খাবার খেতে খেতে বাহিরের প্রাচীন পারস্যের ভূমি প্রকৃতি দেখছিলাম। যথাসময়ে উড়োজাহাজ অবতরণের জন্য তেহরান বিমানবন্দরে দুই-তিনবার চক্কর দেওয়ায় আকাশ থেকে তেহরান মহানগরী দেখারও সুযোগ হয়ে গেল। অতপর মেহেরাবাদ বিমানবন্দর অবতরণ করে টেক্সিযোগে হোটেলে ফিরে আসি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা

ইবনে সিনা ১০৩৭ সালের ২১ জুন হিজরি ৪২৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আলী হোসেন ইবনে সিনা। তিনি ৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে উজবেকিস্তানের আফসানা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ এবং মাতা সিতারা উভয়ই ইরানী ছিলেন। ফলে তাঁর মাতৃভাষা খাস ইরানী এবং আধুনিক ফারসী ভাষায় তিনি জ্ঞানের অধিকারীসহ বহু কবিতাও রচনা করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি বিশ্বের কাছে বহুল আলোচিত ও পরিচিত ব্যক্তি। আমাদের দেশে সর্বসাধারণের কাছে তাঁর পরিচিতি লোপ পেয়ে থাকলেও ৭/৮ বছর আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাংলা ডামিং করা ম্যাগা সিরিয়াল 'ইবনে সিনা' ধারাবাহিকভাবে প্রচার করায় তিনি যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা সকলের কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। তাঁর অসাধারণ চিকিৎসা জ্ঞানের ফলে ইরানী, তুর্কী, আফগানী তথা ঐ অঞ্চলের দেশগুলোর জনগণ তাঁকে আপন আপন জাতীয় হিসেবে দাবী করে থাকে।

ইবনে সিনার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন বুখারার শাসনকর্তা। তিনি পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইবনে সিনার স্মৃতিশক্তি ছিল যেমন অসাধারণ, তেমনি তাঁর বুদ্ধিও ছিল অসামান্য। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি কুরআন শিক্ষালাভ করেন। আরবী ভাষায়ও পাণ্ডিত্যলাভে সক্ষম হন। অল্প বয়সেই তিনি সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠেন। আরবীতে 'হাকিম' শব্দ জ্ঞানী, দার্শনিককে বুঝায়। ইবনে সিনা কৈশোরেই 'হাকিম' উপাধিতে ভূষিত হন। ষোল বছর বয়সেই ইবনে সিনার নিকট খ্যাতিমান চিকিৎসাবিদগণ চিকিৎসা শাস্ত্র ও তাঁর অভিনব চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষালাভ করতে আসতেন। ষোল বছর বয়সেই তিঁনি বুখারার সুলতান নূহ ইবনে মনসুরের এক কঠিন রোগ নিরাময় করেন। সুলতান তাঁকে তাঁর বিখ্যাত বিশাল লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতি দেন।

অসামান্য জ্ঞানবলে ইবনে সিনা নিজেই বিশাল লাইব্রেরীর দুর্লভ গ্রন্থগুলি একাগ্র মনে অধ্যয়ন করেন। মাত্র একুশ বছর বয়সেই তিনি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত রচনায় হাত দেন। তাঁর জীবনপ্রবাহে তিনি একের পর এক সুলতানের অধীনে উজীর (মন্ত্রী) হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর ভাগ্যে কখনও খ্যাতি-যশ-সম্পদ অজস্র জুটেছে। আবার কখনও কারাবাস বা দেশত্যাগের আদেশও তাঁকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে

ইবনে সিনার মাজার কমপ্লেক্স

হয়েছে। সুলতান মাহমুদ গজনভীর অনুগ্রহ অস্বীকার করায় তাঁকে বুখারা থেকে গুর্গান, হামাদান এবং শেষে ইস্পাহানে পলায়ন করতে হয়েছিল। আবার বুয়াইদ সুলতান শামসউদ্দৌল্লা ও পরে শাহানশাহ্ আসাফউদ্দৌল্লার মন্ত্রীত্বও তিনি করেছিলেন। সূক্ষ্ম দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক তথ্যজ্ঞানে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ ছিল। তাঁর জীবনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলে হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ার মত শান্ত-ধীর চিকিৎসা প্রণালী গ্রহণ না করে উগ্র ও দ্রুত চিকিৎসা অবলম্বন করেন। কিন্তু মৃত্যুরোগ এ জগতে কাকেও ছাড়েনি। তেমনি ইবনে সিনাকেও না। তিনি রাত জেগে নিজের বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থরাজি রচনা করতেন। 'আল-কিফতিবু', ও 'তারিখুল-হুকামা' নামক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের জীবনী গ্রন্থসহ ইবনে সিনার একুশখানি সুবৃহৎ ও চব্বিশখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি আরও গ্রন্থের সংখ্যাসহ ৯৯ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ, ইলমুল-কালাম তথা ভাষাতত্ত্ব, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তৎমধ্যে আঠার খণ্ডে সম্পাদিত 'কিতাব-আল-শিফা' বা রোগ নিরাময়তত্ত্ব গ্রন্থ এবং 'কানুন-ফিত্-তিব্ব' নামক সুবৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। 'কানুন' যেমন তাঁকে অসামান্য চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেরকম "শিফা" তাঁকে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই গ্রন্থ দু'টি ইবনে সিনার অসাধারণ কীর্তি হিসেবে তাঁকে অমর করে রেখেছে। জালিনুস, আল-রাজি, আল-মাজুসীর শিক্ষার পরিবর্তে একমাত্র 'কানুন'ই ইউরোপের প্রত্যেক মিলনায়তনে চিকিৎসা বিষয়ের টেক্সট বুক হিসাবে গৃহীত ও পঠিত হয়ে থাকে। বারো থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত ইবনে সিনা ছিলেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর 'কানুন' ছিলো প্রধানতম পাঠ্যপুস্তক। ডক্টর ওলসলারের ভাষায় 'কানুন' অন্য যে কোন পুস্তকের চেয়ে বেশিদিন চিকিৎসা জগতের গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ছিল। আজও ইরানের হামেদানে তাঁরই সমাধিস্থানে দেশ-বিদেশের হাকিমগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হাজির হয়ে থাকেন।

হামেদানে ইবনে সিনার যেয়ারত

ইরানের রাজধানী তেহরানের ৩৩৭ কি. মি. পশ্চিম-দক্ষিণে প্রাদেশিক রাজধানী হামেদান। ঐ শহরে শায়িত আছেন বিশ্বের ইতিহাসে চিকিৎসা জগতের গর্ব ইবনে সিনা। আরও শায়িত আছেন বিখ্যাত সূফী ও কবি-বাবা তাহের এবং দুজন প্রখ্যাত ইমামজাদা।

পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত এই হামেদান। তবে হামেদানও পারস্যের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে একটি বলা হয়ে থাকে। হামেদান পারস্যের মনোরম এবং বাগানের শহর হিসেবে আগে থেকে জানা ছিল।

মাত্র ২ সপ্তাহের বহু প্রোগ্রামের ভিতর একদিন হামেদানের জন্য বরাদ্দ রাখি। সফরসাথী সাখাওয়াত সাহেব বাস্তামের মত সড়কপথে এতদূরে যেতে আগ্রহী নন। তারপরও আমি একা যেতে আগ্রহী। সেমতে গত সোমবার বাস্তামে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর মাজার যেয়ারত শেষে ফিরবার পথে টেক্সিচালক আলী রেজা ইব্রাহিম জাদেকে বলে রাখি ১৮ সেপ্টেম্বর '০৫ হামেদান রওয়ানা হয়ে বিকেলে ফিরে আসব বলে। হোটেল রিসিপশনে টেক্সির কথা বলার সময় গত সোমবার বাস্তাম যাওয়া-আসায় টেক্সিচালক আলী রেজা ইব্রাহিম জাদে হলে ভাল হয় বললাম।

রাত্রে আমাকে হোটেল পক্ষ থেকে কনফার্ম করা হলো ভোর ৬টায় টেক্সি নিয়ে আলী রেজা ইব্রাহিম জাদে আসবে।

সেমতে সুবেহ্সাদেক হওয়ার পর ফজরের নামাজ পড়ে সাখাওয়াত সাহেবসহ রিসিপশনে চলে আসি। মুহূর্তে টেক্সি নিয়ে আলী রেজা হাজির। আলী রেজা-এর কাঁটায় কাঁটায় টাইম মেনে চলায় মনে হচ্ছিল ইরানীরা সময়ের ব্যাপারে সচেতন। ইরান এয়ারও তাদের সময়-সূচী মেনে চলেছে মনে হচ্ছিল।

সাখাওয়াত সাহেব থেকে বিদায় নিয়ে হোটেল গেট পার হয়ে টেক্সির পিছনের সীটে বসার সময় দেখলাম টেক্সির সামনের সীট থেকে এক যুবক বেরিয়ে আমাকে সালাম করে হ্যান্ডসেক করল। চালক বলল যুবক তার বন্ধু। সিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভার্সিটি বন্ধ বিধায় তেহরানে বাবা-মা'র কাছে বেড়াতে এসেছে। ভাল ইংরেজি জানে বিধায় সাথে নিয়েছে। আমার আপত্তি থাকলে না যেতে পারে।

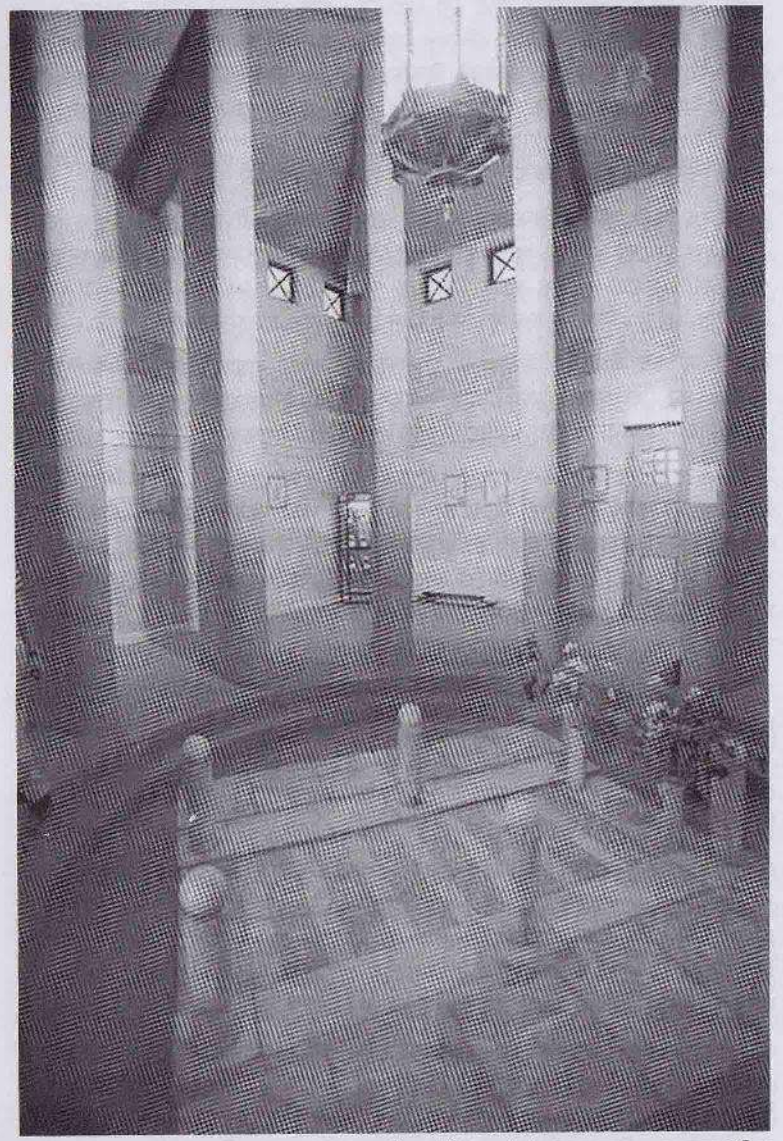

ইবনে সিনার মাজারের অভ্যন্তরে মূল কবর শরীফ

আমি কিছুটা ইতস্তত করে পরে হ্যাঁ বললাম। গত সোমবার বাস্তাম যাওয়াকালীন টেনশন ছিল। আজ তেমন টেনশন নেই। যেহেতু হামেদান একটি প্রদেশের রাজধানী শহর। শহরের ভিতরই ইবনে সিনা ও বাবা তাহেরের মাজার। আর যাওয়া-আসা মহাসড়ক বা বড় আকারের সড়ক হওয়া স্বাভাবিক, দূরত্ব বাস্তামের চেয়ে কিছুটা কম; ৩৩৭ কি. মি.। কিন্তু আমাদের দেশের হিসাবে অনেক বেশী বলতে পারি। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে চকরিয়া, রাঙ্গামাটি বলা যায়।

আমাদের নিয়ে চালক দ্রুততার সাথে তেহরান মহানগরী অতিক্রম করতে থাকে বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল পরিবেশে। ১৫/২০ মিনিটে তেহরান মহানগরী অতিক্রম করে হাইওয়েতে পৌঁছে যায়। আমরা যাচ্ছি সোজা পশ্চিম দিকে; বাস্তামের বিপরীত দিকে। কিন্তু এ মহাসড়কের ভিন্ন চিত্র দেখে হতচকিত হতে থাকি।

তিন তিন ছয় লাইনের উভয়মুখী মহাসড়ক। শাখা রাস্তায় ওভার ব্রীজ। উন্নত বিশ্বের মত বা মক্কা মোকররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারা বা লাহোর থেকে ইসলামাবাদ অথবা ইউরোপ-আমেরিকার প্রকৃতির মহাসড়ক।

ইরানের গাড়ী রাস্তার ডান পার্শ্বে চলাচল করে। আমরা ডান পাশ দিয়ে যাচ্ছি বিধায় ডান পার্শ্বের গাড়ীর সংখ্যা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পশ্চিম তথা বাম পার্শ্বে দেখি তেহরানমুখী বাস, টেক্সি, ট্রাক স্রোতের মত প্রবেশ করছিল। এ স্রোত কমছিল না। তেহরানের পূর্বদিকে প্রাদেশিক রাজধানী সেমনান, শাহরূদ অতপর মা'শাদ ইত্যাদি। পূর্বদিকের মহাসড়কের মনে হয় কয়েকগুণ বেশি গাড়ি পশ্চিমের শহরগুলো থেকে প্রবেশ করছিল তেহরানে।

পশ্চিমদিকে গমনকালেও একই দৃশ্য, অর্থাৎ মহাসড়কের উত্তরদিকে পাহাড় পর্বত। মহাসড়ক ও পাহাড়ের মাঝখানে ২/১ কি. মি. দূরত্বের এরিয়া ঘরবাড়ি, বাগান ইত্যাদি দক্ষিণে সমতলে নানান ক্ষেত ও বাগান। তবে দূরত্বে ঘরবাড়ি ঝাপসা চোখে পড়ছিল। সংযোগ সড়কে ওভারব্রীজ থাকায় চালক নিশ্চিন্তে ১৬০/১৮০ কি. মি. বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল।

টেক্সি আমাদের হোটেলের সম্মুখ থেকে রওনা হতেই চালকের বন্ধু আলাপ শুরু করে দেন। তার কথার উত্তর দিয়ে আমি হামেদান সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় মনে হয় বিনোদন বাদে ইতিহাসসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তার তেমন জ্ঞান নেই হামেদান ও ইরানের উপর। তবে ছেলেটিকে কথাবার্তায় বাচাল মনে হচ্ছিল বিধায় আমি তার সাথে কথা বলা কৌশলে এড়িয়ে চলতে থাকি।

প্রায় ১৫০ কি. মি. যাবার পর আমাদের টেক্সি মহাসড়ক থেকে বামে মোড় নেয় এবং চট্টগ্রাম-ঢাকার মত উভয়মুখী রাস্তায় যেতে থাকে। এতে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিতে হচ্ছিল। আমরা বামে তথা দক্ষিণ দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ি অঞ্চলে ঢুকে পড়ি। দেখি পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চলতে থাকে। তবে গাড়ির সংখ্যা কম থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি কম মনে

হচ্ছিল। সবুজবিহীন মরু পাহাড় ও বালিয়াড়ী এলাকা অতিক্রম করতে থাকি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট শহর চোখে পড়ছিল রাস্তার দু'ধারে। চালক আলী রেজাকে এরই মধ্যে ২/১ বার বললাম ভাল রেস্টুরেন্টে থামাতে। কিন্তু রেস্টুরেন্ট মনে হয় চালক আলী রেজার পছন্দ হচ্ছিল না বিধায় গাড়ী চলতে থাকে।

হামেদানের প্রায় ৮০ কি. মি. আগে থাকতে ডানে অর্থাৎ পশ্চিমে প্রায় ৭০/৮০ কি. মি. ডানে তথা পশ্চিমে ইরানের বিখ্যাত প্রাকৃতিক পর্যটক আকর্ষণীয় স্থান আলীছাদের পর্বত। ঐ পর্বত থেকে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা ও লেক রয়েছে। তবে দিনেদিনে হামেদান থেকে তেহরান ফিরব বিধায় ঐদিকে যাওয়ার জন্য মন সায় দিচ্ছিল না। আমরা প্রায় ১১টার দিকে হামেদানে পৌঁছে প্রথমে এক রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তা করি। অতপর হামেদান শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইবনে সীনার মাজারে চলে যাই।

মহান অলী ইবনে সিনাকে ইরানে আবিসিনা বলে থাকে। তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ, ইলমুল-কালাম তথা ভাষাতত্ত্ব, সংগীত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এককালে ইবনে সিনার গ্রন্থ পর্যালোচনা করে ইউরোপে চিকিৎসা চলত। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা জগতে ইউরোপীয়রা ইবনে সিনার চিকিৎসা গ্রন্থ সুকৌশলে নকল করে চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেছে বলে দুর্নাম এড়াতে পারেনি।

ইবনে সিনার কাছে মৃত্যুর রোগ বাদে সব রোগের চিকিৎসা হত। এ মহান চিকিৎসাবিদ ও অলী ১০৩৭ ইংরেজির ২১ জুন ইন্তেকাল করেন।

আমরা দুপুর ১২টার দিকে ইবনে সিনার মাজার প্রাঙ্গণে পৌঁছি। এখানেও টিকেটের ব্যবস্থা। প্রায় হাজার বছর আগে ইন্তেকাল হওয়ায় তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে মনে হয় পারস্য রাজারা চতুর্দিকে রাস্তা করে মাজার নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইবনে সিনার মাজারসহ গাড়ি পার্কিং, লাইব্রেরী, চিকিৎসা কেন্দ্র, রেস্টুরেন্ট, টয়লেটসহ কয়েকশ' মিটার এরিয়া নিয়ে গোল চক্কর। চক্করের শেষ প্রান্তে নানান ফুলের বাগান। মনে হচ্ছিল ৮ ভাঁজে গোলাকৃতির মাজারের মধ্যখানে ইবনে সিনার মাজার। দু'পার্শ্বে লাইব্রেরী ও তাঁর ব্যবহারের পোষাকাদিসহ নানান কিছু। সামনের চত্বরের এক পার্শ্বে ঔষধ বিক্রি চলছিল ব্যাপক হারে। তবে ইরানীদের আচরণ ইবনে সিনার মাজারে সিরাজের হযরত সাদী ও হাফেজ সিরাজী-এর মাজারের মত। জুতা পায়ে কবরের চারিদিকে ঘুরাঘুরি করছে। ঘুরাঘুরি করছিল নর-নারী মিলিতভাবে শ্রদ্ধাবোধের কোন লক্ষণ না রেখে। ইরানীরা তাদেরকে জ্ঞানী বলতে হয়তো রাজী কিন্তু আল্লাহর অলী মানতে মনে হয় রাজী নয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, ইরানীরা ইমামজাদা বাদে মনে হয় আর কাকেও সম্মান দেখাতে, দোয়া দরূদ পড়তে গ্রহণযোগ্য মনে করে না। ইবনে সীনার মাজার

কমপ্লেক্সের চারিদিকে প্রকাণ্ড রাস্তা। এক পার্শ্বে গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা।

হাতে সময় থাকায় দীর্ঘক্ষণ আমরা ঘুরাফেরার পর হামেদান শহরের অন্যত্র বাবা তাহেরের মাজারে চলে যাই। বাবা তাহের পারস্যের একজন বিখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মাজার কমপ্লেক্সও বিশাল এরিয়া নিয়ে। তবে কৃত্রিম পাহাড় মনে হচ্ছিল। মাজার উচ্চতায়। সেখানেও ইরানী নর-নারী মাজারের চারিদিকে জুতা পায়ে ঘুরাফেরা করতে প্রত্যক্ষ করি। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়ে নিকটে অন্য একজন মহান অলীর যেয়ারত করি। এ আল্লাহর অলীর নামটি এই মুহূর্তে স্মরণে আসছে না। অতপর ইমামজাদা হাদী ইবনে ইমাম জয়নাল আবেদীন, ইমামজাদা আবদুল্লাহ ইবনে ইমামজাদা আহমদ-এর পাশাপাশি মাজার। উভয় ইমামজাদার উর্ধ্বতন বংশলতিকায় রয়েছেন : ইবনে মোহাম্মদ, ইবনে ইব্রাহীম, ইবনে আলী ইয়েমেনী, ইবনে ইমাম মুসা কাজিম (রহ.)। যেয়ারত শেষ করে অন্যত্র ইমামজাদা ইয়াহিয়া-এর মাজারে যাই যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

অতপর হামেদানের বিখ্যাত পার্কে যাই। এ পার্কে নানান ফুলের সমাহার। বৃহদাকার কালো পাথরের খুদাই করে রাখা বাঘ রয়েছে দর্শক আকর্ষণ করার জন্য। হামেদান শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইমাম খোমেনী স্কোয়ারের নিকটে প্রাচীন বিখ্যাত বিশাল জামে মসজিদ। নানান কারুকার্য খচিত এই মসজিদ দেখে সত্যিই ভাবতে হবে সেকালে এরকম কারুকার্য খচিত বিশাল জামে মসজিদ কিভাবে নির্মিত হল। মসজিদ সংস্কারের কাজ চলছিল। মসজিদটি বড় রাস্তা থেকে নিচের দিকে। কালের আবর্তে রাস্তা, বাড়িঘর পুনঃনির্মিত হতে হতে উপরের দিকে উঠতে থাকায় মনে হয় মসজিদ নিচের দিকে চলে যাচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, হামেদানসহ ইরানের কোথাও যে কোন মাজারে এমনকি রাস্তাঘাটে কদাচিৎ বাদে ভিক্ষুক চোখে পড়বে না।

হামেদানে ২/৩ তলা থেকে ৫/৭ তলা পর্যন্ত দালান অহরহ চোখে পড়ছিল। চোখে পড়ছিল গোল চক্করসহ রাস্তার আশেপাশের বাগান। এতে শহরের সৌন্দর্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে হামেদান শহর ইস্পাহানের মতো তো নয়ই, সিরাজ শহরের মতও বিশাল নয়। সেমনান প্রাদেশিক শহরের সাথে তুলনা চলে।

হামেদান শহরে ৪/৫ ঘন্টা কাটিয়ে তেহরানের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পথে বিকেলের দিকে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই আমরা তিনজনে। ফিরবার পথেও বাস্তাম যাওয়া-আসার মত রাস্তার পাশে নানান ফল-ফলাদি বিক্রি করতে দেখি। তবে এদিকে আঙ্গুরের আধিক্যটা বেশী মনে হচ্ছিল। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ প্রায় বিকেল ৭টার দিকে আমরা হোটেলে পৌঁছি। হোটেল রিসিপশনে হিসাব করে বললে ৮০ ডলার প্রদান করি চালক আলী রেজা ইব্রাহীম জাদেকে।

তেহরানের আল-বুরুজ পর্বতে রাতের খাবার

ইরানের রাজধানী তেহরান মহানগরী বিশ্বখ্যাত আল-বুরুজ পর্বতের পাদদেশে। তবে বর্তমানে মহানগরী দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে আল-বুরুজ পর্বতের গায়ে গায়ে উঠে গেছে মনে হয় কয়েক কিলোমিটার যার দৈর্ঘ্য বহু কিলোমিটার হবে।

একালে শহর পর্বতের দিকে সম্প্রসারিত হওয়ায় তথায় অভিজাত আবাসিক এলাকা, বিভিন্ন দূতাবাস, বিভিন্ন মানের হোটেল, বড় বড় সুপার মার্কেট, নানান পার্ক রয়েছে। রয়েছে বিনোদনের নানান আয়োজন।

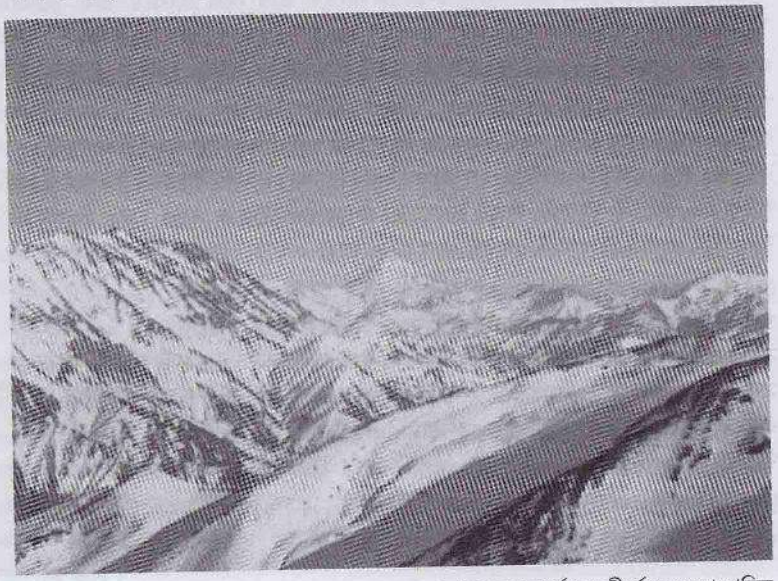

আল-বুরুজ পর্বতের শীর্ষে বরফ আচ্ছাদিত

শহর পেরিয়ে আরো উপরের দিকে উঠে গেছে বহু রাস্তা। এমনকি রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে পর্বতের শীর্ষস্থানে চলে যাওয়া যায়। তেহরান মহানগরীতে ৪/৫ লেইনের পাতাল রেল রয়েছে। লেইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। তবে সমতল বাদে আল-বুরুজ পর্বতের ঢালু শহর অংশে পাতাল রেল থাকার কথা নয়।

সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবের ঘনিষ্ঠ ইরানী বন্ধু গুলকার বারেবারে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন একবেলা খাওয়ানোর জন্য।

১৮ সেপ্টেম্বর '০৫ রবিবার রাত্রে গুলকার সাহেবের রাতের দাওয়াত গ্রহণ করলাম। দু'সপ্তাহ ইরানে থেকে আমার কেনাকাটার আগ্রহ ইরানের বিভিন্ন বাদাম ও শুকনো ফল।

সাখাওয়াত সাহেব গুলকার সাহেবকে আগেই টেলিফোনে বলে রেখেছিলেন আমার বাদাম ও শুকনো ফল কেনার প্রয়োজন বলে।

সন্ধ্যার পর গুলকার সাহেব আমাদের হোটেল কক্ষে হাজির। সাথে দু'জনের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন বাদাম ভরা রং-বেরংয়ের প্যাকেট।

হোটেল কক্ষে গুলকার সাহেব বললেন আল-বুরুজ পর্বতে বৈচিত্র্যময় কিছু রেস্টুরেন্ট রয়েছে, সেখানে আমাদের খাওয়াবেন। যাওয়ার পথে বাদাম ও শুকনো ফল কিনে নেবেন বললেন।

কথামতে আমরা দু'জনকে নিয়ে গুলকার সাহেব তাঁর কার চালিয়ে আল-বুরুজ পর্বতের দিকে যাচ্ছিলেন।

গতকাল তৌহিদী সাহেবও আল-বুরুজ পর্বতে আমাদের এনে কেবল কারে করে পর্বতশীর্ষে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিকেল হয়ে যাওয়ায় আমরা পৌঁছার আগ মুহূর্তে ক্যাবল কার বন্ধ হয়ে যায়। পর্বতের বহু উপরে গাড়িযোগে ক্যাবল কার স্টেশনে পৌঁছে তা হতে ক্যাবল কারে পর্বতশীর্ষে পৌঁছতে সময় লাগে ৩০ মিনিট। ক্যাবল কারে যেতে না পেরে সেখানে চা-নাস্তা খেয়ে তৌহিদী সাহেবের বাসায় চলে যাই রাতের খাবার খেতে।

তৌহিদী সাহেব তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় ১০/১৫ টি লম্বা তীন গাছ থেকে ৮/১০টি পাকা তীন পেরে আমাদেরকে খেতে দেন। সুমিষ্ট তীন মুখে দিতেই গলে যায়; নরম তুলতুলে। পাকা হলে হলদে সবুজ মিশ্রিত রং হয়। তীন গাছ জৈতুন গাছের মত ডাল ও পাতার আধিক্য নেই; কম ডাল ও পাতা। তৌহিদী সাহেবের স্ত্রী রাতের খাবারের পর উক্ত গাছের তীন দিয়ে মোরব্বা তৈরী করে আমাদেরকে খাওয়ালেন।

উপসাগরীয় দেশে জৈতুন দেখার ও খাওয়ার সুযোগ হলেও পাকা তীন দেখা ও খাওয়ার কোন সময় সুযোগ হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ফিলিস্তিনে ২০ প্রকারের আঙ্গুর গাছের পাশাপাশি হাজার হাজার তীন ও জৈতুন গাছ রয়েছে। রয়েছে নানা ফলের গাছ। গুলকার সাহেব আমাদের নিয়ে আল-বুরুজ পর্বতে উঠতে থাকেন তাঁর গাড়ীতে করে। কিছুদূর উঠার পর কিছু দোকান, রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ছিল। ঐ এলাকায় বিশাল বিশাল পাশাপাশি কয়েকটি দোকান রয়েছে; বাদাম, শুকনো ফল ও নানান চকলেটের।

ইরানে পাওয়া যায় এমন সব বাদাম ও শুকনো ফল ঐসব দোকানে থরে থরে প্যাকেট করে সাজানো রয়েছে। আরো রয়েছে বিশাল ফ্লোরে নানান নামের, নানান দামের বড় বড় কার্টনে বাদাম ও শুকনো ফলফলাদি।

ইরানে আমার একমাত্র কেনাকাটা নানান বাদাম ও শুকনো ফল। কাজেই যত বেশি সম্ভব বিভিন্ন প্রকারের বাদাম ও কয়েক প্রকারের শুকনো ফল কিনলাম।

সাখাওয়াত সাহেবও তাঁর চাহিদা মত কিনলেন। অতপর আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে আল-বুরুজ পর্বতের উপরের দিকে উঠতে থাকি। উঠতে থাকি আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে।

তেহরানে হালকা গরম অনুভব করতে থাকি। মনে হয় তাপমাত্রা দিনে ৩৪/৩৫ ডিগ্রী হবে। রাতে ৩০/১১ ডিগ্রী থাকে। বাতাসের আর্দ্রতা না থাকায় গাড়ীর গ্লাস বন্ধ রাখতে তৎপর থাকেন সাখাওয়াত সাহেব। কিন্তু বাদাম ফল কেনাকাটার পরও উপরের দিকে আরও ২০/২৫ মিনিট উঠার পর গুলকার সাহেব তাঁর গাড়ীর আয়নাসমূহ খুলে দেন। এতে আমরা হালকা ঠাণ্ডা অনুভব করতে থাকি। ঐ আরামদায়ক হালকা শীতল বাতাস আমাদের দেহমন সতেজ করে দেয়।

গুলকার সাহেব আরও কিছুটা উচ্চতায় যাওয়ায় রাস্তার সমাপ্তি। সেখানে মনে হয় শতের কাছাকাছি কার পার্ক করা আছে। আমাদের মত অনেকে আসছে গাড়ী নিয়ে। সমস্যা দেখা দিল কার পার্ক করা নিয়ে। গুলকার সাহেব ১০/১৫ মিনিট চেষ্টার পর কার পার্ক করতে সক্ষম হন। গাড়ী থেকে বের হয়ে আমরা পর্বত এলাকায় ঢুকে পড়ি। পায়ে হাঁটার রাস্তা, সিঁড়ি রয়েছে তারও উপরের দিকে উঠবার জন্য।

ঐ রাস্তায় সিঁড়ির কিছুটা দূরত্বে রেস্টুরেন্ট রয়েছে খোলা জায়গায়। আমরা পর্বত এলাকায় পৌঁছে উপরের দিকে উঠাকালীন হালকা বৈদ্যুতিক লাইটের আলোতে বিভিন্ন বয়সের শত শত নর-নারীকে যাওয়া-আসা করতে দেখি।

আমরা ১৫/২০ মিনিট হেঁটে হেঁটে উপরের দিকে উঠাকালীন আমি ও গুলকার সাহেব আরও উপরে উঠতে আগ্রহী হলেও সাখাওয়াত সাহেব এ ১৫/২০ মিনিটে কাহিল হয়ে পড়েন। ফলে এক রেস্টুরেন্টে আমরা রাতের খাবার খেতে খোলা আকাশে বসে পড়ি। তখন আমাদের দেশের নভেম্বর মাসের মত হালকা শীত অনুভব করি।

ঐসব এলাকায় রয়েছে বেলুচিস্তান রেস্টুরেন্ট, তুর্কিম্যান রেস্টুরেন্ট, কুর্দিস্তান রেস্টুরেন্ট, আজারবাইজান রেস্টুরেন্ট, উজবেকিস্তান রেস্টুরেন্ট, ইরানী রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। যে যার ইচ্ছা মত ঐসব দেশের খাবার খেতে পারে দেশের নাম দেখে।

মূলতঃ রান্না কেন্দ্র ভিতরে। কিন্তু গেস্ট সবাই বসবে খোলা আকাশে চেয়ারে বা গদিতে বা খাটে।

গুলকার সাহেব আমাদের নিয়ে আজারবাইজানের রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলেন। বয়দের পোষাক ঐ দেশের।

কয়েক প্রকারের খাবারের অর্ডার দিলেন গুলকার সাহেব। তৎমধ্যে মুরগী টিক্কা সাদা থেকে যাওয়ায় আমি পুনঃ ছেঁকে লাল করে দিতে বলায় পুনঃ রান্নাঘরে গিয়ে কয়েক মিনিটে তা করে নিয়ে আসে। ইরানে খাবারে নানান প্রকারের সালাদ ও লবণসিদ্ধ সবজি থাকে বেশি বেশি করে।

পর্বতের ঐসব রেস্টুরেন্ট বিকেলে চালু হয়ে রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। রেস্টুরেন্ট বাদেও পার্কে বসবার জন্য কর্তৃপক্ষ নানান প্রকারের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল-বুরুজ পর্বতে এরকম একাধিক স্পট রয়েছে পার্ক ও রেস্টুরেন্ট-এর।

আমরা রাত গভীর না করে প্রায় ১১টার পর হেঁটে হেঁটে নিচে নামতে থাকি এবং কার পার্কিং এলাকায় এসে দেখি তখনও কারের তেমন কমতি হয়নি।

গুলকার সাহেব আমাদের নিয়ে নিচে নামতে নামতে সমতলে এলে সাখাওয়াত সাহেব দ্রুত আয়না বন্ধ করতে বলেন, বাতাসে আর্দ্রতা না থাকায় সহ্য করতে না পারার কারণে।

সমতলে চালিয়ে গুলকার সাহেব আমাদের কেনাকাটাসহ হোটেল গেইটে নামিয়ে দেন। হোটেলে প্রবেশ করে রিসিপশনে বললাম একটি কার্টন দেওয়া যাবে কি না দেশে বাদাম ও শুকনো ফল নিয়ে যাওয়ার জন্য। রিসেপশনিস্ট আনন্দচিত্তে বয়দের নির্দেশ দিলেন একটি কার্টন যোগাড় করে দেয়ার জন্য। ফলে যে কার্টনটি বয় পাঠাল সেটি খুব সুন্দর এবং চাহিদা মত কিন্তু কার্টনটি হালকা পাতলা। তাদের আর অন্য রকম মজবুত কার্টন নেই। কাজেই অনন্যোপায় হয়ে ঐ কার্টনে কেনাকাটা করা সমস্ত বাদাম ও শুকনো ফল রাখায় কার্টন চাহিদা মত হয়। সাখাওয়াত সাহেব তুরস্কে যাবেন। তাঁর কেনাকাটা, বাদাম, শুকনো ফল কম বিধায় ব্যাগে ঢুকিয়ে নেন।

গীলানে যেয়ারত

পীরানেপীর বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর দেশ গীলান। জন্মভূমি গীলান বিধায় তাঁর নামের পিছনে গীলানী। কিন্তু আমাদের দেশে শব্দ উচ্চারণের তারতম্য হেতু জিলানী বলা হয়। এ মহান অলীর মাজার রয়েছে বাগদাদ নগরীতে। কিন্তু তাঁর মহান পিতা ও মাতার মাজার ইরানের এ গীলানে।

ইরানের রাজধানী তেহরানের উত্তর-পশ্চিমে আল-বুরুজ পর্বতের অপর প্রান্তে এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরে গীলান প্রদেশ। রাজধানী রাস্ট তেহরান থেকে ৩২৫ কি. মি. দূরত্বে।

আমাদের প্রোগ্রাম ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ভোরে ইরান এয়ারে তেহরান থেকে রাস্ট গমন এবং পরদিন সকালের ফ্লাইটে তেহরান ফিরে আসা। সে মতে ইরান এয়ারে টিকেট কাটা আছে।

রাস্টে রয়েছেন আমার সফরসাথী সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়ী বন্ধু মোহাম্মদ হাসান পারভানেহ। আমরা দুজন রাস্টে যাব বলায় তিনি উৎফুল্লচিত্তে বারেবারে ফোন করতে থাকেন আমাদের প্রোগ্রাম জানতে। প্রোগ্রাম ঠিক হবার পর সাখাওয়াত সাহেবকে বলি পারভানেহকে বলতে যাতে আমরা থাকার জন্য কাস্পিয়ান সাগরের তীরে একটি হোটেল বুক করে রাখেন। সাখাওয়াত সাহেবের সাথে টেলিফোন আলাপে হোটেল বুক করাসহ রাস্ট বিমান বন্দরে আমাদেরকে স্বাগত জানাবে বলে জানালেন।

গীলানে শায়িত আছেন পীরানেপীর বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর আব্বাজান, আম্মাজান, ইমামজাদা হযরত ইব্রাহিম ইবনে ইমাম মুসা কাজিম, ইমামজাদী বিবি হুররিয়াত।

১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ভোর ৬:৫৫টায় ইরান এয়ারে আমাদের ফ্লাইট তেহরান থেকে রাস্ট যাওয়া এবং ৫৫ মিনিটের যাত্রায় ৭:৫০মি. আমরা রাস্টে পৌঁছার কথা। পরদিন সকাল ৮টায় রাস্ট থেকে রওনা দিয়ে ৮:৫৫ মি. তেহরান পৌঁছাব।

সেমতে ভোররাতে শোয়া থেকে উঠে সুবেহ্‌সাদেক হওয়ার পর ফজরের নামাজ পড়ে বড় ব্যাগ ও কার্টন এবং সাখাওয়াত সাহেবের বড় ব্যাগসহ আমরা উভয়ে নিচে রিসিপশনে পৌঁছি। সেখানে আমাদের ব্যাগ, কার্টন জমা রাখি ইস্পাহান, সিরাজ যাওয়ার মত।

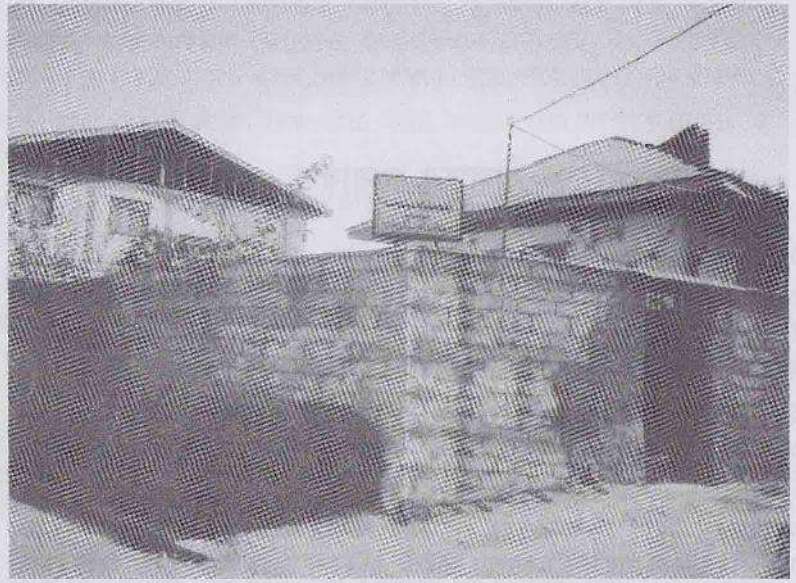

হযরত বড় পীরের মাতা হযরত উম্মুল খায়ের (র.)-এর মাজার শরীফ

হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ নিয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি টেক্সি নিই মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে যাব বলে। ইস্পাহান যাওয়ার এক ঘন্টা আগে হলো রাস্ট যাওয়ার ফ্লাইট। অর্থাৎ অনেকটা সূর্য উদিত হওয়ার সময় আমাদের ফ্লাইট।

টেক্সি দ্রুত আমাদেরকে নিয়ে মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে যেতে থাকে। কিন্তু চালক ভুলক্রমে হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আমাদের যে টার্মিনাল ভবনের সামনে নামিয়ে দিল তা হল মেহেরাবাদ আন্তর্জাতিক টার্মিনাল।

উভয় টার্মিনাল ভবন একই রকমের হওয়ায় ভোরের বৈদ্যুতিক আলোতে টেক্সি থেকে পার্থক্য বুঝতে পারিনি আমরা। কিন্তু কয়েক কদম সামনে যেতেই হতচকিত হই। যাত্রীসাধারণ কম মনে হচ্ছিল।

ভবনে বড় অক্ষরে ইংরেজিতে International Terminal লেখা চোখে পড়ছিল না। টার্মিনাল ভবনের একদম সামনে গিয়ে ইরান এয়ারের এক অফিসার থেকে জানতে চাওয়ায় বললেন, এটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল। আভ্যন্তরীণ আরো সামনে। আমরা দ্রুত ভবন চত্বর হতে রাস্তায় গিয়ে সামনে হাঁটতে থাকি। প্রায় একশত মিটার হেঁটেও আভ্যন্তরীণ টার্মিনাল চোখে না পড়ায় একটি টেক্সি নিই। চতুর টেক্সিচালক আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আমাদের আরো ২০০ মিটারের মত সামনে নিয়ে নামিয়ে দেয়।

আমরা আভ্যন্তরীণ টার্মিনাল ভবনের সামনে যেতেই ঐ ইস্পাহান যাওয়ার মত যাত্রীতে লোকারণ্য দেখতে পাই। আমরা দ্রুত রাস্ট-এর কাউন্টারে চলে যাই, দেখি Boarding Card দেয়া শেষ পর্যায়ে। কাউন্টারের সামনে যাত্রী নেই। ভাগ্য ভাল, মনে হল আমরা দুইজন শেষ যাত্রী। Boarding Card নিয়ে আমরা ফ্লাইটের দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাস্ট-এর গেটে গিয়ে নিরাপত্তা তল্লাশী শেষ করে অপর প্রান্তে দাঁড়ানো বাসে উঠে পড়ি।

বাস আমাদেরকে Aircraft-এর সিঁড়ির নিকটে নামিয়ে দেয়। দেখলাম এ Aircraft Fokker-100 যা শতাধিক আসনের উড়োজাহাজ। আমাদের আগে আসনগ্রহণ করায় অনেক যাত্রীর পিছনে গিয়ে আমরা পাশাপাশি আসন গ্রহণ করি।

হাওয়াই জাহাজ যথানিয়মে আকাশে উড়াল দিল। তখনও সূর্যের আলো রাতের অন্ধকারকে হার মানাতে পারেনি। বিমান আকাশে উড়ার পর খাবার প্যাকেট সরবরাহ করে। খাবার খাওয়াকালীন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হয়। জানালা দিয়ে দেখি বাইরে কালো মেঘে ভরপুর। আমি কিছুটা হতচকিত হয়ে ভীত হই।

গীলান প্রদেশ সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকায় মনে হচ্ছিল আল-বুরুজ পর্বত পার হতেই আমরা ভিন্ন আবহাওয়ায় পতিত হচ্ছিলাম।

কালো মেঘের ভিতর ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমাদের বহনকারী উড়োজাহাজ রাস্ট বিমান বন্দরে অবতরণ করে। ছোট নিস্প্রাণ রাস্ট বিমানবন্দর। ইরান এয়ারে সকাল-বিকেল ২টি ফ্লাইট রয়েছে তেহরান-রাস্ট।

আমরা হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ নিয়ে ইরানী যাত্রীদের সাথে হেঁটে হেঁটে টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করি। ভবনের অপর প্রান্তে যাওয়ামাত্র সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়ী বন্ধু মোহাম্মদ হাসান পারভানেহ আমাদের স্বাগত জানান। পারভানেহ-এর সাথে রয়েছে ইংরেজি জানা বন্ধু ইব্রাহিম ব্রাক। পারভানেহ ইংরেজি কম জানেন বিধায় সাথে দোভাষী হিসেবে তাঁর বন্ধু ইব্রাহিম ব্রাককে নিয়ে আসেন।

দেখলাম পারভানেহ-এর গাড়ীর জন্য ড্রাইভার রয়েছে। পারভানেহ সামনে বসলেন; আমরা তিনজন পিছনে। আমাদের ধারণা ছিল প্রথমে হোটেলে চলে যাব। ২/১ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে ৯/১০ টার দিকে বের হব। যেহেতু পারভানেহ আমাদের স্বাগত জানান। অতএব, তাঁর গাইডে থাকব বলে আমরা কিছু না বলে পারভানেহকে অনুসরণ করতে থাকি। বিমান থেকে নিচে নেমে, বিমানবন্দরে, বিমানবন্দর থেকে শহরে যাওয়ার সময় সবুজে ঘেরা সমারোহ প্রত্যক্ষ করছিলাম। রাস্তাঘাট দেখে মনে হচ্ছিল ভোরে বা গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বহনকারী কারের আয়নাগুলো খোলা। বাতাস শরীরের সহায়ক মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্রফুল্ল।

আগে থেকে ধারণা বাস্তবে রূপ পেতে শুরু করল। পারভানেহকে গীলানে ইমামজাদা যেয়ারতের পাশাপাশি বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর পিতা-মাতার যেয়ারতে পুলান ও সূমে সারা যাব বললাম। কিন্তু বুঝলাম পারভানেহ ও তাঁর বন্ধুর কারও কোন ধারণা নেই পুলান ও সূমে সারা যেয়ারত নিয়ে। তবে সূমে সারা রাস্টের নিকটে বিধায় ছোট শহরটি চিনতে পারলেন তারা।

আগেই উল্লেখ করেছি, শিয়াদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি শ্রদ্ধা যেয়ারত-দোয়া-দরূদ পড়া, অকাতরে মাজার নির্মাণে টাকা ব্যয় করা সবকিছু মনে হয় ইমাম ও ইমামজাদাকে নিয়ে। অন্যান্য কারো প্রতি তাদের তেমন জ্ঞান, ধারণা, শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

হাসান পারভানেহ রাস্ট বিমান বন্দর থেকে আমাদেরকে শহরের একপ্রান্তে তাঁর ফ্যাক্টরীর উপরের চেম্বারে নিয়ে যান। আমাদেরকে মিল-ফ্যাক্টরী ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি তখন খুবই ক্লান্ত।

যেহেতু গতকাল সারাদিন ৩৩৭ কি.মি. দূরত্বে হামেদানে যাওয়া-আসা, গুলকার সাহেবের অতিথি হিসাবে আল-বুরুজ পর্বতে রাতের খাবার গ্রহণ করা, বাদাম, শুকনো ফল প্যাকেট করে বড় ব্যাগ গুছায়ে ঘুমাতে ঘুমাতে মধ্যরাত পার হয়ে যায়। শেষরাতে প্রোগ্রাম রাস্টে আসার জন্য।

শরীর একদম কাহিল, ঘন্টাখানেক হলেও বিশ্রাম চাচ্ছিল মন ও শরীর। কিন্তু সাখাওয়াত সাহেবসহ আমরা একমত যে, রাস্টে আমরা দুজন হাসান পারভানেহ সাহেবের অতিথি। অতএব তাঁকে নিরবে অনুসরণ করা আমাদের উচিত হবে।

পারভানেহ সাহেবের অফিসে আধঘন্টার মত ঘুরার পর আমাদের নিয়ে গেল রাস্ট শহরের প্রাণকেন্দ্রের এক বিলাসবহুল হোটেলে।

হোটেলে প্রবেশকালীন দুজনে আলাপ করি আমরা তো দুজনে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে হোটেল ঠিক করতে বলেছিলাম কিন্তু শহরের ভিতর হোটেল ঠিক করা হল কেন।

কার থেকে নেমে ব্যাগ নিতে গিয়ে বন্ধু দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, এখানে সকালের নাস্তা করব। থাকার হোটেলে পরে যাব।

হোটেলে প্রবেশ করে আমরা ওয়েটিং কক্ষে সোফায় বসলাম। পারভানেহ সাহেব রিসিপশনে আলাপ করে আমাদের নিয়ে হোটেল গেস্ট-এর ফ্রি ব্রেকফাস্ট রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন।

এর আগে সাখাওয়াত সাহেব বুঝাতে গিয়ে বললেন, বিমানে আমাদের সকালের নাস্তা করা হয়েছে। পুনঃ নাস্তা করার প্রয়োজন নেই। তারপরও নাস্তা করালেন। এমনিতে আমাদের ইরান এয়ারের বৃহদাকারের প্যাকেটের নানান সুস্বাদু খাবারে দুর পর্যন্ত না খেলে চলত।

সেল্‌ফ সার্ভিসের রেস্টুরেন্টে আমি শুধু ফলফলাদি খেতে সচেষ্ট হই। সাথে চা/কফি। তবে তেহরানের মত চা খেতে দুধ চেয়ে নিতে হল। বিলাসবহুল এ হোটেলে তাড়াহুড়া না করে পুনঃনাস্তা, টয়লেট সেরে কিছুটা ফ্রি হয়ে যাই। তন্দ্রার ভাবও কেটে যায়। হোটেলে ঘন্টখানেক সময় কাটিয়ে আমরা সূমে সারাহর দিকে রওয়ানা দিই।

গীলান প্রদেশের রাজধানী রাস্ট ইরানের বড় মাপের শহরগুলির মধ্যে গণ্য হবে বলে মনে হয় না। তবে শহরটি সমতল ও খোলামেলা প্রশস্ততায় দেখলাম। ফুলের বাগানের আধিক্য কম মনে হচ্ছিল শহরের অভ্যন্তরে। বিলাসবহুল দালান কম তেহরান, ইস্পাহান, সিরাজের মত।

রাজধানী শহর রাস্ট অতিক্রম করে আমরা সুমে সারাহ্ মাজারের দিকে যেতে থাকি। রাস্ট শহর থেকে মাত্র ২০/২৫ কি. মি. দূরত্বে সূমে সারাহ্ এরিয়া যা বর্তমানে ছোটখাট শহর বলা যাবে। কিন্তু শহরে পৌঁছেও আমাদেরকে অভিষ্ট বড়পীর পীরানেপীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মাতার মাজার খোঁজ করতে হচ্ছিল শিয়াগণের কাছে অপরিচিত হবার কারণে। গাড়ীর সামনে বসে হাসান পারভানেহ সাহেব বারবার খোঁজ করতে করতে আবাসিক এলাকার ভিতরে মাজার শরীফ বের করতে সক্ষম হন। হযরত সাইয়েদা উম্মুল খায়ের (রহ.)-এর মাজার একতলা বিশিষ্ট সেমি-পাকা মনে হচ্ছিল। লোক সমাগম নেই তেমন। একজন বৃদ্ধ মহিলা মাজারের যত্নের কাজে রয়েছেন দেখলাম।

ইমামজাদী আর আওলাদে রসূলের ব্যবধান থাকার কথা নয়। তারপরও শিয়াগণ ১২ ইমামের সাথে পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গকে ইমামজাদা, ইমামজাদী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের মাজারে লাখ লাখ বা কোটি কোটি টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করেন না।

কাজেই এ মহান অলীর মাজার সুমে সারাহতেও অপরিচিত। কৌতূহলী হন হাসান পারভানেহ ও তাঁর বন্ধু। অবশ্য তারা দু'জন – আমি ও সাখাওয়াত সাহেবের সাথে যেয়ারতে মগ্ন হন পরিচয় দেয়ার কারণে। এ মহান বুযুর্গ নারীর নানান কারামত ও গুণকীর্তন-এর কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে।

আমরা হযরত বড়পীর সাহেবের আম্মাজানের যেয়ারতে সময়ক্ষেপণ করে তথাকার বৃদ্ধা খাদেমা পূলানের তথ্য নিতে পারলনা। ফলে মাজার থেকে বের হয়ে হাসান পারভানেহকে বুঝাই যে, এখান থেকে প্রায় ৮০/৯০ কি. মি. দূরত্বে পূলান নামক পাহাড়ি এলাকায় হযরত বড়পীর সাহেবের আব্বাজানের (হযরত সাইয়েদ শেখ আবু ছালেহ জঙ্গী) (রহ.) মাজার রয়েছে। আমরা তাঁর যেয়ারতে যাব। ফলে হাসান পারভানেহ সাহেব বড় রাস্তায় গিয়ে বড় বড় দোকানে ও লোকজন থেকে খোঁজ-খবর নিতে থাকে। দুর্ভাগ্য, কেহ কোন তথ্য দিতে পারল না কতদূরে কোন্ রাস্তায় পূলান যাব ইত্যাদি নিয়ে। একজন কি দু'জন মাত্র পূলান নাম শুনেছে বলল

এবং বিপরীত কথা তথা রাস্তা ভাল নয় বলল। এতে সন্দেহ হল তথ্যদাতাদের অনাগ্রহ বিধায় না যেতে নিরুৎসাহিত করা। যেহেতু ইরানে গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত সুন্দর মসৃণ রাস্তা নির্মিত হয়ে গেছে। সেখানে পূলান গমনে খারাপ রাস্তা থাকার কথা নয়।

সারাদিন গীলানে আছি। হাতে প্রচুর সময় তবুও তথ্য-তালাশের সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়ে আমরা দুপুর ১২টার দিকে ইমামজাদা হযরত ইব্রাহিমের যেয়ারতে রওয়ানা হয়ে যাই।

সুমে সারাহ্ থেকে রাস্টের পথে বড় রাস্তা দিয়ে কিছুদূর আসার পরে ডানদিকে মোড় নেয়। রাস্টের পাশাপাশি সুমে সারাহ্তেও সবুজের সমারোহ, বড় রাস্তায় ও আশেপাশে বড় বড় গাছে ভরপুর।

আমরা বড় রাস্তা থেকে ডানে মোড় নিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকি। বড় রাস্তা থেকে শাখা রাস্তায় ঢুকতে ইমামজাদা ইব্রাহিম তীর চিহ্ন দেয়া আছে টিনের বোর্ডে।

বড় রাস্তা থেকে প্রায় ৮/১০ কি. মি. ভিতর রাস্তায় যাওয়ার পর পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করি এবং পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে উঠতে থাকি।

এখানে উল্লেখ্য, গীলান প্রদেশে শিয়াগণের প্রধান যেয়ারতগাহ হল এ ইমামজাদা ইব্রাহিম। তিনি শিয়াগণের ৭ম ইমাম হযরত মুসা কাজিম (রহ.)-এর পুত্র।

পর্যায়ক্রমে আমরা পাহাড় থেকে আল-বুরুজ পর্বতের উপরের দিকে উঠতে থাকি। রাস্তা নতুন মসৃণ মনে হচ্ছিল। একই রাস্তার উভয়দিকে যাওয়া-আসা চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের মত। মধ্যখানে রাস্তা পৃথকীকরণের আঁক দেয়া আছে। আমরা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হতে থাকি এবং পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে উঠতে থাকি। যতই অগ্রসর হচ্ছি ততই পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্য বা ভারতের গৌহাটি থেকে শিলং গমনের কথা বারেবারে মনে পড়ছিল। ঐ এলাকায় ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ইত্যাদি কাঠের এবং কয়েক তলাবিশিষ্টও রয়েছে। পাহাড়-পর্বতের দৃশ্য ও ঘরবাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল এ কোন ইরানের ভূমি বা অংশ নয়। তবে নর-নারী চোখে পড়লে মনে জাগে ইরান।

হতবাক হই গভীর পর্বতের রাস্তায় বিপরীত দিক থেকেও প্রচুর গাড়ি তথা কার আসতে থাকে দেখে।

এভাবে আমরা যেতে যেতে অভিষ্ট ইমামজাদার মাজারে পৌঁছি আল-বুরুজ পর্বতের গভীর অরণ্যে। ইমামজাদার মাজারকে কেন্দ্র করে ছোটখাট শহর মনে হচ্ছিল। বহু আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, সরকারী অফিসাদি, পুলিশ ফাঁড়ি ইত্যাদি রয়েছে। বহু কার পার্ক করা দেখে হতচকিত হই। যেয়ারতের সমাগমও রয়েছে।

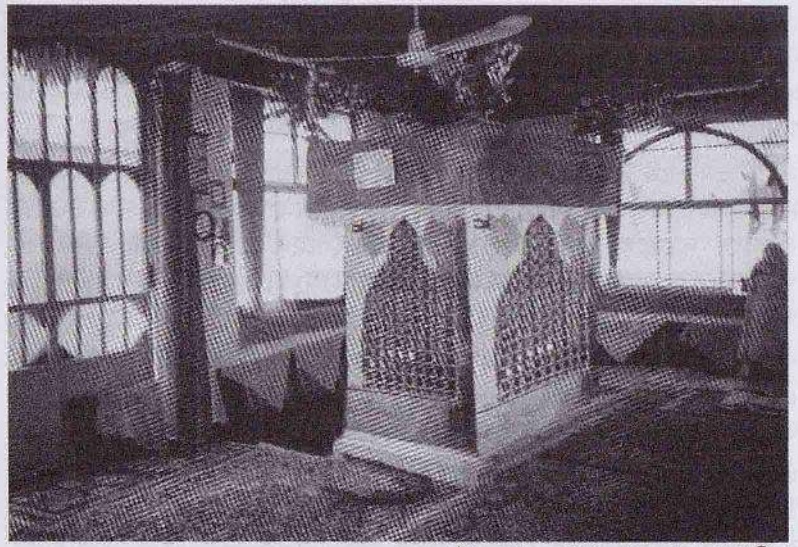

হযরত উম্মুল খায়ের (র.)-এর মূল মাজার শরীফ

পর্বতের গুহায় তাঁর মাজার বুঝতে পারি। চারিদিকে গভীর সবুজের সমারোহ এবং নানান রকম ছোট-বড় গাছে ভরপুর। তথায় আবহাওয়া মনোরম হালকা শীত অনুভব হচ্ছিল। তবে ভারতের শৈলশহর সিমলার মত দুপুরে শীত বা তাপমাত্রা তত কম নয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন – আল-বুরুজ পর্বতের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে তথা তেহরান মহানগরীর দিকে মরুভূমি সদৃশ পর্বত। কিন্তু পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে গীলান প্রদেশের দিকে সবুজের সমারোহ। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাতাসে আর্দ্রতায় ভরপুর মনে হচ্ছিল। অর্থাৎ পর্বতের দু'দিকে দু'রকমের আবহাওয়া ও পরিবেশ। রাস্ট প্রাদেশিক রাজধানী থেকে ইমামজাদা ইব্রাহিমের মাজারের দূরত্ব ৫৭ কি. মি. এবং বড় রাস্তা থেকে প্রায় ৪০/৪৫ কি. মি.।

আমরা ইমামজাদার যেয়ারতের পাশাপাশি মাজারে যোহরের নামাজ পড়ে নিই। তথাকার রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেতে প্রস্তাব করি হাসান পারভানেহ সাহেবকে। এতে তিনি বিব্রতবোধ করছিলেন। যেহেতু তিনি আমাদেরকে শহরে নিয়ে গিয়ে উন্নতমানের রেস্টুরেন্টে খাওয়াবেন। কিন্তু আমরা বারেবারে এখানে খেয়ে নিতে আগ্রহী হই। রেস্টুরেন্টগুলো মোটামুটি মানসম্পন্ন মনে হচ্ছিল এবং হাসান পারভানেহ সাহেবের নিজ থেকে সব খরচ করে যাচ্ছিলেন বিধায় মাজার এরিয়ায় খেলে তার অনেক টাকা সাশ্রয় হবে মনে করে ৪/৫ বার চাপের সাথে আগ্রহ দেখিয়ে আমরা খেতে বসে যাই।

তিনি রেস্টুরেন্ট মালিককে ফার্সিতে কি বললেন জানি না, মালিক-বয় সবাই আমাদের

সেবায় তৎপর হয়ে গেল। এখানেও খাবারের সাথে সালাদের আধিক্য। সাথে জৈতুন। দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা ৩টার দিকে রাস্টের দিকে চলে আসতে থাকি। যাওয়া-আসাকালীন অবাক লাগল দুর্গম পাহাড়, পর্বত পেরিয়ে এত সুন্দর মসৃণ দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করতে মনে হয় শত কোটি টাকা পার হয়ে যাবে।

আগে অন্যখানে উল্লেখ করা আছে, কারবালা ঘটনাপ্রবাহের পর থেকে মুসলিম বিশ্ব উমাইয়াদের প্রতি প্রতিবাদ, ক্ষোভ, ঘৃণা প্রকাশ পেতে থাকে। এতে উমাইয়া রাজবংশ দামেস্কে বসে মদিনা মুনাওয়ারাসহ হেজাজে নজরদারী, খবরদারী বাড়িয়ে দেয় আহলে বাইত আওলাদে রসুলগণের প্রতি। পরবর্তীতে আব্বাসীয় রাজা-বাদশাহরাও একই প্রথা অনুসরণ করতে থাকে।

ফলে হেজাজ থেকে আওলাদে রসূলগণ মিশর ও পারস্যে হিজরত করেন। তথায় পৌঁছেও তাঁরা শান্তিতে থাকতে পারেন নি। অনেককে আত্মগোপন করতে হয়েছে। অনেককে রাষ্ট্রীয় প্রভাব খাটিয়ে শহীদ করা হয়েছে।

আওলাদে রসূল (স.) ও শিয়াগণের ৭ম ইমাম হযরত মুসা কাজিম (রহ.)-এর পুত্র ইমামজাদা হযরত ইব্রাহিম (র.) মনে হয় আত্মগোপন করে নিরিবিলি এবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতে সেকালে দুর্গম পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে আল-বুরুজ পর্বতের গহীন গুহায় অবস্থান নেন। তথায় তিনি ইন্তেকাল করেন বলে ধারণা।

আমরা বিকেলে রাস্ট শহরে হাসান পারভানেহ সাহেবের অফিসে পৌঁছি। তথায় হালকা চা-নাস্তা খেতে খেতে সাখাওয়াত সাহেব ব্যবসায়িক আলাপ আলোচনা সেরে নেন।

অতপর বিকেল প্রায় পাঁচটার পর বন্দর আনজালী (Bandar-E-Anzali)-এর দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। মূলতঃ গীলানের প্রাদেশিক রাজধানী রাস্ট ও বন্দর আনজালী পৃথক পৃথক শহর। এককালে এক শহর থেকে অপর শহর ৪০/৫০ কি. মি. দূরত্বে ছিল।

কিন্তু উভয় শহর সম্প্রসারিত হয়ে অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে। বন্দর আনজালী ও রাস্ট সমতল ভূমি। তবে রাস্ট-এর নিকটতম স্থান থেকে আল-বুরুজ পর্বতের সূচনা বলা যাবে।

আমরা বিকেলে রাস্ট থেকে বন্দর আনজালীর দিকে যেতে বন্দরের নিকটে ইমামজাদী বিবি হুররিয়াহ-এর যেয়ারতে নামি। বড় রাস্তা সংলগ্ন তাঁর মাজার। মাজার সংলগ্ন একটি কবরস্থান রয়েছে।

২/৩শ' মিটার এরিয়া নিয়ে মাজার, কবরস্থান ইত্যাদি রয়েছে। তথায় যেয়ারতের পাশাপাশি আমরা আসরের নামাজও পড়ে নিই।

অতপর বন্দর আনজালী শহর ঘুরেফিরে দেখান হাসান পারভানেহ। বন্দর আনজালী বিশ্বের বৃহত্তর লেক সাগর-এর তীরে ইরানের প্রসিদ্ধ লেক বন্দর। বন্দর

আনজালীকে দূর থেকে মডার্ন আধুনিকতায় ভরপুর মনে হচ্ছিল।

তথায় লেকে বিনোদনের জন্য নানান স্থাপনাও চোখে পড়ছিল। ঐ এলাকায় মানসম্পন্ন হোটেল কক্ষ মেলা মনেহয় কষ্টসাধ্য। ঘুরাফেরা করে হাসান পারভানেহ সাহেব আমাদের নিয়ে বন্দর নগরী অতিক্রম করে নিকটে সাগরের তীরে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে বন্ধু দোভাষীর মাধ্যমে জানালেন, বন্দর আনজালীতে তথা সাগরের তীরে হোটেল পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপরও আমাদের জন্য একটি হোটেলে দু'জনার একটি কক্ষ বুকিং করে রেখেছেন বললেন।

কথা বলতে বলতে গাড়ি যখন বড় রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ মিটার ডানে সাগরের দিকে তথা হোটেলের দিকে যাচ্ছিল তখন মনে হল তিনি আমাদেরকে আমাদের অবস্থার চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করছেন।

যেহেতু দূর থেকে দেখে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল হোটেলটি পাঁচ তারকা না হলেও চার বা তিন তারকামানের হবেই। সামনের প্রকাণ্ড চত্বর রেখে লম্বালম্বি ৩ তলা হোটেল। সূর্যাস্তের প্রায় ঘন্টাখানেক আগে অর্থাৎ ৭টার কিছু আগে বা পরে আমরা হোটেলে পৌঁছি। হাসান পারভানেহ রিসিপশনে আলাপ ও স্বাক্ষর করে কক্ষে গিয়ে আমাদের ব্যাগ রেখে হোটেলের পিছন সংলগ্ন সাগর পাড়ে আমাদের সাথে সময় কাটাতে থাকেন।

তখন আমাদের বারবারের অনুরোধে তিনি বিদায় নেন ভোরে আসবেন বলে। এও বললেন, হোটেলের যাবতীয় লেনদেন করা ও বলা আছে। আমরা যাতে কোন টাকা পয়সা না দিই। ভোরে আসবেন কথা দিয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধু আমাদেরকে সাগর তীরে রেখে চলে গেলেন।

কাস্পিয়ান সাগরের তীরে এক রাত

বিশ্বের বিখ্যাত লবণ পানির লেক হল কাস্পিয়ান সাগর। লেক হলেও সাগরের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বিধায় সাগর নামকরণ। লবণ পানির সাগর; বিশ্বের বৃহত্তর লেক। আয়তন ৩৭১ হাজার বর্গকিলোমিটার যা বাংলাদেশ থেকে তিনগুণের কাছাকাছি বড়। ইতিহাসবিদগণের মতে, প্রায় ৩ কোটি বছর পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরের প্রতিষ্ঠা।

কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে রাশিয়ার ভল্গা নদী, ইউরাল পর্বত ও ইউরাল নদী, দক্ষিণে ইরান অংশে আল-বুরুজ পর্বত, পূর্বে ক্রামনোভস্ক, পশ্চিমে তুর্কিস্তানের সমভূমি ও পশ্চিমে অস্ট্রাখান, বাকু, ককেশাস পর্বত, আরারত পর্বত রয়েছে।

কাস্পিয়ান সাগরের তীর

ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভল্গা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৭৬৬ কি. মি। পশ্চিম রাশিয়ার ভল্গাই পর্বত থেকে ভল্গা নদী প্রবাহিত হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে। ইউরাল নদীও ইউরাল পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

এ সাগরের গভীরতা ৩ থেকে ৫ হাজার ফুট। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে যে সকল প্রসিদ্ধ শহর রয়েছে সেগুলো হল : Baku, Astara, Lenkeran, Sumqayit, Neet, Daslari, Xacmas, Astra Khan, Derbent, Bandara Anzali, Chalous, Turkme, Mbashi Atyran, Aktai, এসব শহরগুলোর মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে মালামাল পরিবহনের জাহাজ রয়েছে। এমনকি এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের জন্য যাত্রীবাহী জাহাজও আছে। আবহাওয়ার দিক বলতে গেলে শীতকালে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশ বরফে ঢেকে থাকে।

ছাত্রজীবন থেকে কাস্পিয়ান সাগরের কথা পড়ে ও জেনে আসছিলাম। আজ ইরানের গীলান প্রদেশে ভ্রমণের কারণে কাস্পিয়ান সাগরের তীরের হোটেলে রাত যাপনের সুযোগ হল।

১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে গীলানের রাজধানী রাস্ট শহরে পৌঁছে সারাদিন যেয়ারত ও ভ্রমণ করে সূর্যাস্তের আগে আগে বন্দর আনজালীর সংলগ্ন কাস্পিয়ান সাগরের তীরে Hotel Sefidkenar-এ পৌঁছি।

বুকিং করা আমাদের কক্ষে ব্যাগ রেখে হোটেলের পেছন সংলগ্ন সাগর তীরে চলে যাই। প্রায় ৩০০/৪০০ ফুট হোটেল সীমানায় সাগর পাড়ে হোটেল গেস্টগণের বসার ব্যবস্থাসহ নানান আয়োজন রয়েছে। হোটেলের মূল দালান থেকে পেছনে মাত্র ২০০/৩০০ ফুটের মধ্যে সাগর।

হাসান পারভানেহ ও তাঁর বন্ধুসহ আমরা চারজন সাগর পাড়ে বসে কথাবার্তা বলছিলাম ও ডানদিকে বন্দর আনজালীর কর্মকাণ্ড ও এ বন্দর থেকে সাগরের দিকে জাহাজ যাওয়া-আসা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। আরও প্রত্যক্ষ করতে থাকি হোটেল এরিয়ার দু'দিকে সাগরের বালিচরে অনেকের হাঁটাহাঁটি, অনেকের গোসল ও বিভিন্ন জলযানে করে সাগরে আনন্দ উপভোগ করতে।

সাখাওয়াত সাহেবের বন্ধু হাসান পারভানেহ ও তাঁর বন্ধুসহ আমাদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমাদের অনুরোধে তাঁরা ফিরে যান ভোরে আমাদেরকে হোটেল থেকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিতে পুনঃ আসবেন বলে।

আমরা দু'জন তথায় বসে বসে সাগরের মুক্ত বাতাস উপভোগ ও নানান দৃশ্য দেখতে থাকি।

এরই মধ্যে মাগরিবের টাইম হওয়ায় সাগর পাড়ের বসার লম্বা নানান আকৃতির আসনগুলোতে মাগরিবের নামাজ পড়ে নিই।

সূর্যাস্তের আগে সাগরে নামতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হোটেলের নিরাপত্তার জন্য সাগর-

তীরে বৃহদাকারের পাথর দেয়ায় নামতে ভয় পাচ্ছিলাম। তীর থেকে মাত্র ৮/১০ ফুট দূরত্বে পানি। মধ্যখানে বড় বড় পাথর রয়েছে হোটেলের নিরাপত্তার জন্য। একাধিকবার পাথরে পা রেখে সাগরে নামতে চাই। কিন্তু ভয় লাগে পাথরের ফাঁকে বিষাক্ত সাপ বা কোন কীট থাকে কি না।

সাগরপাড়ের লোক বিধায় হোটেল সীমানার বাইরে গিয়ে চর দিয়ে জুতা খুলে সাগরে নামতে আগ্রহী ছিলাম না। তেমনি সাখাওয়াত সাহেবও। আমরা সাগরপাড়ে হাঁটাহাঁটি ও নানান বসবার আসনে বসে সময় কাটাই এবং মাগরিবের পর থেকে সাগরের রাতের দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি।

সাগরের হালকা ঢেউ দেখছিলাম। আমাদের দেশে শীতকালের সাগরের ঢেউয়ের মত। হ্রদ বিধায় জোয়ারভাটা নেই। রাতে হোটেল রিসিপশনিস্ট-এর সাথে আলাপে জানলাম বহু আগে একবার সাগরে প্রচণ্ড বাতাস সৃষ্টি হয়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত হয়েছিল মাত্র। আর কোন প্রতিকূল আবহাওয়া বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।

আমাদের ডানপাশ থেকে তথা বন্দর আনজালী থেকে নানান আকৃতির বড় বড় জাহাজ সাগরের দিকে যাচ্ছিল। দূরে-কাছে মিলে ৫/৬টি জাহাজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল রাতের জাহাজের আলোতে। বৈদ্যুতিক আলোতে বন্দর আনজালী যেমনি ঝলমল করছিল তেমনি জাহাজের জেনারেটরের আলোতে বহু দূরে সব জাহাজ দেখা যাচ্ছিল। আমার কাছে দিনের দৃশ্যের চেয়ে রাতের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর মনে হয়েছিল।

আমরা রাতের খাবারের সময় পর্যন্ত সাগরপাড়ে কাটিয়ে দিয়ে এশার নামাজ পড়ে হোটেল রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে পুনরায় সাগরপাড়ে ফিরে আসি। রাত ১০টা পর্যন্ত মন জুড়ানো সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করতে থাকি।

মূল হোটেল দালান ও সাগরতীরের মাঝখানে বিনোদনের জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষ নানা স্থাপনার ব্যবস্থাপনা রেখেছেন। করেছেন নানান ফুলের বাগান যা হোটেল থেকে যেমনি অবলোকন করা যায় তেমনি সাগরতীর থেকেও।

শুধু পিছন দিকে নয়, হোটেলের চারিদিকে নানান ফুলের সমারোহ হোটেলের গাম্ভীর্য আকর্ষণ বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্লান্ত বিধায় গভীর রাত না করে ঘুমাতে যাই। আগামীপরশু বুধবার ২১ সেপ্টেম্বর ২ দিনের জন্য তেহরান হতে দুবাই যাব। সাখাওয়াত সাহেব যাবেন ইস্তাম্বুল।

কাজেই দুবাইতে অনেকের মাঝে শুধু দেশীয় এলাকার স্নেহের জকরিয়াকে ফোনে জানিয়ে দিই আমিরাত এয়ারের ফ্লাইটে দুপুরে তেহরান থেকে দুবাই নামব বলে। অতপর ঘুমিয়ে পড়ি।

সকাল ৮টায় ফ্লাইট। কাজেই ভোরে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে ব্যাগ নিয়ে উভয়ে

রিসিপশনে চলে আসি। তথায় বৈঠকখানায় ৫/৭ মিনিট বসতে না বসতেই হাসান পারভানেহ ও তাঁর বন্ধু কারযোগে চলে আসেন আমাদেরকে বিমান বন্দরে পৌঁছিয়ে দিতে। রিসিপশনে হাসান পারভানেহ অবশিষ্ট বিল পেমেন্ট করাকালীন সাখাওয়াত সাহেব আবারও বললেন তিনি দেবেন। কিন্তু হল না। যেহেতু পারভানেহ রিসিপশনে বলে রেখেছেন যাবতীয় পেমেন্ট তিনিই দেবেন।

আমরা বিলম্ব না করে পারভানেহ সাহেবের গাড়ি করে অতি ভোরে বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই বন্দর আনজালী শহর থেকে রাস্ট শহরের দিকে।

প্রায় ৪০/৫০ কি. মি. দূরত্বে বিমানবন্দর। ভোরে রাস্তা ফাঁকা ছিল বিধায় দ্রুততার সাথে সকাল ৭টার পর আমরা ছোট কলেবরে রাস্ট বিমান বন্দরে পৌঁছে Boarding Card নিয়ে নিই। উদারপ্রাণ হাসান পারভানেহ ও তাঁর বন্ধু থেকে বিদায় নেয়াকালীন দেখলাম গাড়ির ভিতর থেকে উপহার সামগ্রী দিচ্ছেন আমাদের জন্য। আমরা তা নিয়ে নিরাপত্তা তল্লাশী শেষ করে বিমান বন্দরের অপর প্রান্তে গিয়ে অন্যান্য যাত্রীর সাথে বসে পড়ি। এর মধ্যে তেহরান থেকে যাত্রী নিয়ে এসেছে Fokkar-100 ঠিক গতকালের একই উড়োজাহাজ।

রাস্টের যাত্রীরা নেমে আসার পর যথাসময়ে আমরা উড়োজাহাজে আরোহণ করি। বিমান আকাশে উড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনী শুরু হয় গতকালের মত।

কাস্পিয়ান সাগর

প্রচণ্ড ঝাঁকুনীতে কিছুটা ভীত হই। বিমানবালারা খাওয়ার প্যাকেট সরবরাহ করলেও ভীতির কারণে খেতে রুচি হলো না। প্রায় ১৫/২০ মিনিট ঝাঁকুনিকালীন বাইরে কালো মেঘে অন্ধকার মনে হচ্ছিল। আল-বুরুজ পর্বত পার হওয়ামাত্র জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে গেল। আকাশ মেঘমুক্ত। ৫/৭ মিনিটের মধ্যে প্যাকেট খুলে খাবার খেয়ে নিই এবং যথাসময়ে তেহরানের আকাশে চক্কর দিয়ে আমাদের উড়োজাহাজ নামতে শুরু করে।

আগে উল্লেখ করেছি, আল-বুরুজ পর্বতের তেহরানের দিকে মরুভূমি সদৃশ মেঘমুক্ত আকাশ এবং পর্বতের গীলান প্রদেশের দিকে গাঢ় মেঘে ভরপুর ও নিয়মিত বৃষ্টি হয়। পর্বতের গায়েসহ গীলান প্রদেশ গাছপালা সবুজের সমারোহ প্রত্যক্ষ করি গতকাল সারাদিনব্যাপী।

আমাদের বহনকারী শতাধিক আসনের Fokkar উড়োজাহাজটি মাটিতে নেমে টার্মিনাল ভবনের সামনে থামলে আমরা হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ ও পারভানেহ সাহেবের উপহার নিয়ে বাইরে এসে টেক্সিযোগে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছে যাই।

ইরানের খাবার-দাবার

আমাদের এ উপমহাদেশ শত শত বছর পারস্য বা বৃহত্তর পারস্যের দ্বারা শাসিত। যেমনি সুলতানী আমল তেমনি মোগল আমল। ফলশ্রুতিতে, উপমহাদেশের অংশ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশে ব্রিটিশ-পারস্যের ভাষার পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়াও পারস্যের প্রভাবে প্রভাবিত বলা যাবে।

মোঘল আমল পেরিয়ে ব্রিটিশ আমলের সময় তাদের প্রভাব ভাষার পাশাপাশি ব্রিটিশ কালচার ও খাওয়া-দাওয়ায় আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পারস্যের ফারসী ভাষার পাশাপাশি পারস্যের খাওয়া-দাওয়ার স্টাইল সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়নি আমাদের বাঙালি সমাজ থেকে।

এখানে আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকার মোগলাই পরটাসহ কোরমা, বিরিয়ানী, নানান ঘৃত, তেল, মসল্লা মিশ্রিত খাবার চালু রয়েছে। অনেক ইতিহাসবিদ মন্তব্য করেন – এসব রাজকীয় আয়েশী খাবার এদেশে সুলতানীর পর মোঘল আমলে চালু হয়ে যায়। ফলে মাছে-ভাতে বাঙালির খাদ্য তালিকায় বৃটিশ ও পারস্যের খাবারের সম্পৃক্ততা ঘটে।

দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরান অবস্থানকালে খাবার-দাবারে আমাদের দেশীয় খাবারের সাথে মনে হয় ন্যূনতমও সম্পৃক্ততা পাইনি।

যারা আগে ইরান ভ্রমণ করেছেন বা ইরানে অবস্থান করে দেশে এসেছেন এমন ব্যক্তিরা বারেবারে কথায়/লেখালেখিতে ইরানী খাবার আমাদের বাঙালিদের জন্য প্রতিকূল বলে জানতে পারি। এতে আমার কৌতূহল হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে না পেরে।

বর্তমানকালে ইরানীদের প্রচলিত খাবারে আমাদের দেশের আয়েশী কোরমা-পোলাও যেমনি নেই তেমনি ইরান সফরকারী আমাদের দেশীয়দের রুচির প্রতিকূলতাও আমার বুঝে আসে না। এতে মনে করি বর্তমানকালের ইরানী খাবার-দাবার আমাদের দেশীয় রুচির ভিন্নতার কারণে সবার রুচির প্রতিকূল হয়। যেমনটা আমার ক্ষেত্রে। আমার ইরান সফরকালে খাবারের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরছি–

তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে মার মার নামক আমাদের হোটেলে ২টি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। একটি হোটেল গেস্টগণের সকালের ফ্রি নাস্তা ও বিয়ে অনুষ্ঠানের। এ রেস্টুরেন্ট আকারে বড়। আরেকটি মাটির নিচে আকারে ছোট, দুপুর ও রাতের খাবারের জন্য।

আমরা রাতে তেহরান পৌঁছে সকাল ৮টার দিকে চারতলায় আমাদের হোটেল কক্ষ থেকে নিচে রেস্টুরেন্টে চলে আসি। দেখলাম তখন অনেকে সকালের নাস্তা করছে।

ইরানের একটি রেস্টুরেন্ট

মধ্যখানে সাজানো বিভিন্ন প্রকারের নাস্তা রয়েছে। সামনে একপার্শ্বে বড় বড় বন রুটি, পাতলা রুটি ও লম্বা রুটি। নিকটে টমেটো, শসা ও অন্য প্রকারের ফল, তার কাছে ছোট ছোট নানান প্রকারের প্যাকেটের কয়েকটি থালা। তৎমধ্যে মধু, পনির, বাটার, এক প্রকারের ফলের জেলী, আরও আছে সিদ্ধ ডিম ও অমলেট। বড় ট্রেতে জৈতুন, ফলের জুস সর্বশেষ গরম পানি, চা ও কফির প্যাকেট, টুকরা ও গুঁড়ো চিনি, ছোট-বড় চামচ ও কাঁটা চামচ।

তেহরানে আমাদের হোটেল রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ফল সরবরাহ করেনি সকালের নাস্তায়। কিন্তু সিরাজ ও রাস্টে সকালের নাস্তা আরও সমৃদ্ধ দেখেছি ও খেয়েছি। তৎমধ্যে বিভিন্ন দুধের নাস্তা, দুধের ক্ষীর, নানান ফলাফলারি অতিরিক্ত ছিল।

এসব খাবার প্রোটিনে সমৃদ্ধ। হজমে সহায়ক তথা শরীরের অনুকূল। জৈতুন, বাটার, পনির, মধু, জেলী রুচির অনুকূল। ফলে বন রুটি মিশ্রিত করে লোভনীয় সুস্বাদু নাস্তা করতাম সকালে। বড় লম্বা টেবিলে গিয়ে দেখি দুধ নেই। চা খেতে

বয় থেকে দুধ চাওয়ায় দেখি আমরা দুজনের জন্য ২ কাপ দুধ এনে দেয়। ইরানে শতে একজনও দুধ দিয়ে চা খায় মনে হয় না। ঘনঘন দুধবিহীন চা খায়। টুকরা জমানো চিনি এক এক টুকরা মুখে দিয়ে ঐ জমানো চিনি মুখে রেখে অল্প অল্প করে চা খেতে থাকে। যে কোন অফিস-আদালতে চায়ের ব্যবস্থা থাকে। গুঁড়ো চিনির চেয়ে জমানো চিনির ব্যবহার বেশী ইরানে।

প্রথম দিন তেহরানের প্রধান মসজিদে জুমা পড়ে হোটেলে ফিরে আসি। দেখি সমতলে প্রধান তলা তথা বড় রেস্টুরেন্টটি বন্ধ। মাটির নিচে যেতে বলল। দেখলাম গোলাকৃতির রেস্টুরেন্ট, মধ্যখানে চতুর্ভুজ আকৃতির বৃহদাকারের টেবিলে নানান সালাদ, মিষ্টান্ন, জৈতুন সাজিয়ে রেখেছে। এর চারিদিকে চেয়ার বসানো।

সকালের নাস্তা সেলফ সার্ভিস ব্যবস্থা বিধায় বয়দের প্রয়োজনে ডাকতে হত। কিন্তু দুপুরের খাবারে আমরা এক পার্শ্বের টেবিলে বসামাত্র বয় আসল খাবারের অর্ডার নিতে। মুরগীর অর্ডার দেয়া হল। প্রায় ৫/৭ মিনিট পর বড় প্লেটে মধ্যখানে লম্বালম্বি হাড়বিহীন মুরগীর গোস্ত সাজিয়ে বসানো। তার চারদিকে টুকরা টুকরা নানান প্রকারের সবজী। আরেক প্লেটে ভাত; সাদা ভাতের উপর আমাদের দেশীয় জর্দা ভাত বলা যাবে ঐ রকম মিষ্টি ভাত ছিঁটিয়ে দেয়া। তবে ইরানে সেমাই মিশ্রিত ভাত চোখে পড়েনি। যেমনটা জর্ডানে ও ইরাকে দেখা বাদে খেতেও হয়েছে। ইরানে নানান প্রকারের সুস্বাদু সালাদের প্রচলন বেশী। যেমনটা অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে চোখে পড়েনি।

আমরা দুপুরে খাওয়াকালীন টক দধি মিশ্রিত ফল, টক দধি মিশ্রিত সবজি, ঘোল মিশ্রিত ফল ও সবজি, পনির মিশ্রিত ফল ও সবজি, দধি, ঘোল, পনির বাদে আমাদের দেশীয় প্রকারের সবজি সাজানো রয়েছে। যার যা ইচ্ছে নিয়ে খেতে পারে।

প্রায় ৭/৮ প্রকারের নানান প্রকারের সালাদ রয়েছে। রয়েছে মিষ্টান্ন; তবে আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ ও ভারতের মিষ্টান্ন সর্বোৎকৃষ্ট তথা অত্যধিক মজাদার বলে দাবী করতে পারি। দুপুরের খাবারে নানান প্রকারের সালাদ খেয়ে আমার খাবার পর্ব শেষ হয়ে যায়।

তারপরও লৌকিকতার জন্য অর্ডার দেয়া, ঐ অর্ডারে মুরগী আনলে সাদা দেখে কাঁচা মনে হল। কিন্তু খেতে সুস্বাদু। ঐ মুরগীর বড় প্লেটের চারিদিকে সাজানো থেকে নিয়ে কয়েক প্রকারের লবণসিদ্ধ সবজি খেয়ে থাকি।

ইরানের প্রায় প্রতি রেস্টুরেন্টে এ নিয়মটা চালু দেখলাম। মাছ বা গোস্তের অর্ডার দিলেও বড় প্লেটে মাছ গোস্তের চারপার্শ্বে ৪/৫ প্রকারের লবণসিদ্ধ সবজি থাকবে। ইরানীরা মাছ ও গোস্ত খাওয়ার সাথে এ সবজি ও সালাদ খেতে থাকে।

সালাদ খেয়ে আমার খাবার পর্ব শেষ হলেও লৌকিকতার খাতিরে গোস্তের অর্ডার দেয়া। যেহেতু এ সালাদ রাখা হয়েছে ফ্রি হিসেবে নয়, যারা মাছ বা গোস্ত দিয়ে

ভাত বা রুটি খাবে তাদের জন্য। রাতের খাবারেও একই নিয়ম দুপুরের মত। তবে গোস্তের মধ্যে মুরগী বাদে অন্যান্য গোস্ত সাদা হয় না। শুধুমাত্র মুরগীর ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম।

উন্নত বিশ্বের মত ইরানেও রেস্টুরেন্টে গোস্তে হাড় থাকবে না। অন্যান্য রেস্টুরেন্টে মুরগীর অর্ডার দিলে ঐ মুরগীর গোস্তকে লাল করে দিতে বলতাম। এতে তারা বেশি করে সিদ্ধ করে লাল করে এনে দিত। ফলে সাদা দেখে কাঁচা কাঁচা ভাবটা আর মনে জাগত না। ইরানীরা আতিথেয়তা করবে সাধারণত বিভিন্ন প্রকারের বাদাম ও ফল দিয়ে। বিশ্বের বুকে দামী দামী বাদাম মনে হয় ইরানে বেশী জন্মে। তেমনি জৈতুন, তীনসহ নানান প্রকারের ফল জন্মে ইরানে।

মরুপ্রবণ দেশ ইরান। কিছু অংশে মাত্র বৃষ্টি-বাদল হয়ে সবুজের সমারোহ রয়েছে। ঐ অঞ্চল বাদে মনে হয় সারা ইরানে বাতাসে আর্দ্রতা নেই। ফলে আমাদের দেশের মত প্রচুর আর্দ্রতাপ্রবণ দেশের মানুষ এ অঞ্চলে বাতাস সহ্য করতে পারে না। ইরানীরা ঘৃত, তেল, মসল্লা খায় না বললেই চলে। মরিচ খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। ফলে আমাদের দেশের মত পরটা, কোরমা, বিরিয়ানী, কাবাব ইত্যাদি মেলা কষ্ট হবে মনে করি।

তারা অতিথিপরায়ণ বিধায় মানুষকে খাওয়াতে চায়। অফিসে, হোটেলে, বিভিন্ন কোম্পানীর প্রধান প্রধান দপ্তরে প্রবেশ করা মাত্র দেয়া হয় চকলেট। পরবর্তীতে দুধবিহীন চা, তার চেয়ে বেশী করতে চাইলে বিভিন্ন বাদাম ও ফলফলার থাকবেই এবং মূল খাবারে ভাত থাকে। এতে প্রতীয়মান হয় ইরানীরা রুটির পাশাপাশি ভাতও খায়। আমাদের দেশে শতশত বছরের সুলতানী ও মোঘল আমলের ফলে এদেশে কি ভাতের প্রচলন শুরু না কি তারও আগে থেকে এদেশে দিনে-রাতে প্রধান খাবার ভাত ছিল ভাবতে হবে।

ইরান সফর করে ভাবতে থাকি আমাদের দেশে ভাতের প্রচলন পারস্য থেকে আসল কি না। তাদের মুরগী রান্নাটা সাদা থাকে বলে দেখতে কাঁচা দেখায়। অন্যান্য মাছ-গোস্ত, নাস্তা পেটের ও রুচির অনুকূল বলে আমি মনে করি। তারা বেশি বেশি ফল-ফলারাদি খেয়ে থাকে বলে শরীর সতেজ বলা যাবে। ইরান এয়ারের সরবরাহকৃত খাবারও স্বাদু প্রোটিনসমৃদ্ধ। এক কথায় ইরানীরা প্রোটিনসমৃদ্ধ ঘৃত, তেল, মসলাবিহীন রান্নাকরা খাবার যেমনি খেয়ে থাকে তেমনি প্রচুর বাদাম, কাঁচা ফল ও ফলের জুস খেয়ে থাকে। খেয়ে থাকে লবণপানি মিশ্রিত সিদ্ধ সবজি।

ইরানের নারী সমাজ

ইরানে নারী সমাজ প্রথম পর্দা প্রত্যাখ্যান করা শুরু করে ১৯২৮ সাল থেকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে – ইরানের ধর্মীয় নগরী কোম-এর এক অনুষ্ঠানে শাহবানু তার মুখাবরণ উন্মোচন করে ফেলে। সেদিন থেকে ইরানে পর্দা প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পর্দা প্রথা ছেড়ে পশ্চিমা ধাঁচের খোলামেলা জীবনযাপন করতে শুরু করে ইরানী নারীসমাজ। ইরানের ছোট-বড় শহরগুলো মদসহ পতিতালয়ে ভরপুর হয়ে যায়।

এমনি এক পরিস্থিতিতে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়। ধর্মীয় গোষ্ঠী ইরানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। শাহ সপরিবারে বিদেশে পালিয়ে যায়।

ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্মীয় গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর দেশের নারীসমাজের কি অবস্থা চলছে সে ব্যাপারে কৌতূহল থাকাটা স্বাভাবিক। যেহেতু বিপ্লবীদের প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ শাহ-পন্থীদেরকে যে হারে শরিয়াহ্ বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছিল সেখানে মহিলা সমাজের কি হবে সে ব্যাপারে মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে।

নারী স্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব বিপ্লবের প্রথমদিকে সমালোচনামুখর ছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। যেহেতু ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পর নারী জাতির প্রতি যে দিকনির্দেশনা জারী করা হয় তা আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের সাথে তুলনা হবার নয়। তালেবানরা নারী সমাজকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বন্দী করে রাখে। এতে শুধু পশ্চিমা বিশ্ব নয় মুসলিম বিশ্বও আফগানিস্তানের সমালোচনায় মুখর ছিল।

ধর্ম নিয়ে অতি বাড়াবাড়ির কারণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পতনের কয়েকটি কারণের মধ্যে এটিও একটি বলা যায়। কিন্তু ইরানে বিপ্লবী সরকার নারী সমাজের প্রতি নির্দেশ জারী করে, যাতে পর্দা রক্ষা করে নারীসমাজ শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকরি সবকিছুতে উন্মুক্ত থাকবে। পর্দা বলতে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে এবং মাথায় ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। মুখমণ্ডল খোলা থাকতে পারবে।

আগেই অন্যখানে উল্লেখ করা আছে, ইরানে শিয়া আকীদায় ধর্মীয় সবকিছু পরিচালিত। এমনকি সরকারী বেসরকারী সবকিছুতেই শিয়া-সুন্নীর দেখা মেলা

ভার। শিয়া বিশ্বাস মতে, মহিলা সমাজ মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারবে। শিয়া-সুন্নী এর ধর্মীয় বিশ্বাসে বহু কিছু মতভেদ রয়েছে। তৎমধ্যে মুখমণ্ডল একটি। সুন্নী বিশ্বাস মতে, নারী সমাজের মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে হবে। এই নিয়ে অবশ্য সুন্নীর মধ্যে মতভেদ যে নেই তা নয়। তবে পর্দা রক্ষা করে মহিলারা লেখাপড়া, চাকরি, ব্যবসা সবকিছু করতে পারবে। এতে মনে হয় কারো দ্বিমত নেই, কিছু কিছু উগ্রবাদী মুসলিম বাদে।

ইরানে মহিলারা কামিজ আমাদের দেশের মহিলাদের মত পরলেও সেলোয়ার না পরে প্যান্ট পরে থাকে। এতে গাড়ি চালনাসহ দ্রুত চলাফেরার কিছু সুবিধা বলা যায়। বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে ওড়নার পরও বড় চাদরে সারাশরীর ঢেকে নেয়, মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রেখে। শিয়া মতে বোরকা প্রথা নয়, চাদর প্রথাই ধর্মমতে গ্রহণযোগ্য। অতএব, ইরানী নারীদের মধ্যে যারা অতি পর্দা করতে চায় তারা বড় কালো চাদরে মাথাসহ সারাশরীর ঢেকে নেয়।

বিশ্বের বুকে সুন্দর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ইরানীরা অন্যতম বলা যায়। তাদের শরীরের গঠন যেমনি সুন্দর তেমনি শরীরের রংও, তেমনি চেহারার লাবণ্যতায়ও অগ্রগামী বলা যাবে। ইরানী নারীরা কালো কাপড়কে বেছে নেয় মনে হয়। শতকরা ৮০/৯০ ভাগ মহিলা কালো কাপড় পরে থাকে। দোকানেও কালো কাপড়ের আধিক্য বেশী লক্ষ্য করা যায়, নারীদের চাহিদার কারণে।

ইস্পাহানে মহিলাগণের বিচরণ

সমগ্র ইরানে পতিতালয়তো নেই-ই, অবাধে সেখানে মেলামেশার উপরও কঠোরতা রয়েছে। তবে মুতা প্রথা রহিত হয়নি। কিন্তু মুতাকে কঠিন করা হয়েছে যাতে করে যেনতেন ব্যবহার করতে না পারে। যদিও সুন্নীমতে মুতা নবী পাক-এর আমলে প্রথমে জায়েজ থাকলেও পরবর্তীতে বাতিল করা হয়েছে বলে বিবেচিত।

ইরানী নারীরা লেখাপড়ায় এগিয়ে থাকায় তারা উচ্চ শিক্ষিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ নানাদিক দিয়ে শিক্ষালাভ করে। শিক্ষার পাশাপাশি তারা ড্রাইভিংও শিখে নেয়। এতে টাকা পাওয়ার সাথে সাথে সরকারী সুবিধা নিয়ে গাড়ী কিনে নেয়। ইরানের ছোট-বড় প্রত্যেক শহরে অসংখ্য নারীকে দেখা যাবে তারা মাথায় ওড়না রেখে নিজের গাড়ী নিজে চালাচ্ছে। ইরানে দু'চাকার মোটর সাইকেলের ব্যবহার খুবই কম। ইরানের বিমানবন্দর, অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেস্টুরেন্ট যে কোনখানে মহিলাদের বিচরণ দেখা যাবে। এমন অনেক অফিস চোখে পড়বে যেখানে ৭/৮ জন মহিলা, ১/২ জন পুরুষ। রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে ও টেবিলেও মহিলারা কাজ করতে পরিলক্ষিত হবে।

আবাসিক হোটেলে রিসিপশনের পাশাপাশি রুম সার্ভিসেও মহিলাদের বিচরণ রয়েছে। কিন্তু তাদের খারাবীর তথা চারিত্রিক কোন খারাপ খবর ইরানে প্রমাণ নেই বলে বারেবারে জানতে পারি।

অফিসে কর্মক্ষেত্রে দুগ্ধপোষ্য শিশুও সাথে বা পাশে রাখতে দেখা যায়। যেহেতু ইরানীরা বিলাসী নয়। আমাদের উপমহাদেশ বা আরবীয় রাজতন্ত্রের দেশের মত ঘরে কাজের মেয়ে (খাদ্দামা) রাখার প্রবণতা নেই। এতে হয়ত সরকারী অনুমতি আছে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের সাথে রাখতে।

নারীরা কাজ করার সময় মাথার ওড়না গলার সাথে পেঁচিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকে। নিজের গাড়ী নিজে চালায়। তবে বিকেলে বাজারে বড় বড় শপিং মলে যুবক-যুবতীর হাত ধরাধরি করে চলাফেরা অহরহ দেখা যায়। এতে ইরানী পুরুষের কাছে জানতে চাওয়ায় তারা বলল, ইরানে কলেজ-ভার্সিটিতে ছেলেমেয়ে বন্ধুত্বের প্রচলন থাকলেও এ রকম হাত ধরাধরি করে চলাফেরা স্বামী-স্ত্রী বাদে সম্ভবপর নয়।

ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নারীরা কাজে-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায়, বেড়ানোতে একাকী চলাফেরা করে থাকে। একাকী চলাফেরা করে থাকে গভীর রাতে এখানে-সেখানে। রাষ্ট্রীয় কঠোর আইনের কারণে পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় সব সময় সবস্থানে নারীরা নিরাপদ।

শহর এলাকার বাসগুলোতে নারীদের জন্য পিছনে বিশেষ কক্ষ ও দরজার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে নারীরা পৃথকভাবে বসতে পারে। নারীদের জন্য পৃথক কক্ষের কারণে শহর এলাকায় ইরানী বাসগুলো তারা লম্বা আকৃতির দু'কক্ষ বিশিষ্ট করে নির্মাণ করে।

নারীদের কাজে ধর্মীয় প্রভাবও কম নয়। ইরানের প্রত্যেক মসজিদে মহিলাদের পৃথকভাবে পর্দা সহযোগে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে একই ইমামের পিছনে। বড় বড় মসজিদে হাজার হাজার নারী মসজিদের এক পার্শ্বে জামাতে শরীক হয়।

ইরানে মাজারের প্রাধান্য বেশী। বিশেষ করে ইমামজাদাগণের বিশাল বিশাল মাজার। চোখ ঝলসানো মাজারের একপার্শ্বে পর্দা দিয়ে মহিলাদের যেয়ারতের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিমানবন্দরে যেমনি মহিলারা কর্মরত, তেমনি বিমানের ভিতরও বিমানবালার চাকরি নিয়ে মহিলারা কর্মরত। কিন্তু তাদের ড্রেস-এ পর্দা যেভাবে রক্ষিত হচ্ছে, মনে হয় না অন্যকোন মুসলিম দেশের বিমানবালাদের তেমনি রয়েছে। এমনকি সৌদি এয়ারলাইনেও নয়।

এক কথায় ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরানী নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় যেমনি এগিয়ে, তেমনি স্বাধীনতার দিক দিয়েও এগিয়ে। সেখানে নারীদের রয়েছে ধারণাতীত স্বাধীনতার পাশাপাশি নিরাপত্তা।

তেহরান থেকে ঢাকা

২১ সেপ্টেম্বর বুধবার ইরানের রাজধানী তেহরান ত্যাগের দিন। গতকাল সকালে রাস্ট থেকে তেহরান ফিরে হোটেলে বিশ্রাম নিই। আমাদের দেশী দেলোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন যাবত তেহরানবাসী। ইরানের নাগরিকত্বপ্রাপ্ত; ইরানী মেয়ে বিয়ে করে তেহরানে সপরিবারে বসবাস করছেন। পেশায় ব্যবসায়ী, সাখাওয়াত সাহেবের পূর্ব পরিচিত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আমার পরিচয় জানতে পেরে সম্মানের চোখে দেখতে থাকে। ক'দিন আগে তার বাসায় রাতের দাওয়াত খেতে হয়েছিল।

রাস্ট থেকে এসে দুপুরে তিনি হোটেল থেকে আমাদের নিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাওয়ান। অতপর তেহরানে এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরিতে ও কেনাকাটায় সময় দিতে থাকেন। রাতে আমাদেরকে হোটেলে পৌঁছে দেন। সাখাওয়াত সাহেব রাতে তাঁর কেনাকাটা বড় ব্যাগে ঢুকিয়ে নেন ইস্তাম্বুল যাবেন বলে।

আমার কেনাকাটা বাদাম ও শুকনো ফল হোটেল থেকে দেয়া পাতলা কার্টনে রয়ে গেল। শক্ত কার্টন বা অন্য ব্যাগ কেনার সুযোগ হয়নি। রাতে ঐ কার্টন সুতলী দিয়ে বেঁধে নিই।

সাখাওয়াত সাহেবের ফ্লাইট সকাল ৭:৪৫ মিনিটে ইরান এয়ারে তেহরান থেকে ইস্তাম্বুল। কিন্তু তাঁর ফ্লাইট কি নতুন ইমাম খোমেনী বিমান বন্দর থেকে না কি শহর সংলগ্ন মেহেরাবাদ বিমান বন্দর থেকে এ ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে বেগ পেতে হয়েছিল। যেহেতু উভয় বিমান বন্দর থেকে ইরান এয়ারের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল করছে।

শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেল মেহেরাবাদ বিমান বন্দর থেকে। আমার ফ্লাইট আমিরাত এয়ারে দুবাই যাব বেলা ১১:৩০ মিনিটে ইমাম খোমেনী নতুন বিমান বন্দর থেকে।

প্রায় ৭টার দিকে তেহরানে সূর্যোদয়। ২ ঘন্টা আগে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের বিমানবন্দরে রিপোর্ট করতে হয়। ফলে সুবেহ সাদেক হওয়া মাত্র ফজরের নামাজ পড়েই বিমান বন্দরে রওনা হতে হবে সাখাওয়াত সাহেবকে।

রাত না করে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ভোররাতে উঠে প্রস্তুতি শুরু হয় সাখাওয়াত সাহেব রওনা হওয়ার। খুব ভোরে রিসিপশনে নেমে আসি, সাখাওয়াত সাহেবের

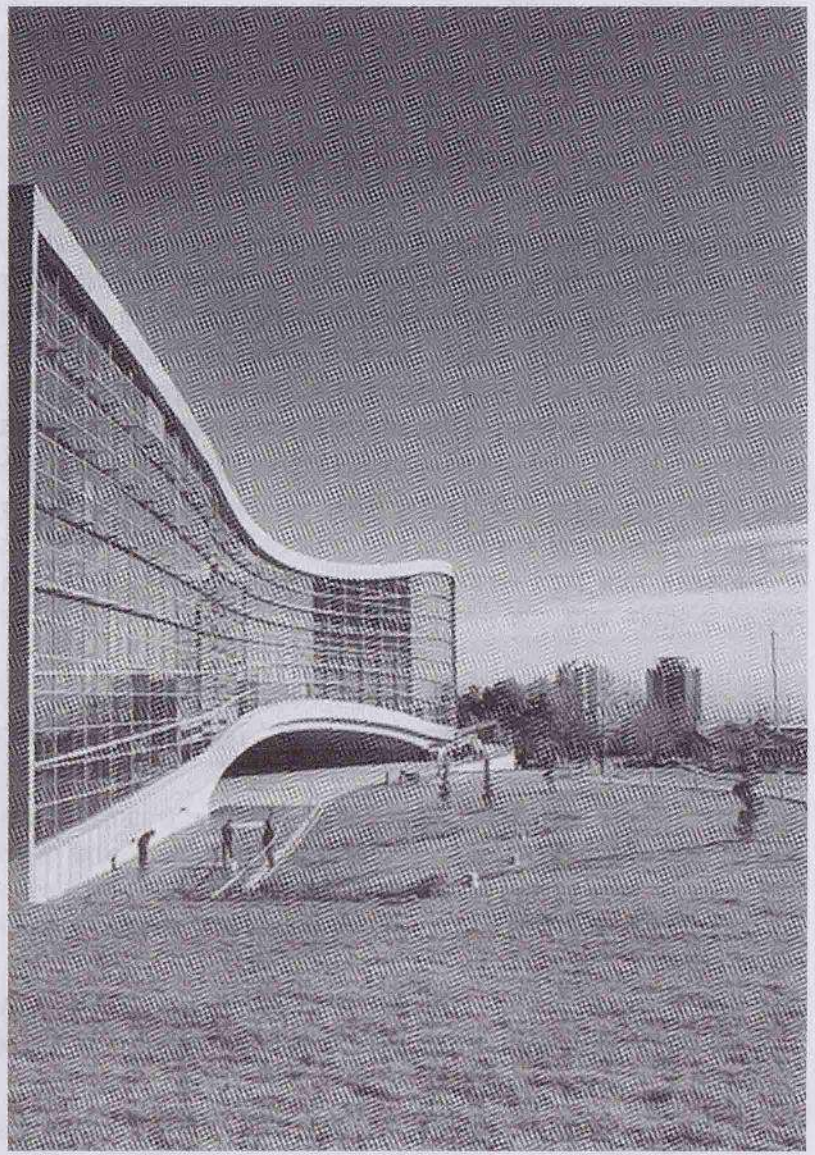

তেহরানে ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

ব্যাগ দুটিসহ। সম্মুখস্থ বড় রাস্তা থেকে চলন্ত টেক্সি নিয়ে সাখাওয়াত সাহেব মেহেরাবাদ বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তিনি ক'দিন ইস্তাম্বুল

থেকে তুরস্কে ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে পুনরায় দুবাই হয়ে ঢাকা ফিরবেন। আমি সাখাওয়াত সাহেবকে বিদায় জানিয়ে চতুর্থতলায় হোটেল কক্ষে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

সকাল ৭টার পর ঘুম থেকে উঠে নিচে চলে যাই সকালের নাস্তা করতে। সেল্‌ফ সার্ভিসে হোটেল গেস্ট হিসেবে সকালে নাস্তা সেরে কক্ষে ফিরে যাই এবং বয়-এর সহায়তায় ব্যাগ, কার্টন নিয়ে রিসিপশনে চলে আসি। রিসিপশনের মাধ্যমে টেক্সি আনিয়ে নিই টেক্সি স্ট্যান্ড থেকে। যেহেতু আমার যাত্রা তেহরান থেকে প্রায় ৫০/৬০ কি. মি. দূরত্বে নতুন বিমান বন্দর থেকে। বিদেশী একা বিধায় কম পয়সায় রাস্তা থেকে টেক্সি না নিয়ে হোটেলের মাধ্যমে টেক্সি আনিয়ে নিই টেক্সি স্ট্যান্ড থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে টেক্সি আসলে ঐ টেক্সিযোগে ইমাম খোমেনী বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

১৪ দিনের বারেবারে দেখা, ঘুরে বেড়ানো, যেয়ারতে সময় কাটানো, আল-বুরুজ পর্বতের পাদদেশে এ তেহরান মহানগরীকে পিছনে ফেলে চলতে থাকি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে। পিছনের সিটে বসে ভাবতে থাকি গত ১৪ দিনের কত স্মৃতি। পিছনে একাকি বসে ভাবতে ভাবতে বিমানবন্দরে পৌঁছি। তেহরান-কোম-ইস্পাহান মহাসড়কের প্রায় ২/৩শ' মিটার ডানে এ নতুন বিমানবন্দর।

বিমানবন্দরের নিকটে আসার পর ফার্সী ও ইংরেজিতে দিকনির্দেশনা দেখে বুঝতে পারছি এ বিমান বন্দর ঢাকার মত দ্বিতল বিশিষ্ট। নিচে দিয়ে আগমন, উপর দিয়ে গমন। আমাকে বহনকারী টেক্সি কয়েকশ' মিটার লম্বা দ্বিতল টার্মিনাল ভবনের উপরে উঠতে থাকে এবং দিকনির্দেশনা মত চক্কর দিয়ে ঘুরে উপরে গমনের স্থানে থামে।

টেক্সিচালককে ভাড়া প্রদান করে ট্রলি নিয়ে আমিরাত কাউন্টার খোঁজ করতে থাকি। তখন ৯টা বাজার কিছুটা বাকি। দেখি Emirat এয়ারের Checking শুরু হয়ে গেছে।

প্রচুর কাউন্টার; সে অনুপাতে যাত্রী হালকা। তবে এখনো আড়াই ঘন্টার উপরে বাকী ফ্লাইট ছাড়ার। এক কাউন্টারে আমার পাসপোর্ট, টিকেট ও ট্রানজিট ভিসার কার্ড প্রদান করি। কিন্তু ঐ কাউন্টারে আমার ট্রান্সজিট ভিসা বুঝতে পারছিল না। মনে হয় ইরান থেকে এ পদ্ধতি নেই, বা থাকলেও কম।

এখানে উল্লেখ্য, আরব আমিরাত সে-দেশে পর্যটক আকর্ষণ করার জন্য নানান ভিসার ব্যবস্থা রেখেছে। তৎমধ্যে একটা অতি সহজ পদ্ধতি হল আমিরাত এয়ারে দুবাই হয়ে অন্য গন্তব্যে গেলে বা দুবাই গিয়ে ফিরে আসলে আমিরাত এয়ারের একাধিক হোটেলের যে কোন একটিতে অবস্থান করলে ক'দিন থাকা যায়। সে মতে ঢাকা থেকে ২ দিনের ট্রান্সজিট ভিসা নিয়ে রাখি তেহরান থেকে ফিরবার পথে দুবাই অবস্থান করব বলে। নির্ধারিত এ দু'দিনের জন্য অর্থাৎ ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর

২ দিন আমার জন্য হোটেল বুক করা আছে।

জজিরাতুল আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌদি আরবের পর ইয়েমেন ও ওমানে কতেক ঐতিহাসিক নিদর্শন ও নানান মাজার রয়েছে।

কিন্তু কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, আরব আমিরাতে শহর, সাগর দেখা বাদে ঐতিহাসিক তেমন কিছু নেই বললেই চলে। কাজেই আমার বিবেচনায় ২ দিন যথেষ্ট আমিরাতে ঘুরে দেখার জন্য।

কাউন্টারে ভদ্রলোক আমার ট্রান্সজিট ভিসা বুঝতে না পেরে পার্শ্বস্থ আমিরাতের আরেক কাউন্টারের মহিলার সাথে আলাপ করেন। তৎক্ষণাৎ মহিলা আমাকে তাঁর কাউন্টার থেকে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করে দেন। কাউন্টারে ভিসা চেক করে ভিসা ও টিকেট দেখে লাগেজ ওজনে দিতে বলেন। হয়ত ১০/১২ কেজির কার্টন ও চাকাযুক্ত ছোট ব্যাগের ওজন বিশ কেজি হবে না। ওজনে দেয়ার সাথে সাথে মহিলা বললেন এ দুর্বল কার্টন নেয়া যাবে না, ছিঁড়ে যাবে। আমি অনন্যোপায়! ঐ বাদাম ও শুকনো ফলের কার্টন ফেলে আসা বাদে আমার কোন গত্যন্তর নেই। কাজেই তৎক্ষণাৎ চিল্লায়ে ফার্সী, আরবী মিলায়ে বলতে থাকি খোদা হেফাজত করবেন, আপনার চিন্তা বা ভয়ের কারণ সেই, নষ্ট হলেও আপত্তি নেই। গলা ফাটায়ে চিল্লায়ে বললে মহিলা হতচকিত হয়ে পড়েন। মুহূর্তে তাঁর মন পরিবর্তন হয়ে যায়। আমার ঐ কৌশল বাদে গত্যন্তর ছিল না। যেহেতু তথায় কোন ব্যাগ বা কার্টন যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আমার একমাত্র কেনাকাটা ইরানে ফেলে আসা থেকে রক্ষা করতে হবে। মহিলা সসম্মানে Boardir g Card দিয়ে দেন এবং আমার দু'টি লাগেজ দুবাই-এর প্রতি বুকিং করে দেন।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে কয়েক মিনিট এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকি। দেখি ফাঁকা ফাঁকা বিমানবন্দর। আন্তর্জাতিক ফ্লাইট মনে হয় ঢাকা জিয়া বিমান বন্দর থেকে কম বাদে বেশী হবে না।

হাঁটতে হাঁটতে টার্মিনাল ভবনের অপর প্রান্তে চলে যাই। দীর্ঘক্ষণ অবস্থানকালে টার্মিনাল ভবন থেকে এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটির পাশাপাশি রানওয়ের দিকে দেখতে থাকি। তখনও দুবাই থেকে আমিরাত এয়ারের ফ্লাইট আসেনি।

টার্মিনাল ভবনে অপেক্ষায় থাকাকালীন পরিচয় হয় পশ্চিমবঙ্গের জনৈক বাসিন্দা দুবাইতে চাকুরীজীবী। কোম্পানীর কাজে তেহরান এসে দুবাই ফিরে যাচ্ছেন। তিনি নাকি প্রায় দুবাই থেকে তেহরান আসা-যাওয়া করেন। উভয়ের মধ্যে ইরান ও দুবাই প্রসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। এরই মধ্যে দুবাই থেকে যাত্রী নিয়ে আসা আমিরাত এয়ারলাইনের বিমান অবতরণ করে বোর্ডিং ব্রিজে আমাদের নিতে অপেক্ষমান দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে ১৪ দিন আগে দুবাই থেকে আসা মাঝারী আকৃতির তথা প্রায় দু'শ আসনের Airbus-এর স্থলে আজ দুবাই যাওয়ার পথে

বৃহদাকারের তিন শতাধিক আসনের 777 Boeing দেখতে পাচ্ছিলাম টার্মিনাল ভবন থেকে আয়না দিয়ে। ঢাকা-দুবাই এ বৃহদাকারের 777 Boeing যাওয়া-আসা করে থাকে।

এ টার্মিনালে টয়লেট ব্যবস্থা অপ্রতুল। এক এক এরিয়ায় মাত্র একটি করে হাই কমোড ও ফ্ল্যাট কমোড রয়েছে। ফলে ফ্ল্যাট কমোডে লাইনে থাকতে হচ্ছিল। এতে নিকটে দেখা ৩/৪ জন টার্মিনাল ভবনের কর্তব্যরত অফিসারকে ভর্ৎসনা করি তাদের দেশের টার্মিনালের এ অপরিকল্পিত ব্যবস্থা রাখার কথা বলে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে যথাসময়ে ফার্সী ও ইংরেজিতে ঘোষণা হলে তেহরান বিমান বন্দর (ফুরুত গাহ ফার্সীতে বলে থাকে) থেকে আমরা যাত্রীরা উড়োজাহাজে গিয়ে আসন গ্রহণ করি।

যাত্রী মনে হচ্ছিল অর্ধেকেরও কম। প্রায় ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটের যাত্রায় দুপুরে দুবাই বিমানবন্দরে নেমে ইমিগ্রেশনের লম্বা লাইনের পিছনে দাঁড়াই। প্রায় ১০/১২টি লাইন; তারপরও অপর্যাপ্ত। পাশে আরেকটি টার্মিনাল ভবনের নির্মাণকাজ চলছে দ্রুত। ইমিগ্রেশনে আমার পালা আসলে অফিসার মনে হয় তার উপরস্থের সাথে কি যে আলাপ করে আমাকে ছেড়ে দেন পাসপোর্টে সিল দিয়ে। হয়তোবা বাংলাদেশী পাসপোর্ট, ইরান থেকে আসছি দাঁড়িওয়ালা লোক, বাংলাদেশের জে.এম.বি'র লিডার মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

ইরান থেকে আমাদের দেশীয় অনেকের মধ্যে শুধু স্নেহের জাকারিয়াকে ফোন করি বিমানবন্দরে আসার জন্য। এদিকে, নির্ধারিত হোটেল থেকেও গাড়ি নিয়ে লোক এসে যায় আমাকে নিতে। টার্মিনাল ভবনের অপর প্রান্তে জাকারিয়ার সাক্ষাত পাই। সাথে দেশীয় মাহমুদুর রহমান ও হাসেম। এদিকে হোটেলের লোক আমার নাম লিখে প্লে-কার্ড নিয়ে দাঁড়ানো। জাকারিয়াদের নিয়ে হোটেলের লোকের সাথে আলাপ করে অবস্থান জেনে লাগেজসহ জাকারিয়ার গাড়িসহ হোটেলে পৌঁছি দু'দিনের অবস্থানের উদ্দেশ্যে। আমিরাতে দু'দিন অবস্থান করে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে Amirat Air-এ দুবাই থেকে ঢাকা রওনা দেই।

ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইরান গমন

গত ৩০ মে '০৮ শুক্রবার ২য় বারের মত ইরান গমনের সুযোগ হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর অনুসারীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সে থেকে মহামান্য খোমেনী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৯ ইংরেজির ৪ জুন ইন্তেকাল করেন। ইরানে প্রাচীন পারস্যের ক্যালেন্ডার ও চাঁদের তথা ইসলামী তারিখ গণনাকে বর্তমানকালে গুরুত্ব দিচ্ছে। ইংরেজি তারিখ ও সন গণনা তারা পারতপক্ষে পরিহার করে চলতে সচেষ্ট। তারপরও বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তা আদৌ সম্ভবপর হওয়ার নয়। ৪ জুন ইমাম খোমেনীর ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁরা কিছু কিছু অতিথিকে ইরানে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। তাঁদের পছন্দসই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক অন্যতম। মাঝেমধ্যে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরকেও গণ্য করে থাকে।

গত ৪ জুন ইমাম খোমেনীর ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমার আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে ইরান যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

ইতিপূর্বে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২ সপ্তাহের জন্য ইরান সফর করেছিলাম। তখন সফরসঙ্গী ছিলেন ঢাকায় বসবাসকারী নরসিংদীর সাখাওয়াত হোসাইন। তিনি ইরানে বড় ধরনের ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। সে লক্ষে এর আগেও একাধিকবার ইরান সফর করেছিলেন।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইরানের রাজধানী তেহরানের পাশাপাশি কোম, ইস্পাহান, সিরাজ, সেমনান, বাস্তাম (বোস্তাম), হামেদান, গীলানসহ ঐতিহাসিক শহরসমূহে গমন করার সুযোগ হয়েছিল যেয়ারত ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সময় ও যাতায়াত প্রতিকূলতায় মা'শাদ, নিশাপুর, কেরমান, তাবরীজসহ অপর ঐতিহাসিক শহরসমূহে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ফলে মনের গভীরে অপূর্ণতা থেকে যায়।

এবার ইরান গমনের মাসখানেক আগে ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কর্মকর্তা ঈসা শাহেদী সাহেবের সাথে টেলিফোনে আলাপ চলছিল। তিনি দীর্ঘদিন ইরান প্রবাসী এবং ফার্সি ভাষায় দক্ষ লেখক ও গবেষক। তিনি উৎফুল্লচিত্তে জানালেন ঢাকাস্থ ইরানের কালচারাল কাউন্সিলরকে আমার সম্পর্কে ধারণা দেয়ার সাথে সাথে তারা উক্ত অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহ

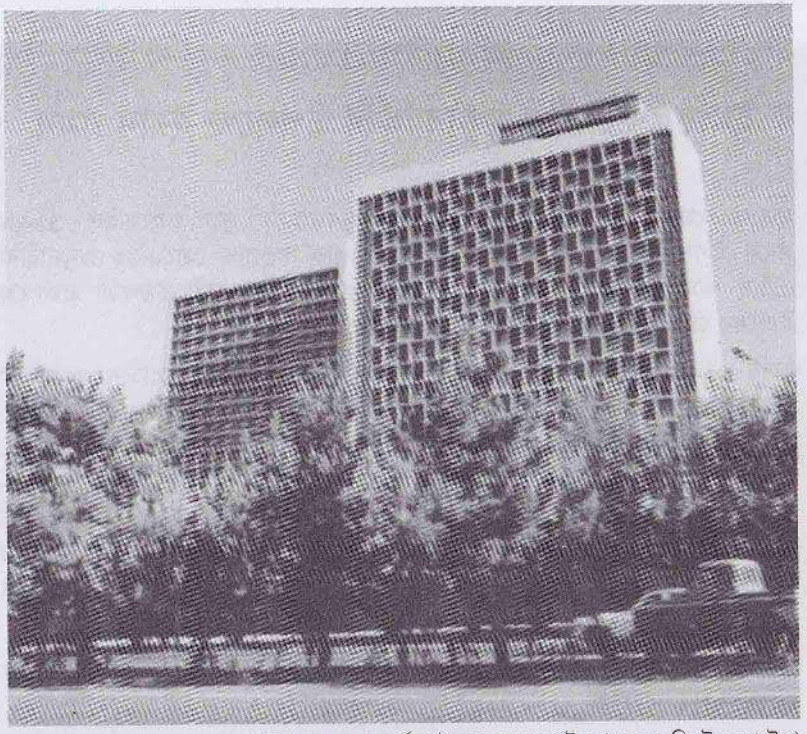

তেহরান আল-বুরুজ পর্বতে ইস্তেকলাল হোটেল (সাবেক হিলটন হোটেল)

প্রকাশ করে। কালচারাল কাউন্সিলর আমার সাথে পরিচিত হতে এবং সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় ঈসা শাহেদী গত ২৬ এপ্রিল '০৮ শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা –১ ঘন্টাব্যাপী সাক্ষাৎকার প্রোগ্রাম আমাকে জানিয়ে দেন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শারীরিক দুর্বলতা বাড়ছে বিধায় বিদেশ ভ্রমণে অন্তত একজন আপন সহযাত্রীর অতি আবশ্যকতা অনুভব করি। চতুর্দিক চিন্তা করে এমদাদ উল্লাহ সাহেব-এর সম্পর্কে চিন্তা করলাম।

তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও তাঁর পাসপোর্টে বিদেশ ভ্রমণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের ভিসা রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাকে যেহেতু গ্রহণ করেছে সেহেতু আমার সুপারিশে সহযাত্রী হিসাবে এমদাদ উল্লাহ সাহেবকেও গ্রহণ করবে। সে লক্ষে ২৬ এপ্রিল শনিবার এমদাদ সাহেবকে সাথে নিয়ে ঢাকা যাই।

যথারীতি বিকেল ৩টায় ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সিলর-এর সাথে মিলিত হতে যাই। তাঁর জন্য সৌজন্য কপি হিসাবে আমার রচিত কয়েকটি গ্রন্থও নিই। তাঁর সাথে চা পানের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছিল।

আলাপান্তে এমদাদ সাহেবকেও অতিথি হিসাবে মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করি এবং যথাসাধ্য তাঁকে তুলে ধরি। কাউন্সিলর মুচকি হেসে এমদাদ সাহেবকেও গ্রহণের আশ্বাস দেন। ঐ দিনই তেহরানে ই-মেইল করে পরদিন টেলিফোনে এমদাদ সাহেবেরও ইরান গমন করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। একইদিন সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবকে ইরান গমন করার ব্যাপারে আমাদের সহযাত্রী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করি। ইরান সরকার তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেনা। ইরানের সাথে তাঁর কোটি কোটি টাকার ব্যবসা থাকায় দূতাবাস তাঁকে বিশেষ মূল্যায়ন করে থাকে। আমার প্রস্তাবে সাখাওয়াত সাহেব যোগাযোগ করায় কাউন্সিলর তাঁকেও গ্রহণ করে নেয়।

উল্লেখ্য, অতিথি হিসাবে আমাদের অবস্থান হবে ৩০ মে থেকে ৪ জুন '০৮ইং। কিন্তু কালচারাল কাউন্সিলরকে অতিরিক্ত এক সপ্তাহ অবস্থানের জন্য বারেবারে আবদার করায় তিনি বারীধারাস্থ ইরান দূতাবাসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

ফলশ্রুতিতে ক'দিনের ব্যবধানে আবার ঢাকা গিয়ে ইরান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারায় তিনি আমাদের ৩ জনকে অতিরিক্ত এক সপ্তাহসহ ১৫ দিনের ভিসা দিতে সম্মত হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণের চিঠি পাওয়ার পর দূতাবাসের ভিসার কাজ সমাপ্ত করি। অতপর ৩০ মে শুক্রবার যথারীতি ঢাকা থেকে বাহরাইন হয়ে বিকেল বেলা তেহরানস্থ ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করি গাল্‌ফ এয়ারে। যেহেতু ঢাকার সাথে ইরান এয়ারের যোগাযোগ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

বিকেল বেলা যখন উক্ত বিমানবন্দরে পৌঁছি তখন আগত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথির সমাগমে ভরপুর ছিল। এতে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল আমাদের মূল্যায়ন করা নিয়ে। যেহেতু আমরা ১৯তম ওফাতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি। ইরানী কর্তৃপক্ষ নিয়মিত অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করতে করতে হয়ত এতদিনে তার গুরুত্ব অনেক কমে গেছে কিনা এ নিয়ে।

কিন্তু আমরা বাংলাদেশী ৮ জন অতিথিকে স্বাগত জানাতে ইরান কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ২ জন কর্মকর্তা গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরে অপেক্ষমান। সে সাথে আরো অসংখ্য গাড়ী নিয়ে অন্যান্য দেশের অতিথিদেরকে স্বাগত জানাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিমানবন্দরে তৎপরতা লক্ষ্য করলাম। অসংখ্য কারের বহর বিদেশী আগত অতিথিদেরকে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

২০০৫ সালে ২ সপ্তাহ ইরান অবস্থান করেছিলাম বলে তেহরান শহর আমার কাছে পরিচিত। দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের কারের বহর তেহরান শহরের সমতল ভূমি অতিক্রম করে আল্‌-বুরুজ পর্বতের দিকে এগুচ্ছিল।

পর্বতের দিকে এগুতে তথা উপরে উঠতে থাকে এবং তেহরানের বিখ্যাত ইস্তেকলাল (সাবেক হিলটন হোটেল) হোটেলের বিশাল এরিয়া কারের বহরে ভরপুর হয়ে যায়। ইমাম খোমেনীর রাষ্ট্রীয় অতিথিগণকে লাল গালিচা দিয়ে স্বাগত জানায়। ১৬/১৭ তলা বিশিষ্ট ২ টাওয়ারের এ বিশাল হোটেলের প্রশস্ত লবিটি আগত বিভিন্ন দেশের মেহমানদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে। এ হোটেলে অবস্থানকৃত বিদেশী মেহমানদের তদারকী কর্মকর্তাগণ কক্ষ বরাদ্দ দিতে হিমশিম খাচ্ছিল। তাদের সিদ্ধান্ত প্রতিকক্ষে ২ জন করে মেহমান থাকবেন। সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব নতুন পরিচিতের আমি যোগসূত্র বিধায় তারা ২ জনকে এককক্ষে দিয়ে আমি অন্যকক্ষে চলে যাই। আমার কক্ষে ছিলেন ঢাকার একজন সরকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট কবি যাঁর বহু কবিতার বই রচিত রয়েছে।

অনভ্যস্ত অনেকে বিমান ভ্রমণে শারীরিক অস্বস্থিবোধ করা স্বাভাবিক। তেমনিভাবে আমারই কক্ষের উক্ত অতিথি বিমান ভ্রমণের ধকল সহ্য করতে না পেরে কারযোগে হোটেলে আসার পথে বমি করতে করতে কাহিল হয়ে পড়ে যা পরে হোটেল কক্ষে এসে উপলব্ধি করতে পারি। তার অপর সহযাত্রীদেরকে অবহিত করার পর তারা সেবা শুশ্রূষায় তৎপর হয়নি। আমরা ৭ জন এই ৫ তারকা মানের বিলাসী হোটেলের উন্নতমানের রাতের খাবার খেলেও উক্ত কাহিল হয়ে যাওয়া আমার রুমমেট উপোস ছিলেন। ক্লান্ত দেহ নিয়ে যতটুকু সম্ভব তাঁকে সহায়তা করি। দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের চরিত্র কতইনা নিম্নমানের। সকালে শয্যা ত্যাগ করলে পরে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেন।

গতকাল থেকে ৬ দিনব্যাপী ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালা যথারীতি শুরু হয়ে গেছে যা হোটেল লবিতে আমাদেরকে সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান-সূচী দেখে বুঝতে পারি।

ইমাম খোমেনীর আলোচনা সভায় যোগদান

ইরানের রাজধানী তেহরানে গতকাল (৩০ মে '০৮) থেকে ইমাম খোমেনীর ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে।

গতকালের কর্মসূচী ছিল জুমা'র নামাজ এবং পরবর্তী বিকেলে ইমাম খোমেনীর মাজার যেয়ারত। আজ ৩১ মে শনিবার সকালের কর্মসূচী জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালার পর কেরমান ও তাবরীজে যাওয়ার জন্য টিকেট করার কাজে ব্যস্ত থাকায় উক্ত কমসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। বিকেলে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইমাম খোমেনীর উপর সেমিনার। আমাদের হোটেলে নিয়োজিত গাইডগণের দিকনির্দেশনায় আমরা ৩টার পূর্বেই হোটেল লবিতে চলে আসি। অবশ্য সকাল থেকে বুঝতে পারি হোটেল লবিতে রিসিপশন-এর বিপরীতে এ হোটেলে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিগণকে দেখভাল করার জন্য আলাদাভাবে চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, কাগজপত্র নিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

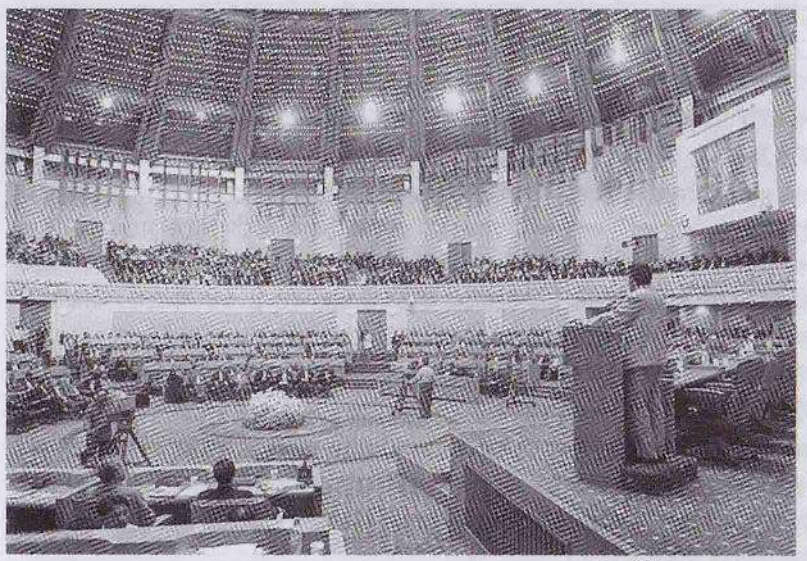

তেহরানে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

ইংরেজিতে পারদর্শী ২ জন মহিলা ও ৭/৮ জন পুরুষ কর্মরত রয়েছে। আমাদের অবস্থানরত এ হোটেলে প্রায় ১৭০/১৮০ জনের মত বিদেশী অতিথি অবস্থান করছে। তৎমধ্যে আমরা বাংলাদেশী ৮ জন বাদে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, আরব আমিরাত, আজারবাইজান, কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান, মিশর, সুদান, জাম্বিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ব্রাজিল অন্যতম।

এ হোটেলে অবস্থানরত অতিথিগণের যাতায়াত ও নিরাপত্তার জন্য ৪টি বাস, ২টি পুলিশের গাড়ী, একটি এ্যাম্বুলেন্স হোটেলের সম্মুখ চত্বরে সার্বক্ষণিক অবস্থানরত।

জানতে পারলাম বিদেশী প্রায় ৪/৫ শত অতিথিগণকে রাখা হয়েছে আমাদের অত্র হোটেল বাদে সমতল ভূমিতে তথা তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে লালেহ হোটেল (সাবেক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল) এবং ফেরদৌসী হোটেলে। আমাদের অবস্থান করা হোটেলের নিকটে তেহরানের অপর বিখ্যাত আজাদী হোটেল আরব আমিরাতের কোন একজন শেখের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকায় সেখানে বিদেশী অতিথিগণকে রাখা হয়নি বলে জানতে পারি।

দুপুরের খাবারের পর ৩টার দিকে গাইডগণের নির্দেশনামতে হোটেলের সম্মুখে অবস্থানরত বাসে উঠতে থাকি। বাস একটি পূর্ণ হলে তা সামনে অবস্থান করে পরবর্তী বাস যথাস্থানে এসে পড়ে। এভাবে ৪টি বাস পূর্ণ হলে সামনে-পিছনে পুলিশ পাহারা সবশেষে এ্যাম্বুলেন্স সমেত আমাদেরকে International Conference Center-এ নিয়ে যায়। বিশাল এলাকা জুড়ে এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র অবস্থিত। তার অবস্থান আমাদের অত্র হোটেল থেকে মাত্র ১ কিলোমিটারের মধ্যে। আমরা যখন মূল হলে প্রবেশ করি তখন মাইকে একজন কবি ফার্সিতে কবিতা আবৃত্তি করছিল।

অতপর সেমিনার আয়োজক কমিটির সভাপতি ইরানের সাবেক রাষ্ট্রপতি হুজ্জাতুল ইসলাম ড. খাতেমী আমাদের সামনের চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে মঞ্চে অবস্থিত সমমানের চেয়ারগুলোর মধ্যখানে একটিতে উপবেশন করেন এবং সাথে সাথে তাঁর সম্মুখে রাখা বিশেষ মাইকযোগে ফার্সি ভাষায় বক্তব্য শুরু করেন। হাজারের মত আসন বিশিষ্ট এ হলের মধ্যে বিদেশীদের সাথে সাথে বহু ইরানীও রয়েছে। ড. খাতেমীর দেয়া ফার্সি ভাষায় বক্তব্যের সাথে সাথে আরবী ও ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছিল।

ফলে সামনের টেবিলে সংযুক্ত এয়ারফোন ব্যবহার করে তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিলনা। তিনি দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে ইমাম খোমেনীর নানান গুণকীর্তন এবং ইসলামী বিপ্লবসহ ইরানের অগ্রগতিতে ইমাম খোমেনীর দিকনির্দেশনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

সভাপতি ড. খাতেমীর বক্তব্যের পর উপস্থাপক মাইকযোগে সামনে উপবিষ্ট ইরানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মঞ্চে আসন গ্রহণের আহ্বান জানান। অতপর

পূর্ব নির্ধারিত ছাপানো এবং সরবরাহকৃত কর্মসূচী মোতাবেক ইরানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ৬/৭ জন ইরানী ২/৩ ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন। প্রত্যেকে ইমাম খোমেনীর গুণকীর্তন করে। বিকেল ৭টার দিকে চা-নাস্তার বিরতি দেয়া হয়। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ও সুন্দর আয়োজন থাকায় চা-নাস্তা গ্রহণ করতে যাওয়া আগ্রহী কেহ বঞ্চিত হওয়ার নয়। বিরতির সুবাদে আমরা আসরের নামাজ পড়ে নিই। যেহেতু শিয়ারা যোহরের পরপর আসর এবং মাগরিবের পরপর এশার নামাজ পড়ে নেয়।

১৫/২০ মিনিটের ব্যবধানে পুনঃ সেমিনার কার্যক্রম শুরু হলে ইমাম খোমেনীর নাতি সৈয়দ হাসান খোমেনী মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। ৪০-এর কোটায় বয়সের হাসান খোমেনী আগমনের সাথে সাথে ইরানীরা উৎফুল্লচিত্তে তাঁকে স্বাগত জানায়। হাসান খোমেনীর অন্যত্র প্রোগ্রাম থাকায় তাড়াতাড়ি বক্তব্য রাখেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেন। মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের ভোগবিলাসের উপর কঠোর সমালোচনা করেন। লেবানন, ইরাক, আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেন। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য পেশ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এসে আগত জাম্বিয়া ও ব্রাজিলের একমাত্র অতিথিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হলে তাঁরা ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে, মিশর ও লেবাননের একজন করে অতিথি সুযোগ পেলে আরবীতে বক্তব্য রাখেন।

তেহরানে ৮:৩৫ ঘটিকায় সূর্যাস্ত বিধায় সভাপতি ড. খাতেমী মঞ্চে বসে মাইকযোগে সেমিনার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে যাতে মাগরিবের আগেই সেমিনার সমাপ্ত হয়।

৭/৮ জন ইরানী গণ্যমান্য ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে ফার্সি ভাষায় বক্তব্য রাখলেও তাদের বক্তব্যে অন্যকোন ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে আমার শ্রুতিগোচর হয়নি। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা।

দীর্ঘ ৫ ঘন্টাব্যাপী সেমিনারে বিদেশী অতিথিগণের মূল্যায়ন বাড়িয়ে দিলে সেমিনারের ভাবগাম্ভীর্য বহুলাংশে বেড়ে যেত। ইরানী ২/৩ জন বক্তা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অবশিষ্ট সময়টুকু বিদেশী অতিথিগণের বক্তব্যের সুযোগ করে দিলে ভাল হত। দীর্ঘ ৫ ঘন্টা ধরে সময় থাকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একজন করে অতিথি সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখলে সেমিনারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটত বলে মনে করি।

সভাপতি ও হাসান খোমেনী বাদে মঞ্চের অবশিষ্ট চেয়ারগুলো বিদেশী অতিথিদের জন্য বরাদ্দ রাখতে পারত। অবশ্য সেমিনারের শেষেরদিকে মঞ্চে চেয়ার খালি থাকায় লেবাননের এক মহিলা অতিথিকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া

হয়। মাগরিবের আগে আগে সেমিনার সমাপ্ত হলে আমরা নির্দিষ্ট বাসযোগে হোটেলে ফিরে এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে রাতের খাবার খেয়ে নিই।

বিদেশী অতিথিগণের অবস্থান করা ৩টি হোটেলের নাম ও ক্রমিক নাম্বার বাসের সম্মুখভাগে লাগানো থাকায় অতিথিগণ দ্রুত নির্ধারিত বাস পেতে এবং আসন গ্রহণ করতে সময় লাগেনি।

ইরানের হোটেলগুলোর প্রতিটি কক্ষে একটি জায়নামাজ ও একটি মাটির চ্যাপ্টা টুকরা থাকে এবং কক্ষের কোন একস্থানে কাবার দিকনির্দেশনাও থাকে। শিয়ারা কারবালার মাটিকে অতি পবিত্রতম মনে করে জায়নামাজ বিছিয়েও উক্ত কারবালার মাটির উপর নামাজের সিজদা দিয়ে থাকে।

অপরদিকে, যে কোন হোটেলের লবির নিকটে নামাজঘর থাকবে। নামাজঘরের একপার্শ্বে অসংখ্য মাটির টুকরা থাকে যা কি না কারবালার মাটি। শিয়ারা নামাজ পড়ার সময় মাটির টুকরা অবশ্যই সিজদার স্থানে রাখবে।

শাহ'র প্রাসাদ পরিদর্শন ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ

ইরানের রাজধানী তেহরানে দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম সাবেক পাহলভী শাহ-এর প্রাসাদসমূহ। ১ জুন '০৮ রবিবার সকাল ও বিকালের কর্মসূচী হল প্যালেস্টাইন কনফারেন্স। সন্ধ্যার পর ইমাম খোমেনীর নাতি সৈয়দ হাসান খোমেনীর সৌজন্যে নৈশভোজ। কিন্তু সকাল বেলা আমাদের হোটেলে দায়িত্বরত গাইডগণ ঘোষণা দিলেন সকালের নির্ধারিত প্রোগ্রাম স্থান অনুপাতে আমন্ত্রিত অতিথি আধিক্য হেতু বাতিল করা হয়েছে।

ঘন্টাখানেকের ব্যবধানে ঘোষণা দিলেন আমাদেরকে সা'দাবাদ (Sadabad Museum) যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। মূলতঃ তা পাহলভী শাহ-এর প্রাসাদ। গতবারের ইরান ভ্রমণকালীন পাহলভী শাহ'র প্রাসাদ পরিদর্শনের সুযোগ না হওয়ায় এবারের সুযোগটি কাজে লাগালাম।

মূলতঃ ইরানের পাহলভী শাহগণ ছিলেন অত্যধিক ভোগবিলাসী। তাদের অনুকরণে তখনকার ইরানে পশ্চিমা ধাচের জীবনযাত্রা চলছিল। ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের পর শাহ পরিবার বিদেশে পাড়ি জমায়। অপরদিকে ইরানে ইসলামী ধাচের জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঘটে।

পাহলভী শাহর প্রাসাদ রয়েছে তেহরানের ৩টি স্থানে। তৎমধ্যে প্রথমটির নাম হল গুলেস্তান (Golestan), দ্বিতীয়টির নাম নয়াবারান (Nyavaran)। অপরটির নাম সা'দাবাদ (Sadabad)। তৎমধ্যে গুলেস্তান প্রাসাদের প্রসিদ্ধতা বেশী। শাহ বছরের অধিকাংশ সময় এখানে কাটাতেন। গুলেস্তান সমতলভূমিতে অবস্থিত। সেখানে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ রয়েছে। শাহ-এর দ্বিতীয় প্রাসাদ-এর নাম নয়াবারান। এ প্রাসাদ কমপ্লেক্সেও ভিন্ন ভিন্ন ৪টি প্রাসাদ রয়েছে। শাহ প্রয়োজনে ও স্বেচ্ছায় এখানে অবস্থান করতেন। অপর তৃতীয় সা'দাবাদ প্রাসাদ কমপ্লেক্সে ভিন্ন ভিন্ন ১৮টি প্রাসাদ রয়েছে। এ সা'দাবাদ আল-বুরুজ পর্বতের অনেকটা উপরে এবং আমাদের অবস্থান করা এস্তেকলাল হোটেলের মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্বে।

বেলা ১০টার দিকে আমাদের বহনকারী বাসগুলো সা'দাবাদ প্রাসাদের দিকে এগুতে থাকে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় গাছের সারি, অতপর ফুটপাত। আমরা প্রাসাদের নিকট পৌঁছার পর ঢাকার বঙ্গভবনের মত সামনে বৃহদাকারের সুপ্রশস্ত চত্বর দেখতে পেলাম না। জানতে পারলাম আগে নাকি খোলামেলা চত্বর ছিল। ইসলামী বিপ্লবের পর বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত স্থানে বাড়ীঘর করা হয়েছে।

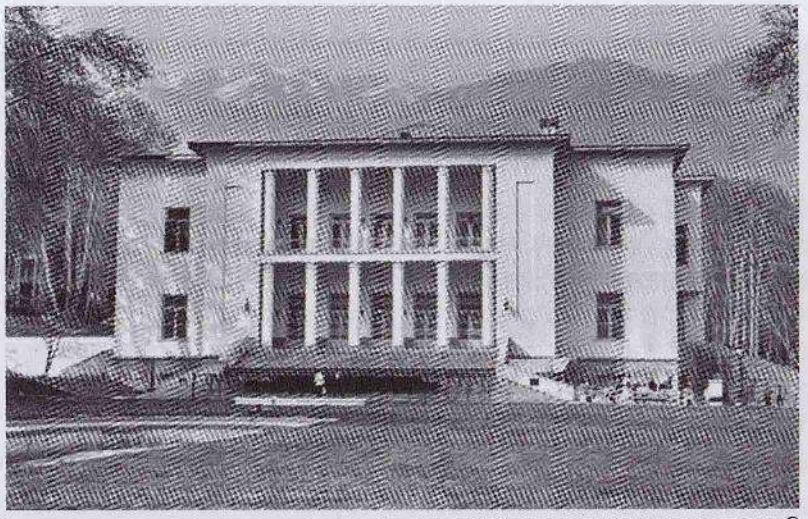

তেহরানে শাহ'র সাবেক সা'দাবাদ প্রাসাদের একটি

আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মিল্লাত প্যালেস, যার বর্তমান নাম মিল্লাত মিউজিয়াম বা যাদুঘর। মিল্লাত অর্থাৎ জাতীয়। এ প্রাসাদের সাবেক নাম হোয়াইট প্যালেস তথা সাদা প্যালেস। গরমকালে শাহ এখানে এসে ২/৩ মাস থাকতেন। মূলত আমাদের উক্ত হোটেলসহ এ সকল উঁচু এলাকা বিধায় তাপমাত্রা সমতল ভূমি থেকে স্বাভাবিকভাবে কয়েক ডিগ্রী কম। সা'দাবাদ প্যালেসে শাহের অধিকাংশ নিকটাত্মীয়- স্বজন থাকতেন। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহারে রয়েছে। আমাদের বাসগুলো বাইরে বড় রাস্তায় অবস্থানের পর আমরা প্রকাণ্ড গেট পার হয়ে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকি।

প্রাসাদের চতুর্দিকে গাছ-গাছালী ও নানা রকম সবুজের সমারোহ। বিশাল প্রাসাদে প্রবেশ করতে ১২/১৪টি সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠতে হয়। মিল্লাত প্যালেসে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ আমাদের স্বাগত জানায়। বাইর থেকে প্যালেসটি দ্বিতল মনে হলেও ইহা মূলতঃ ত্রিতল। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম, সেখানে একটি তলা রয়েছে যাতে ভিতর থেকে যাওয়া যায়। প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষ সাজানো গোছানো ও পরিপাটি রয়েছে। এতে দায়িত্বরত গাইডদের কিছু বলার অপেক্ষা রাখেনা। দেখতেই অনায়াসে বুঝা যাচ্ছে কোন্‌টি কিসের কক্ষ। ঘন্টাখানেক ধরে উক্ত প্রাসাদের বিভিন্ন দিক ঘুরেফিরে দেখে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। বিকেলে প্যালেস্টাইন কনফারেন্সে যোগদান করি নাই কেরমান ও তাবরীজের টিকেটের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত থাকার কারণে। ইরানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে কয়েক দিনের মধ্যে সিট পাওয়া খুবই দুষ্কর। ফ্লাইট অনুসারে যাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক। বিকেল ৮টার দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় লালেহ হোটেলে

(সাবেক ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল), ইমাম খোমেনীর নাতি সৈয়দ হাসান খোমেনীর নৈশভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য। হোটেলটি সমতল ভূমিতে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। তবে আমাদের অবস্থানকরা হোটেলের মত পাঁচ তারকা মানের হলেও হোটেলের সামনে পার্শ্বে খোলামেলা জায়গা নেই। লালেহ হোটেলে নৈশভোজের জন্য পৌঁছতে পৌঁছতে ৯টা বেজে যায়। তাড়া করে মাগরিবের নামাজ শেষ করতে করতে আমাদেরকে হল রুমে প্রবেশ করার জন্য মাইকযোগে আহ্বান জানানো হচ্ছিল। আমরা হল রুমে আসন গ্রহণ করতে না করতেই হলরুম পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে অনেক অতিথিকে আসনের স্বল্পতা হেতু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যেহেতু বিদেশীগণের সাথে অনেক ইরানীও রয়েছে। অল্পক্ষণের ব্যবধানে সৈয়দ হাসান খোমেনী হলরুমে প্রবেশ করলে সকলে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায়। অনেক ইরানী স্লোগান দিয়ে মুখরিত করে তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি মঞ্চের দিকে যেতে চাইলে অতিথিরা তাঁকে ঘিরে ধরে। তিনি মঞ্চের পার্শ্বে উপবিষ্ট হলে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে যায়।

মাত্র ১০/১৫ মিটার ব্যবধানে বসা ছিলাম বিধায় স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম তিনি মঞ্চে উঠতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাকে বারেবারে অনুরোধ করে মঞ্চে তোলা হয়। তিনি মঞ্চে উপবেশনের সাথেসাথে তাঁর উভয়পার্শ্বে ২ জন ভাষান্তরকারী বসে পড়েন। তিনি তখন মাত্র ৮/১০ মিনিট বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেহমানদেরকে মোবারকবাদ জানান। কষ্ট স্বীকার করে ইরানে এসেছেন বলে ধন্যবাদ দেন। তাঁর ঘরে আপ্যায়ন করতে অপারগতার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। যেহেতু তাঁর ঘর ছোট। তিনি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য প্রত্যাশা করে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। ফিলিস্তিন ও ইরাকের সমস্যার কথা একটু করে বললেন।

ইমাম খোমেনী বিশ্ব মুসলিমের একতার জন্য বারেবারে বলে গেছেন তা তিনি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি কয়েক বাক্য বলার সাথে সাথে উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন তা আরবীতে অন্যজন ইংরেজিতে অনুবাদ বা ভাষান্তর করে দেন। তাঁর বক্তব্য শেষ করে তিনি নিচে নেমে এসে অতিথিদের সাথে বসে নৈশভোজে মিলিত হন অর্থাৎ তিনি মঞ্চে বসে আহার গ্রহণ করেননি।

হলরুমটি অতিথি সমাগমে ভরপুর হওয়ায় টেবিলে টেবিলে খাবার সরবরাহ করতে সমস্যা হচ্ছিল। ফলে মাইকে দুই পার্শ্বে রাখা খাবার নিজ উদ্যোগে নিয়ে খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রথমে টেবিলে টেবিলে সরবরাহের পরিকল্পনা থাকায় তা বাতিল করে হলরুমের দুই পাশে ব্যবস্থা করতে কিছুটা শৃঙ্খলাবোধের অভাব হয়েছিল। অবশ্য, ১০/১৫ মিনিটের ব্যবধানে স্বাভাবিক হয়ে যায়। যেহেতু খাবারের আয়োজনের কোন কমতি ছিলনা। রাত ১১টার দিকে আমরা এস্তেকলাল হোটেলের অতিথিগণ বাসযোগে লালেহ হোটেল ত্যাগ করি।

রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে যোগদান ও বিকেলে যেয়ারতে

০২ জুন '০৮ সোমবার আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচীতে রয়েছে সকালবেলা ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমদীনেজাতের অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সন্ধ্যায় সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান ড. জলিলীর নিউজ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ।

আমরা সকাল ৯টার মধ্যে হোটেল লবীতে চলে আসি এবং গাইডগণের নির্দেশনা মোতাবেক গাড়ীতে আরোহণ করি রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। আমাদের নিয়োজিত মহিলা গাইড নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে অতিথিগণের সঙ্গে থাকা মোবাইল ও ক্যামেরাসমূহ একটি পলিব্যাগে জমা করে সংরক্ষণ করে রাখে। আমাদের হোটেল থেকে ছেড়ে বাস ৪টি চলতে চলতে সমতল ভূমিতে চলে আসে। অতপর একটি সশস্ত্র বাহিনীর এরিয়ার মধ্যে আমরা চলে আসি। বড় রাস্তার উপর বাসগুলো থামার পর আমাদেরকে একটি বড় প্রাসাদসম ঘরের পিছনের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রাসাদ সদৃশ উক্ত দালানে প্রবেশকালীন ২ বার করে নিরাপত্তা তল্লাশী করা হয়। তল্লাশীর পর আমরা যে বিশাল ভবনটিতে প্রবেশ করলাম তা ইরানের সাবেক পার্লামেন্ট ভবন।

শাহ-এর আমলে সংসদ অধিবেশন এখানে বসত। বর্তমান সংসদ ভবন অন্যত্র। সাবেক সংসদ ভবনে প্রবেশকালীন পানির বোতল সরবরাহ করা হয়। কিছুক্ষণের ব্যবধানে বড় বড় ট্রেতে করে আরবী কিংবা ইংরেজিতে অনুবাদ শোনার জন্য এন্টেনাসমেত এয়ারফোন মেশিন সরবরাহ করা হয় যা ব্যাটারী চালিত। আমাদের দেশে ব্যবহৃত মোবাইল সেটের সদৃশ।

এককালের সংসদ ভবন হলেও বর্তমানে টেবিলের সাথে এয়ারফোন সংযুক্ত নেই। আমাদের সরবরাহকৃত এয়ারফোনগুলোতে শুধুমাত্র আরবীতে অনুবাদ শোনা যাচ্ছিল। তখনি নিকটস্থ দায়িত্বরত টিভি ক্যামেরাম্যানের কাছে নিয়ে যাই। তিনি তা নাড়াচাড়া করে আমার উক্ত এয়ারফোনে ইংরেজি অনুবাদে রূপান্তরিত করিয়ে দেন।

আমরা আসন গ্রহণের পর কৌতূহলী হই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। মঞ্চটি বড় একটা ব্যানার দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তার সামনে মাইকের স্ট্যান্ড রয়েছে। মঞ্চ দেখা যাচ্ছে কিন্তু চেয়ার ছাড়া। ভাবতে থাকি ইরানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আহমদীনেজাত এসে কোথায় বসবেন।

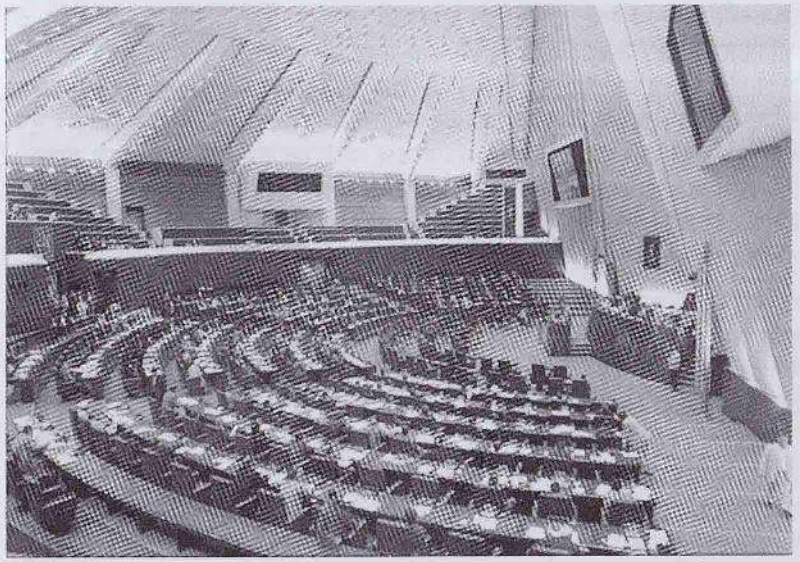

ইরানের পার্লামেন্ট ভবন

কিছুক্ষণের ব্যবধানে বেলা ১১টার দিকে রাষ্ট্রপতি আহমদীনেজাত আমাদের হলে প্রবেশ করলেন সম্মুখস্থ সাধারণ দরজা দিয়ে। আমাদের সংসদ ভবন স্পীকার ও রাষ্ট্রপতির আগমনের জন্য যেভাবে মঞ্চের পেছনে দরজা রয়েছে এখানেও সে রকম দরজা ও মঞ্চ আছে; কিন্তু সবকিছু বন্ধ ও ব্লক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আহমদীনেজাত হলে প্রবেশ করা মাত্র সকলে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু তাঁর আগে পিছনে কোন গার্ড তথা নিরাপত্তারক্ষী দেখলাম না; থাকলেও তা বাইরে। তিনি হেঁটে এসে মঞ্চের সামনে নিচে দাঁড়ানোর সাথে সাথে মাইকে ইরানের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠে। জাতীয় সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি সামনের সারিতে কয়েকজনের সাথে মোলাকাত করে মাঝখানের একটা চেয়ারে বসে পড়েন। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন অসঙ্গতি মনে হচ্ছিল। শাহ-এর আমলে পার্লামেন্ট ভবন বিধায় হয়ত মঞ্চ ব্যবহার না হতে পারে।

কিন্তু আহমদীনেজাত তো একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। সরকারী আইন মোতাবেক তাঁর মর্যাদা রক্ষায় চেয়ারসহ যথাযথ আয়োজন থাকার কথা এবং হলের ভিতর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানকারী বাহিনী থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ কোন কিছু দেখছি না। ইরানী আইন কি ব্যতিক্রম না কি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হয়েও ইমাম খোমেনীর অনুসারী হিসাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

রাষ্ট্রপতি আহমদীনেজাত সাধারণভাবে উপবেশন করার পর একজন কারী মাইকে কোরআন তেলাওয়াত করেন। অতপর ইরানের এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

লেবাননী এক মহিলা আরবীতে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। ব্রাজিল, জাম্বিয়া ও পাকিস্তানের আলোচককে ২/৩ মিনিট করে সময় দেয়া হয়। অতপর রাষ্ট্রপতি মাইকে গিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করেন। তিনি বিছমিল্লাহ পড়ে ভাষণ শুরু করেন অতপর দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহর একত্ববাদ-এর কথা বলেন। বিশ্ব মুসলিম এর বিরোধ দূর করতে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিচার তথা আইনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ফিলিস্তিন ও লেবাননে এক আইন, ইস্রাইলের জন্য আরেক আইন চলছে বলেন। ইমাম খোমেনীর শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর দিকনির্দেশনায় চললে বিশ্ব মুসলিম উপকৃত হবে বলে স্মরণ করিয়ে দেন।

আমেরিকা মানুষ মারার কাজে ব্যস্ততা উল্লেখ করেন। সন্ত্রাসী কে? আমেরিকা না কি অন্য কেহ? তা প্রশ্ন রাখেন। আফগানিস্তান ও ইরাকের জনগণের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এর জন্য যে সরাসরি আমেরিকা দায়ী তা স্মরণ করিয়ে দেন। মাত্র চার মিলিয়নের ছোট দেশ লেবাননকে আমেরিকা ধ্বংস করতে চাচ্ছে তা উল্লেখ করেন। দোয়া চান বিশ্বের মুজাহেদীনগণের ও ইরানের জন্য। কষ্ট স্বীকার করে ইরানে এসেছেন বলে অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানান। এই বলে খোদা হাফেজ বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেন। তিনি ভাষণ শেষ করার সাথে সাথে অসংখ্য অতিথি গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেন। এতে তিনি কোন প্রকার অস্বস্তিবোধ করেন নি লক্ষ্য করলাম।

উক্ত হলেও অনেকের হাতে ক্যামেরা দেখতে পেয়েছি। আমরা যে-পথ দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সে-পথ দিয়ে বের হয়ে আসছি। রাস্তায় এসে আমাদের জন্য অপেক্ষমান নির্ধারিত বাসে উঠে পড়ি। তখন একাধিক অতিথি আমাদের মহিলা গাইডকে ভর্ৎসনা করে ক্যামেরা ও মোবাইল নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য।

আমরা হোটেলে ফিরে এসে বিকালের নির্ধারিত প্রোগ্রামে যোগদান করি নাই।

সন্ধ্যার প্রোগ্রাম পরিহার করে সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধু হাসান কাবেরীর সাথে তাঁরই গাড়ীযোগে বেরিয়ে পড়ি যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। তেহরানের পুরাতন এলাকায় রয়েছেন ইমামজাদা হযরত হাসান (র.)-এর মাজার। আমাদের ইস্তেকলাল হোটেল থেকে তাঁর মাজারে পৌঁছতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে। গতবার ইরান সফরকালে তাঁর মাজার যেয়ারত করা হয়নি বলে আমার অতি আগ্রহে তেহরানের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী হাসান কাবেরী গাড়ী নিয়ে এসে আমাদেরকে নিয়ে যান।

এই ইমামজাদা হচ্ছেন : হযরত হাসান (র.) পিতা হযরত আবদুল্লাহ (র.) পিতা হযরত হাসান (র.) পিতা হযরত জাফর (র.) পিতা হযরত হারুন (র.) পিতা হযরত ইছহাক (র.) পিতা হযরত হাসান (র.) পিতা হযরত জায়েদ (র.) পিতা হযরত ইমাম হাসান (র.) ইবনে হযরত আলী (ক.)। মাজার হতে সরবরাহকৃত সজরা মোতাবেক উল্লেখ করা হল।

ইরানে ইমামজাদাগণের মাজার বলতেই বিশাল এলাকা জুড়ে প্রকাণ্ড মাজার কমপ্লেক্স। সেখানে আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ে নিই। আমাদের হোটেল থেকে অতি দূরত্বে বিধায় হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত ১১টার কাছাকাছি হয়ে যায়।

ইমাম খোমেনী'র শোকসভায় অংশগ্রহণ

ইরানে ইমাম খোমেনীর ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আজকের (৩ জুন মঙ্গলবার) এই অনুষ্ঠানই প্রধান অনুষ্ঠান।

ইমাম খোমেনীর বিশাল মাজার কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। হোটেলে নিয়োজিত গাইডগণ আমাদেরকে সকাল ৮টার মধ্যে হোটেলের লবিতে চলে আসতে বলে রেখেছেন। ৮টার পরপরই আমরা নির্দিষ্ট বাসে উঠে পড়ি। আমরা ৮ জন বাংলাদেশী প্রথম বাসে উঠি। আমাদের বাসটি সামনের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে অপেক্ষমান থাকে।

আমার শারীরিকভাবে গ্যাসট্রিক-এর সমস্যা রয়েছে। দেশীয় ডাক্তারের পরামর্শ হল গ্যাসের সমস্যা না থাকলে গ্যাসট্রিকের ঔষধ না খাওয়ার জন্য। কিন্তু গত দুদিন

ইমাম খোমেনীর মাজার

থেকে ভাল লাগায় ঔষধ খাওয়া বন্ধ রাখি। গতরাত থেকে আবার গ্যাসের একটু একটু সমস্যা অনুভব করতেছিলাম। সকালে তা কিছুটা বেড়ে গেলেও আবার কমে যাবে মনে করে ঔষধ খাওয়া হয়নি। বাসে আরোহণ করে আমার পার্শ্বের সিটে বসা জাম্বিয়ার অতিথির সাথে আলাপকালে হঠাৎ গ্যাস উর্ধ্বমুখি হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যেমনটি ইতোপূর্বে দেশে আরো ২/৩ বার হয়েছিল। তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার সহযাত্রীগণকে জানিয়ে দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে যাই। বাসে আরোহিত অতিথিগণের অনেকে কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাদের বাসের দায়িত্বরত গাইড ২ জনের ১ জন আমাকে অনুসরণ করতে থাকে। বুকে হাত চেপে ধরে হোটেলের সম্মুখে যেতে না যেতেই হোটেলের গাইডরা আমাকে ঘিরে ধরে জানতে চায় আমার সমস্যা কি? তারা দ্রুত ডাক্তার ডেকে আনে। হোটেলের সামনের চত্বরে এ্যাম্বুলেন্স তৈরী থাকে তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিথিগণের জন্য দায়িত্বরত ডাক্তার আমার কাছে জানতে চায় হার্টের কোন সমস্যা কি না? আমি গ্যাসের সমস্যা বলাতে ডাক্তার বুঝতে পারছিলেন না। পরে এসিডিটি সমস্যা বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্যা বুঝতে পেরে দ্রুত ব্যাগ থেকে ২টি ট্যাবলেট বের করে আমাকে একসাথে খাইয়ে দেন। সাথে সাথে অন্য প্রকারের আরো একটি ট্যাবলেট খাইয়ে দেন। অতপর আমার দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ঔষধ খাওয়ার ২/৩ মিনিটের মধ্যে গ্যাস নেমে গিয়ে বক্ষ হালকা অনুভব করি। ডাক্তারকে আশ্বস্ত করে রুমে ফিরে যাই।

এ রকম দেশে আমার ২/৩ বার হয়েছিল। একবার মাগরিবের নামাজরত অবস্থায়। নামাজের নিয়ত ভেঙ্গে দ্রুত পার্শ্বস্থ ক্লিনিকে গিয়েছিলাম।

হোটেল কক্ষে কিছুক্ষণ বিশ্রামে থাকা অবস্থায় ভাবতে থাকি ইরান সরকার আমার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। আজকের অনুষ্ঠানটি প্রধান আকর্ষণ। কাজেই বিবেকের তাড়নায় আবার উঠে হোটেলের সম্মুখে গিয়ে দেখলাম সর্বশেষ তথা ৪র্থ বাসে গাইডগণসহ কয়েকজন অতিথি আরোহণ করছে। আমি তৎক্ষণাৎ বাসে উঠে পড়ি। আমাকে দেখে গাইডরা হতচকিত হয়, কিন্তু কিছু বলছেনা। শেষ বাসে উঠলেও বাস ৪টি একসাথেই যথারীতি সভাস্থলে যাবে।

বাসে উঠতে না উঠতেই ৪টি বাস একত্রে রওয়ানা হল। আমাদের হোটেল আল-বুরুজ পর্বতের অনেক উপরে। অপরদিকে, ইমাম খোমেনীর মাজার সমতল ভূমিতে তেহরান শহর অতিক্রম করে অপরপ্রান্তে অবস্থিত।

বাস চলা আরম্ভ করার সাথে সাথে ড্রাইভার গানের অডিও ক্যাসেট চালু করে দেয়। এতে শুনতে পাচ্ছিলাম কারবালার সংঘটিত হৃদয়বিদারক ঘটনার আলোকে হায় হোসেন, হায় হোসেন জাতীয় মর্সিয়া তথা শোক গাথা গজল। শিয়া-সুন্নীর বড় ব্যবধান থাকলেও আওলাদে রাসুল ও আহলে বাইতের প্রতি মোহাব্বত প্রদর্শনে কোন ব্যবধান নেই। বরং সেদিক দিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু ভিন্ন আক্বিদা বিশ্বাসী

অনুরূপ মোহাব্বতের ব্যাপারে কমতি রয়েছে। এ হায় হোসেন, হায় হোসেন হৃদয়বিদারী মর্সিয়াটি আমার হৃদয়ে দাহ করছিল।

গত ৩/৪ দিন সকাল-বিকাল রাষ্ট্রিয় অনুষ্ঠানাদিতে গমনাগমনকালে কোন গাড়ীর চালক অনুরূপ কোন অডিও ক্যাসেট চালু করেনি। মনে হয় বিদেশী অতিথিগণের অপছন্দ হবে মনে করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা ছিল।

কিন্তু এ বাসে আমিসহ কয়েক বিদেশী অতিথি বাদে অবশিষ্ট সকলে ইরানী হওয়ায় ড্রাইভার অডিও চালাবার সুযোগটি হাতছাড়া করেনি।

বিশাল এলাকা জুড়ে ইমাম খোমেনীর মাজার কমপ্লেক্স-এর নির্মাণ কাজ এখনো চলছে। গত ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে যেয়ারত ও মাজার কমপ্লেক্স ঘুরেফিরে দেখে মনে হয়েছিল এই মাজার কমপ্লেক্স নির্মাণ কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হবে – যার কাজ এখনো চলছে। এই মাজারের অভ্যন্তরেই অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শোকসভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আমাদের বহনকারী বাসগুলো আল-বুরুজ পর্বত থেকে নেমে শহরের সমতলে আসতে না আসতেই মাজার অভিমুখে গমনকারী অসংখ্য নারী-পুরুষকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মাজারের কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব থেকে রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ গাড়ী বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন লক্ষ্য করছিলাম।

মন্থরগতিতে আমাদের বাস মাজারের নিকটে আসলে প্রধান সড়ক থেকে পাশ কেটে শাখা সড়ক দিয়ে মাজারের প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সাধারণ ইরানী নর-নারীগণ প্রধান সড়ক দিয়ে সরাসরি মাজারপানে চলে যাচ্ছিল। মাজারের প্রধান সড়কের দু'পার্শ্বে উন্মুক্ত জায়গায় বাস ও অন্যান্য যানবাহন অবস্থান করছিল। মাজারের প্রধান গেটের নিকটে এসে আমরা বাস থেকে নেমে অতিথিগণের স্রোতের মধ্যে অগ্রসর হতে থাকি। নিরাপত্তাজনিত তল্লাশীর ব্যবস্থা সহকারে আগত অতিথিদেরকে সসম্মানে তল্লাশী চালাচ্ছিল। আজকের অনুষ্ঠানে হোটেল থেকে ক্যামেরা ও মোবাইল না আনার কথা বলে রেখেছিল। আমরা নিরাপত্তা তল্লাশী অতিক্রম করে মাজার কমপ্লেক্সে প্রবেশকালীন অতিথিদেরকে ছোট ছোট পানির বোতল সরবরাহ করছিল। মাজার কমপ্লেক্সে প্রবেশ করা মাত্র লক্ষ্য করলাম মাজারের একপ্রান্তে (সম্ভবত দক্ষিণ পার্শ্বে হবে) একটি সুউচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। মঞ্চের ২ পার্শ্বে গ্যালারীর মত করে অসংখ্য চেয়ার পাতা। কম করে হলেও হাজারের উপরে চেয়ার হবে। মঞ্চ সংলগ্ন কিছুটা নিচে দু'পার্শ্বে ১০/১২টি বিশেষ চেয়ার বসানো। মঞ্চের সম্মুখে নিচে দামী কার্পেট পাতা। মঞ্চের সম্মুখস্থ কার্পেট বিছানো জায়গা এবং উভয়পার্শ্বের চেয়ারগুলোকে বিশেষভাবে আলাদা বেষ্টনী দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে সাধারণ নর-নারী প্রবেশ করতে না পারে। আমরা (সম্ভবত) পশ্চিমের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে দেখি মঞ্চের দু'পার্শ্বে প্রায়

দুই-তৃতীয়াংশ চেয়ার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা যখন আসন গ্রহণ করি তখন বেলা ১০ ঘটিকা। মঞ্চ থেকে মাইকে ইরানের বিখ্যাত কবিগণ কবিতা আবৃত্তি করছেন। মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থাসহ মাজারের চতুর্দিকে মনে হয় লক্ষাধিক নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছে। মাজারের বাহিরেও কয়েক লক্ষ নর-নারীর সমাবেশ হয়েছিল বলে জানতে পারি। মঞ্চের সম্মুখস্থ কার্পেটে ইরানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সাবেক রাষ্ট্রপতি, তিন বাহিনী প্রধানরা উপবেশন করছিল। আমরা বিদেশী অতিথিগণ মঞ্চের দু'পার্শ্বের চেয়ারে বসেছিলাম। মঞ্চ সংলগ্ন কিছুটা নিচে বিশেষ চেয়ারগুলোতে মনে হয় ইমাম আলী খামেনীর পরবর্তী বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিগণ উপবেশন করেছেন। তাঁদের ভোটেই ইরানে ইমাম নিযুক্ত হয় বলে ধারণা লাভ করি।

মঞ্চ থেকে কয়েকজন কবিতা আবৃত্তির পর ১ জন ইমাম খোমেনীর শানে মরছিয়া পাঠ শুরু করেন। সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ নর-নারী বক্ষ (বুক) ছাপড়াতে থাকে এবং ইমাম খোমেনীর প্রতি শোকের মাতম প্রকাশ করছিল। এতে আমি ভীত হয়ে পড়ি। যেহেতু আমার চেয়ার বেষ্টনী সংলগ্ন। আমার পোষাক ও মাথায় ক্যাপ দেখে সহজেই বোঝা যায় আমি একজন সুন্নী এবং বুক চাপড়ায়ে মাতমে অংশগ্রহণ করছিনা। এতে যে কোন ইরানী হয়ত আবেগে আমার প্রতি খারাপ আচরণ করতে পারে এ ভয়ে।

মঞ্চের কিছুটা দূরত্বে দু'পার্শ্বে ছোট ছোট ২টি মঞ্চ তৈরী করে উত্তর মঞ্চে অসংখ্য টিভি ক্যামেরাযোগে অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করছিল। কিছুক্ষণ কবিতা ও কছিদা আবৃত্তির পর বেলা ১১টার দিকে মঞ্চে আসেন ইমাম খোমেনীর নাতি সৈয়দ হাসান খোমেনী। মাজার প্রাঙ্গণসহ তেহরানের বিভিন্ন এলাকায় ইমাম খোমেনী ও ইমাম আলী খামেনীর পার্শ্বে সৈয়দ হাসান খোমেনীর ছবি শোভা পাচ্ছিল বর্ণাঢ্য ব্যানার-ফেস্টুনসমূহে। এতে প্রতীয়মান হয় সত্তরোর্ধ ইমাম আলী খামেনীর পরবর্তী সৈয়দ হাসান খোমেনীই ইমাম হতে পারেন।

সৈয়দ হাসান খোমেনী মঞ্চের সম্মুখপানে আসার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানায় এবং স্লোগান দিতে থাকে। তিনি মাত্র ৮/১০ মিনিট বক্তব্য পেশ করেন।

অতপর ইমাম আলী খামেনীর নাম ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে সারা অনুষ্ঠানস্থলের সমবেত লক্ষ লক্ষ নর-নারী দাঁড়িয়ে গগণবিদারী স্লোগান দিতে থাকে। সাথে সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে মঞ্চের সম্মুখে এসে সমবেত সকলকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়। তাঁর সাথে সাথে হাসান খোমেনীও মঞ্চের সম্মুখভাগে এসে হাত নেড়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানায়। বয়স ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে মঞ্চের সম্মুখভাগে তাঁকে একটি চেয়ার দেয়া হয়। তিনি নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন না করা অবধি আপামর জনতা দাঁড়িয়ে থাকেন এবং স্লোগান চলছিল। স্লোগানে কয়েকটি ভাষার মধ্যে

একটি হল: "আল্লাহু আকবর–খামেনী রাহবার।"

ইমাম আলী খামেনী উপবেশন করার পর সকলে বসে পড়েন। হাসান খোমেনী মঞ্চ থেকে নিচে নেমে গিয়ে সম্মুখস্থ কার্পেটে সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. খাতেমীর পার্শ্বে বসে পড়েন।

ইমাম আলী খামেনী বিসমিল্লাহ ও দরুদ শরীফ পাঠ করে নিজ ভাষায় প্রায় আধঘন্টা ধরে বক্তব্য রাখেন। ফার্সি ভাষা পুরাপুরি বুঝতে না পারলেও তিনি যে ইমাম খোমেনীর কথা ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কথা বারেবারে বলছেন তা বুঝতে পারা যায়। ইমাম খামেনীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানেরও প্রায় সমাপ্তি বলা চলে। অতপর একজন শায়ের ইমাম খোমেনীর গুণকীর্তনসহ সালাম জানিয়ে গজল পেশ করেন।

আমরা মাজার কমপ্লেক্স ত্যাগ করে প্রধান গেটের দিকে চলে যাই। ঐদিকে সাধারণ লোকজনের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত ছিল। আমাদের প্রথম বাসে জাম্বিয়ার অতিথির পার্শ্বস্থ সিটটি খালি ছিল জানতে পেরে বাসে উঠে বসে পড়ি।

মাজার কমপ্লেক্সে প্রবেশকালীন বা বের হওয়ার সময় বাসের অনেক যাত্রী তথা বিদেশী মেহমান আমার কাছে সহানুভূতির সুরে জানতে চায় আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা। বিকেল বেলা হোটেলের গাইডগণও আমার শারীরিক অবস্থা জানতে চায়।

পরদিন মা'শাদ যাওয়ার পথে মেহেরাবাদ বিমানবন্দরে আফগানিস্তানের মহিলা অতিথি আমাকে দেখে এগিয়ে এসে আমার শারীরিক খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। বিদেশী অতিথিগণ এবং তেহরান সরকারের গাইডগণের আমার প্রতি সহানুভূতি দেখে আমার মন খুশিতে ভরে যায়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ইরানের বর্তমান নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আহমদীনেজাতকে চোখে পড়েনি। মনে হয় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। ইরানের শাসনতন্ত্র মোতাবেক মনে হয় অনুরূপ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির তথা সরকার প্রধানের উপস্থিতির বিধান নেই।

মা'শাদে যেয়ারত

মা'শাদ ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় খোরাসান প্রদেশের রাজধানী। খোরাসান প্রদেশের আয়তন বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ; ৩ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। মা'শাদ নগরী খুব বেশী পুরাতন নয়, কিন্তু এতে ঐতিহাসিক মর্যাদাপূর্ণ নিদর্শনাদি রয়েছে। হযরত ইমাম রেজা (র.)-এর মাজার হতে মা'শাদ নামকরণ করা হয়। ফারসী ভাষায় মা'শাদ শব্দের অর্থ হল শহীদত্ব। ২০৩ হিজরির (৮১৭ সাল) আগে মা'শাদ তুস নগরীর একটি অংশ ছিল। ৬১৭ হিজরিতে (১২২০ সাল) মোঙ্গলরা ইহা ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীতে পুনঃনির্মাণ করা হয়। কিন্তু ৭৯১ হিজরিতে (১৩৮৮ সাল) তৈমুরলং এর পুত্র মিরান শাহ এই নগরীকে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। তাই এতদঞ্চলের লোকজন অন্যত্র চলে যায়। পরবর্তীতে মা'শাদ অবশ্য উন্নত হতে শুরু করে। নাদিরশাহ-এর আমলে এই নগরীকে রাজধানী করা হয়। ফলে এই নগরীর আরো উন্নয়ন সাধিত হয়।

খাজারে বংশীয় রাজারা এই নগরীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। সাধারণত শিয়াগণের ইরানের পবিত্রতম স্থান হল এ মা'শাদ নগরী। বছরে কোটির উপর নর-নারী এ মা'শাদে এসে অবস্থান নেয় যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

খোরাসানের রাজধানী মা'শাদে শায়িত আছেন আওলাদে রসুল (স.) হযরত সৈয়দ ইমাম রেজা (র.)। শিয়াগণ নবী পাক (স.)-এর ওফাতের পর খেলাফতে বিশ্বাসী নয়, ইমামতে বিশ্বাসী এবং আওলাদে রসুলগণ থেকে নিয়ে ১২ জন ইমামে বিশ্বাসী। তৎমধ্যে হযরত ইমাম রেজা (র.) অষ্টম ইমাম। ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থানকালে ৬ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালার কাল ৪ জুন বুধবার শেষদিনের কর্মসূচী, যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মা'শাদ গমন, যেহেতু অতিথিদেরকে দেওয়া প্রোগ্রাম সিডিউলে তা উল্লেখ করা আছে।

আজ ৩ জুন বিকাল থেকে অতিথিগণ হোটেল লবির অতিথিগণের তদারকী তথা ব্যবস্থাপনা কাউন্টারে যোগাযোগ করতে থাকে কাল মা'শাদ গমনের সময়-সূচী জেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু গাইডগণের একই উত্তর, এখনো প্রোগ্রাম চূড়ান্ত হয়নি, হলে পরে জানিয়ে দেয়া হবে। এভাবে রাত পর্যন্ত চলতে থাকে।

আজ ৩ জুন সন্ধ্যায় প্রোগ্রাম সুপ্রিম কোর্টের স্পোকসম্যান-এর সাথে অতিথিগণের মতবিনিময় সভা এবং সাথে নৈশভোজ। উক্ত অনুষ্ঠান হবে আমাদের অবস্থান করা হোটেল মিলনায়তনে। উক্ত অনুষ্ঠানের পরও গভীর রাত অবধি অতিথিগণ গাইডদের

কাছ থেকে জানতে চায় কালকের মা'শাদ গমনের কর্মসূচীর কথা। তাদের একই উত্তর। তবে প্রকাশ হয়ে যায় যাদের ইরান ত্যাগের ফ্লাইট ৪ তারিখ রাতে বা ৫ তারিখ তাদেরকে মা'শাদ নেয়া হবেনা।

ইতোপূর্বেও উল্লেখ করেছি ইরানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে কয়েকদিনের ভিতর সিট পাওয়া দুষ্কর; ফ্লাইট অনুপাতে যাত্রীসংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে। আমরা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম ৪ জুন সরকারী ব্যবস্থাপনায় মা'শাদ গেলে পরে তথা হতে রাত্রে যথারীতি তেহরান না ফিরে মা'শাদে আরো ১ কিংবা ২ রাত থাকতে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। অতপর কেরমান ভ্রমণ অথবা তেহরান ফিরে আসব। কিন্তু তা সম্ভবপর হয়নি ফ্লাইটে সিট না পাওয়ার কারণে। বিদেশী অতিথিগণকে তদারককারী গাইডগণ সকালে জানিয়ে দিলেন যাদের ইরান ত্যাগের ফ্লাইট ৫ তারিখের পর তাদেরকে সকাল ৯ ঘটিকায় তৈরী হয়ে লবিতে চলে আসার জন্য, মা'শাদ গমনের উদ্দেশ্যে।

ইমাম রেজার মাজার কমপ্লেক্স

উল্লেখ্য, ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিদেশী অতিথিগণকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালায় তেহরানের বাহিরে একদিনব্যাপী প্রোগ্রাম রাখা হয় এবং তা হল তেহরানের ১৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে কোম শহরে অথবা ৯২৪ কিলোমিটার পূর্বে মা'শাদে। ইমাম রেজার এক বোন কোমে আছেন।

আমাদের বিদেশী অতিথিগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক শিয়া মতাবলম্বী। কাজেই নিশ্চিত, বিদেশী অতিথি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মা'শাদের প্রোগ্রাম

বাতিল করতে পারেনা। যেহেতু বিদেশ থেকে শিয়াগণের ইরান আগমনের উপলক্ষ ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী হলেও তাদের অন্যতম আগ্রহ মা'শাদ এর ইমাম রেজার যেয়ারত, তা কোনভাবে অস্বীকার করা যাবেনা। অবশ্য আমরা সুন্নীগণের হযরত ইমাম রেজার যেয়ারতের আগ্রহ কম তা কিন্তু নয়। আমরা সুন্নীগণেরও একজন মহান আওলাদে রসুলের যেয়ারত করতে অতি আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। গাইডগণের টেলিফোন পেয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম বিধায় কিছুক্ষণের মধ্যে লবিতে চলে আসি। সকাল ১০টার দিকে আমরা বাসে উঠে পড়ি। ফ্লাইট সিডিউলের কারণে অনেকে যেতে না পারায় ৩টি বাস আমাদের নিয়ে পুরানো বিমান বন্দর মেহরাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। বিমানবন্দর প্রবেশ করলে সকলকে সরাসরি বোর্ডিং কার্ড দিয়ে দেয়।

বিমানে আরোহণের গেইটের সামনে আমরা প্রায় চার শতের মত বিদেশী অতিথি ১০/১৫ মিনিট অপেক্ষার পর আমাদেরকে ৭৪৭ জাম্বো জেট বিমানে আরোহণ করানো হয়। প্রায় ১১:৩০টার দিকে বিমান আকাশপানে উড়াল দেয়। ইরান এয়ারের এ বিশাল বিমানটি আল-বুরুজ পর্বতের পাশ ধরে পূর্বদিকে এগুতে থাকে। বিমানের অভ্যন্তরে স্বাভাবিকের চেয়ে উন্নতমানের আতিথেয়তা করছে মনে হচ্ছিল। প্রায় সোয়া ঘন্টা যাত্রার পর আমাদের বহনকারী ইরান এয়ারের বিশেষ বিমানটি মা'শাদ বিমান বন্দরে অবতরণ করে। এরই মধ্যে বিমান বন্দরে মা'শাদ শহর এলাকার ৭টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস অপেক্ষমান ছিল। আমরা গাইডগণের দিকনির্দেশনায় বিমান থেকে নেমে বাসে উঠি। সমস্ত যাত্রী উঠে পড়ার পর ৭টি বাস সামনে-পিছনে পুলিশ ও এ্যাম্বুলেন্সসহ শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আধ ঘন্টার ব্যবধানে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হযরত ইমাম রেজা (র.)-এর বিশাল মাজার কমপ্লেক্সে পৌঁছে মাজার-এর প্রধান গেটের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব থেকে নিরাপত্তারক্ষী প্রস্তুত থাকায় অন্যান্য গাড়ী সরিয়ে দিয়ে আমাদের বাস বহরকে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ করে দেয় গেটের সম্মুখভাগে।

মাজার কমপ্লেক্সের কয়েকজন পিলগ্রিমস গাইড (Pilgrims Guide) আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যায়। কৌতূহলী হই একসাথে ৪ শতাধিক বিদেশী অতিথিকে কোথায় নিয়ে যাবে। কিভাবে ওজু, টয়লেট সারব ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু না–তাদের কাছে এর চেয়ে বড় কাফেলার একসাথে আয়োজন মামুলী ব্যাপার এবং তা স্বাভাবিক ও তারা এতে অভ্যস্ত। প্যান্টের সাথে কালো শেরওয়ানী পরিহিত বুকে ইংরেজিতে পিলগ্রিমস গাইড লেখা ১০/১২ জন স্বেচ্ছাসেবক আমাদের সেবায় তৎপর। মাজার কমপ্লেক্সের ভিতরে বিশাল এক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আমাদেরকে নিয়ে যায়। পার্শ্বস্থ কক্ষে মহিলা যেয়ারতকারীগণের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বিশাল কক্ষটি সংলগ্ন টয়লেটের সারি ও ওজু করার বেসিনের সারি। এতে তথায় ওজু করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি পা ধোয়া নিয়ে। যেহেতু মোজা খুলে বেসিনের উপর পা তুলে ধুতে হচ্ছিল। শিয়া

মতাবলম্বীরা ওজু করাকালীন পা ধোয় না। পায়ের উপরিভাগ মোছেহ করে মাত্র। গতবার (২০০৫ সালে) পা ধোয়া নিয়ে এ রকম বিব্রতকর অবস্থায় পড়িনি। এবার বারবার পা ধৌত করা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। যেহেতু স্থানীয়গণ শতভাগ শিয়া ও বিদেশী অতিথিগণের মধ্যে আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন সুন্নী মাত্র। ফলে বেসিনে পা তুলে ধুতে গিয়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে বাঁকাচোখে তাকিয়ে থাকে। এমনকি গতপরশু তেহরানের পুরাতন শহরে ইমামজাদা হাসান (র.) যেয়ারতের সময় মাগরিবের নামাজের উদ্দেশ্যে ওজু করাকালীন বেসিনে পা তুলে ধুতে দেখে এক বৃদ্ধ আমাকে ভর্ৎসনা করে। আমি তা নিরবে হজম করে যাই।

ওজু করে এসে বেলা ২টার দিকে তাড়াতাড়ি যোহরের ২ রাকাত কসর নামাজ পড়ে নিই। বিশাল অতিথিশালায়ও নামাজের জন্য একপার্শ্বে কারবালার মাটির টুকরা রাখা আছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদেরকে জুস, মিষ্টান্ন, খেজুর সরবরাহ করছিল। অতপর সেখানকার গাইডগণ আমাদেরকে নিকটস্থ এক বিশাল দালানের তৃতীয়তলায় নিয়ে যায়। দেখলাম কার্পেটের উপর দস্তরখানা পেতে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা আছে। একপাশে পর্দা দিয়ে মহিলা অতিথিদের জন্য আয়োজন করা রয়েছে। দালানটিও ব্যবস্থাপনা এত বিশাল যে, বিদেশী ৪ শত অতিথির একসাথে খাবার গ্রহণে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা হচ্ছেনা। খাওয়ার পর্ব সেরে দায়িত্বরত গাইডগণ আমাদেরকে হযরত ইমাম রেজা (র.)-এর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মূল মাজারের দিকে নিয়ে যায় এবং মহিলা যেয়ারতের এরিয়ার পিছনে মাজার শরীফ দেখা যায় মত স্থানে আমাদের বসিয়ে দেয়। গাইডগণ যেয়ারত পরিচালনা করে। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে যেয়ারত পর্ব শেষ হলে গাইডগণ আমাদেরকে বিশাল মাজার কমপ্লেক্স ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাতে থাকে। এরই মধ্যে প্রচার হয়ে যায় আমাদের তেহরান ফিরার বিশেষ ফ্লাইট রাত ১০:৩০টায়। আমাদেরকে মা'শাদ থেকে ৩০/৪০ কিলোমিটার দূরত্বে তূসে মহাকবি ফেরদৌসীর যেয়ারতে নিয়ে যাওয়া হবে না। তৎক্ষণাৎ আমি তেহরানের ও মা'শাদের প্রধান গাইডদের অনুরোধ করতে থাকি যেহেতু সময় আছে মহাকবি ফেরদৌসের যেয়ারতে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম রাখার জন্য। তাঁরা নিরবে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। ঢাকা থেকে যাওয়া আমরা ৮ জনের মধ্যে ২ জন প্রখ্যাত কবি। তারা নিজেরা কিছু না বলে আমাকে অনুরোধ করতে থাকে গাইডগণকে বলার জন্য যাতে আমাদেরকে মহাকবি ফেরদৌসীর মাজারে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল না করে।

আমরা আওলাদে রসুল হযরত ইমাম রেজা (র.)-এর মাজার যেয়ারত ও বিশাল কমপ্লেক্স ঘুরেফিরে দেখে ৪টার পর আমাদের মাজার কমপ্লেক্স সংলগ্ন যাদুঘর দেখাতে নিয়ে যায়। কয়েকতলা বিশিষ্ট উক্ত যাদুঘরে হযরত ইমাম রেজা (র.)-এর বহু জিনিসপত্র প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। যাদুঘরের একপার্শ্বে রয়েছে ইরানের খেলোয়াড়গণের অর্জিত আন্তর্জাতিক পুরস্কারসমূহ।

আগেই উল্লেখ করা আছে, শিয়া মতালম্বীগণ ইমামতে বিশ্বাসী এবং একমাত্র ইমাম অষ্টম ইমাম, ইমাম রেজা ইরানে শায়িত। কাজেই শিয়া খেলোয়াড়গণ তাদের অর্জিত মেডেলসমূহ তাদের ইমামের দরবারে উৎসর্গ করে। ঘন্টাখানেক যাদুঘর পরিদর্শনের পর আমাদেরকে বাসে উঠে পড়তে ঘোষণা দেয়া হয়। বাস শহর পেরিয়ে গ্রামের পানে যেতে থাকে। এতে নিশ্চিত হলাম আমাদেরকে মহাকবি ফেরদৌসীর মাজার যেয়ারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় ২৪/২৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর একটি বিশাল মার্কেট প্রাঙ্গণে আমাদের বাসগুলো জড়ো হতে থাকে এবং আমাদেরকে নেমে যেতে বলা হয়। তখন প্রধান গাইড ঘোষণা দিলেন যাদের কেনাকাটা প্রয়োজন তারা ইচ্ছা করলে এই মার্কেট থেকে কেনাকাটা করতে পারেন। এও বলা হল বিকেল ৭ ঘটিকায় অত্র প্রধান গেট-এর সামনে উপস্থিত হতে হবে। পৌণে ৬টায় আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে বাস অন্যত্র চলে যায়। মহাকবি ফেরদৌসীর মাজারে নিয়ে না যাওয়ায় আমার ব্যথিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সহযাত্রী ঢাকার কবিগণ আমার কাছে উক্ত কারণে হতাশা ব্যক্ত করছিলেন। উক্ত মার্কেটের মসজিদে আমরা আসরের নামাজ পড়ে নিই।

কয়েকতলা বিশিষ্ট এটি একটি ইরানের পূর্বাঞ্চলের প্রসিদ্ধ মার্কেট।

অন্যত্র পার্কিং থেকে বাস আসলে পরে অতিথিগণ সকলে বাসে উঠে পড়লে বাস ছাড়তে ছাড়তে ৮টা বেজে যায়। ৭টি বাস একত্রে ছেড়ে দিয়ে পথে পথে যানজটে পড়ছিল। এতে মাগরিব ওয়াক্ত পার হয়ে সন্ধ্যা ৯ ঘটিকা পেরিয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসায় বাসের ভিতর বোতলের পানি দিয়ে ওজু সেরে মাগরিবের নামাজ পড়ে নিই।

মা'শাদ শহরে প্রবেশকালীন বড় রাস্তা সংলগ্ন একটি বিশাল হোটেলের সামনে আমাদের বাসগুলো থেমে যেতে থাকে, আমাদেরকে বাস থেকে নেমে হোটেলে প্রবেশ করে রাতের খাবার গ্রহণ করতে বলা হয়। ৫ তারকা মানের এ হোটেলটির নিচতলায় বিশাল ডাইনিং রুমে আমাদের জন্য রাতের খাবার তৈরী করা ছিল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে রাতের খাবার শেষ হয়। রাত প্রায় ১০টার দিকে আমাদের বহনকারী বাসের বহর এয়ারপোর্টের দিকে এগুতে থাকে। আমরা এয়ারপোর্টের সম্মুখে পৌঁছামাত্র বাস থেকে নেমে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে নিচ্ছিলাম। অতপর তল্লাশী শেষ করে অপর প্রান্তে চলে যাই। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ইরানী এয়ারের ৭৪৭ বিশাল বিমানটি মা'শাদ বিমানবন্দরে অপেক্ষমান ছিল। বিমানে আরোহণ করে আকাশে উড়াল দেওয়ার পর বিমানের অভ্যন্তরে যথারীতি খাবার সরবরাহ করা হয় যা ছিল অপ্রয়োজনীয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে আমরা তেহরানস্থ মেহেরাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছি। এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবন পার হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ ও এ্যাম্বুলেন্স সহকারে এস্তেকলাল, লালেহ ও ফেরদৌসী – তিন হোটেলের অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বাসগুলো যথারীতি অপেক্ষমান ছিল।

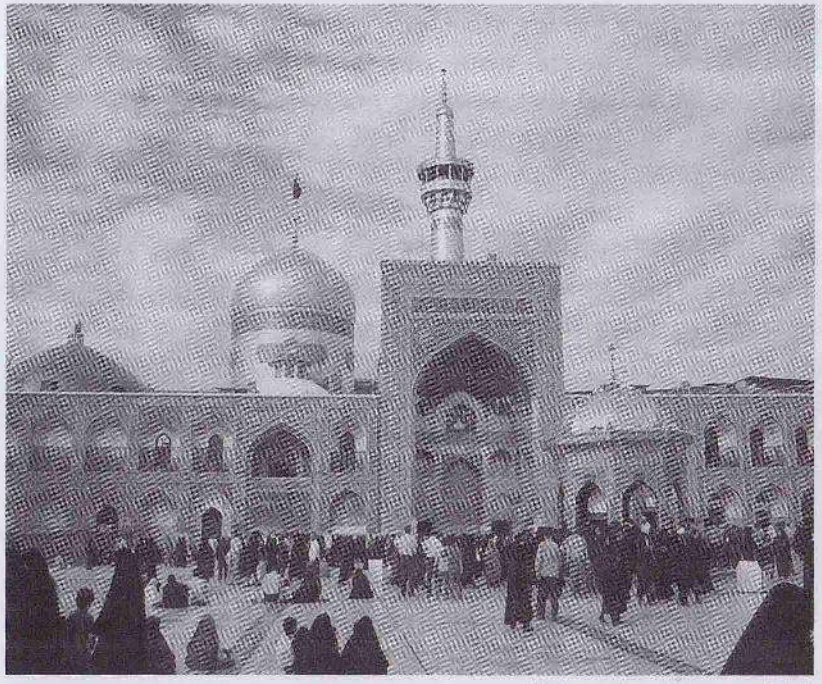

ইমাম রেজার মাজারের সম্মুখভাগ

আমরা নির্ধারিত এস্তেকলাল হোটেলের বাসে উঠে যাই। রাত ১টার পরপর আমরা এস্তেকলাল হোটেলের সম্মুখে পৌঁছতে সক্ষম হই।

যাওয়া-আসাসহ প্রায় ১৪/১৫ ঘন্টার এই যেয়ারতের সফরটি খুবই সুন্দর সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ৪ শতের অধিক বিদেশী অতিথিগণকে ইরানী কর্তৃপক্ষ সসম্মানে এ রকম একটা ট্যুর করিয়ে আনা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মহাকবি ফেরদৌসীর মাজার যেয়ারতকে পাশ কাটিয়ে একটি মার্কেটে অতিথিদেরকে ঢুকিয়ে দিয়ে সময় নষ্ট করা সংকীর্ণতার পরিচয় মনে করি।

৬ দিনব্যাপী ইরান সরকারের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালার ১ম দিন বাদে অবশিষ্ট ৫ দিনের অনুষ্ঠানমালায় আজকের এই ট্যুর প্রোগ্রামটি খুবই সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানে বহু বিষয়ে যেমনি নামের পরিবর্তন এসে যায় তেমনি হোটেলগুলোর ক্ষেত্রেও। তেহরানসহ ইরানের সর্বত্র মানসম্পন্ন হোটেলগুলোতে মানের কোন কমতি নেই। হোটেল লবি, কক্ষসমূহ, রেস্টুরেন্টসমূহে খাবারের মানসহ সবকিছুতে যথাযথ মানের দিকে যত্নবান লক্ষ্য করা গেছে।

সমগ্র ইরানে শালীনতা রক্ষা করে মহিলা সমাজ যেমনি তৎপর তেমনি হোটেলগুলোর রিসিপশনে, রেস্টুরেন্টসমূহে সকাল বেলা কক্ষগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় মহিলাগণের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করার বিষয়। হোটেলগুলোতে শুধু একটা জিনিস ব্যতিক্রম, আর তা হল মদসহ অশালীন কিছুই নেই। তবে ৫ তারকামানের এ হোটেলেও পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও ফার্সি বাদে আরবী বা ইংরেজিতে পারদর্শী নয়।

আজ দিবাগত রাতের মধ্যদিয়ে আমাদের সরকারী আতিথেয়তা শেষ হচ্ছে। কাল ৫ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা এ হোটেল থেকে সরাসরি অভ্যন্তরীণ বিমানযোগে কেরমানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাব। কেরমানে ২ দিন অবস্থান করে ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আজারবাইজানের রাজধানী তাবরীজ ও উরুমাইয়া সফর করার এবং ১২ জুন বৃহস্পতিবার ভোরে ১০ দিনের জন্য তুরস্কের সফরে তেহরান থেকে ইস্তাম্বুল যাওয়ার প্রোগ্রাম রয়েছে।

তেহরানে ব্যতিক্রমধর্মী দু'টি পার্ক

বিশ্বের যে কোন দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বিনোদনের জন্য পার্ক না থাকাটা অস্বাভাবিক। এমনকি আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জেলা শহরগুলোতেও ছোট ছোট পার্ক রয়েছে।

উন্নত বিশ্বে দেশগুলোতে বিশাল বিশাল নামকরা পার্কসমূহ রয়েছে। গত জুনে ২ সপ্তাহের জন্য ইরান সফরকালে রাজধানী তেহরানের একটি পার্কে গিয়ে কেন জানি ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল। গত ৩০ মে ইরান গমন করে ৪ জুন বুধবার পর্যন্ত সে-দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ইস্তেকলাল হোটেলে অবস্থান করেছিলাম। এরই মধ্যে জানতে পারি আমাদের অবস্থান করা অত্র হোটেলের কাছাকাছি তেহরানের বিখ্যাত মিল্লাত পার্ক। ৪ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে অবস্থানপূর্বক রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীসমূহ শেষ হওয়ার পর ৫ জুন বৃহস্পতিবার স্বউদ্যোগে বিকেল ৬টার ফ্লাইটে তেহরান থেকে কেরমান যাওয়ার প্রোগ্রাম। কাজেই সকালবেলা সময় হাতে থাকায় হোটেল থেকে একাকি বের হয়ে পড়ি মিল্লাত পার্কের উদ্দেশ্যে।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের অবস্থান করা ইস্তেকলাল হোটেলটি বিখ্যাত আল-বুরুজ পর্বতের বহু উপরে অভিজাত এলাকায়। তেহরানের মূল শহর সমতল ভূমিতে। সমতল ভূমি থেকে সম্প্রসারিত হতে হতে আল-বুরুজ পর্বতের বহু উপরে চলে গেছে তেহরান মহানগর।

সকালবেলা হোটেলে নাস্তা সেরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি মিল্লাত পার্কে যাব এই উদ্দেশ্যে। প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে অভিষ্ট মিল্লাত পার্কে পৌঁছে যাই সকাল ১০টার দিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম বড় রাস্তা থেকে মিল্লাত পার্কের এরিয়া শুরু হয়েছে। রাস্তা থেকে মাত্র ৪০/৫০ মিটার দূরত্বে পার্কে প্রবেশ তথা পাহাড়ের দিকে উঠার জন্য বড় বড় সিঁড়ি করে দেয়া হয়েছে। সিঁড়ির ২ পার্শ্বে কম করে হলেও ১২/১৪টি ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছিল। পার্কে প্রবেশের জন্য বড় কোন গেইট চোখে পড়েনি। প্রবেশের জন্য টিকেটের ব্যবস্থা নেই; উন্মুক্ত পার্ক।

ইরানের বিভিন্ন শহরে প্রধান প্রধান চৌরাস্তার মধ্যখানের ট্রাফিক আইল্যান্ডে বড় বড় ভাস্কর্য চোখে পড়বেই। এ সকল ভাস্কর্য ইরানের বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বগণের, যাদের নিয়ে ইরান গর্ব করে। তৎমধ্যে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী অন্যতম।

কিন্তু এ মিল্লাত পার্কের প্রধান প্রবেশদ্বারে দু'পার্শ্বে পরপর সারিবদ্ধভাবে ১২/১৪টি বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিগণের মূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য ভাবতে থাকি। তেহরানের আবহাওয়া

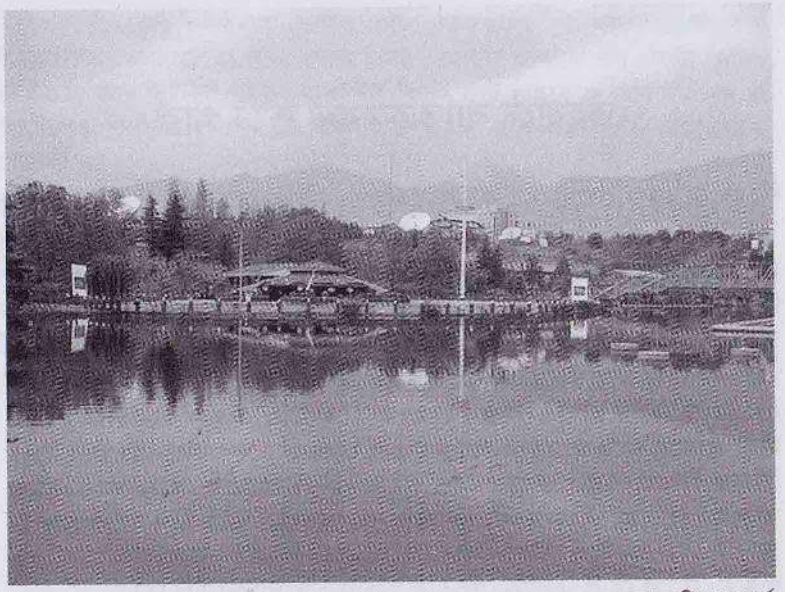

তেহরানে মিল্লাত পার্ক

মনোরম, শীতের শেষ গরমের প্রারম্ভ। হাতে সময় আছে, কোন তাড়া নেই। উক্ত ভাস্কর্য বা স্ট্যাচুগুলো দেখে দেখে পার্কের অভ্যন্তরের দিকে চলতে থাকি। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম পার্কের অভ্যন্তরে পাহাড়ের ভিতর একটি বড় লেক। সেখানে বিনোদনের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

আরো কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম ছোটখাট একটি চিড়িয়াখানা। বিশাল পার্কটির যেদিকে যাই বড় বড় গাছের ছায়ায় আবৃত। নিচে বর্ণিল ফুলের বাগান। অবসর বিনোদনে বসার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সকাল বেলা পার্কে আসা লোকজনের সংখ্যা কম থাকাটা স্বাভাবিক, তারপরও অসংখ্য নর-নারী চোখে পড়ছিল। পার্কে ঘুরাফেরা করতে থাকলেও প্রবেশমুখে ইরানের বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বগণের ভাস্কর্য স্থাপনের কারণ ভাবতে থাকি। কিছুক্ষণের ব্যবধানে পুনরায় বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রবেশমুখে ফিরে আসতে থাকি। এবং আবারও ভাস্কর্যসমূহ দেখতে থাকি জানার আগ্রহ নিয়ে। তথায় দুই পার্শ্বে স্থাপিত ভাস্কর্যসমূহ নির্ণয়ের জন্য দেখতে থাকি। বুঝতে ও নির্ণয় করতে চেষ্টা করি কোন্‌টি কার প্রতিচ্ছবি।

মূলত ইরানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে-দেশের বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বগণের প্রতিচ্ছবির ভাস্কর্যগুলো এ বিখ্যাত পার্কের প্রবেশমুখে প্রতিস্থাপনের অন্যতম কারণ মনে করি জনগণ ভাববার, জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার লক্ষে। কালজয়ী ব্যক্তিগণের অবদান

স্মরণ ও স্মৃতিকে চিরজাগরুক তথা মানসপটে সংরক্ষণের জন্য।

ঐ সমস্ত লোকজনই পার্কে যাবে–যাদের হাতে কমবেশী সময় রয়েছে। ব্যস্ততার মধ্যে সহজে কেউ পার্কে যেতে চাইবেনা। মনে করি মিল্লাত পার্ক যেহেতু তেহরানের একটি বিখ্যাত পার্ক অতএব, এখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইরানের বিশ্বখ্যাত এ সকল কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি তথা মন্যুমেন্ট স্থাপন করে রেখেছে, যাতে পার্কে প্রবেশকালে ধীরস্থিরভাবে এসব প্রতিকৃতি দেখে নিয়ে তাঁদের স্মরণ করে স্মৃতিপটে বহুবিধ প্রতিভা সম্পর্কে ভাবতে পারবে।

পার্কের প্রবেশদ্বারে যাঁদের প্রতিকৃতি রয়েছে তাঁরা হলেন : ***Saadi*** (শেখ সাদী) ***(Poet)*** ১২১৩-১২৯৫, ***Mohlasham Kasham (Poet).....*** ১৫৮৭, ***Nimayoshij (Poet)*** ১৮৯৫-১৯৫৯, ***Hafez*** (হাফেজ সিরাজি) ***(Poet)*** ১৩২৬-১৩৯০, ***Kamal-Al-Molk (Painter).....*** ১৯০১, ***Rodaki (Poet, Musician)*** ৮৩৯-৯১৬, ***Naser Khasru (Poet)*** ১০০৪-১০৮৮, ***Razi*** (ইমাম রাজী) ৮৬৫-৯২৫, ***Khaja Abdullah Ansari (Philosopher)*** ১০০৬-১০৮৮, ***Vehshibafghi (Poet).....*** ১৫৮৩, ***Shahriar (Poet)*** ১৮৬৬-১৯৪৮, ***Atarnyshboury (Poet & Philosopher)*** ১১৪৫-১২২১, ***Ibn-Sina*** (ইবনে সিনা) ***(Philospher)*** ৯৬২-১০১৮, ***Hakim Abdghasem Ferdowsi (Poet)*** ৯৩৫-১০২৫।

উক্ত মিল্লাত পার্ক থেকে দুপুরের দিকে হোটেলে ফেরার পর তেহরানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোলকার-এর সাথে ৭ জুন শনিবার বিকেলে তেহরানের আর এক প্রসিদ্ধ Taighitarie পার্ক-এ যাই। এই পার্কটি তেহরানের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পার্কের মধ্যে অন্যতম। বিকেলবেলা বিধায় পার্কটিতে দর্শনার্থীতে ভরপুর দেখতে পেলাম। ১৩০ বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনকে কেন্দ্র করে এই পার্কটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পার্কটিতে মিল্লাত পার্কের মত বড় বড় ছায়াদার গাছের সংখ্যা কম। তুলনামূলকভাবে ফুলের বাগানের আধিক্য পরিলক্ষিত হল। পার্কের একস্থানে যে কেউ ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে গেলে সাথে সাথে অল্পক্ষণের ব্যবধানে ফুলের নির্যাস পানীয় অথবা আতর তৈরী করে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও অতি উন্নতমানের গোলাপজল অথবা আতর সহজলভ্য।

তাদের দাবী, আব্বাসীয় সরকারের আমলে পারস্য থেকে নানা রকম গোলাপজল ও আতরসমূহ মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাওয়া হত। তাদের এও দাবী, পারস্যের গোলাপজল ও আতর বিশ্বে অদ্বিতীয়। পার্কের অভ্যন্তরে হাজার হাজার দর্শনার্থীর বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। তেমনি নানান খেলাধুলা তথা বিনোদনের আয়োজন রয়েছে।

ইরানে নিরাপত্তার অভাব নেই বিধায় পার্কগুলোতে সন্ধ্যার পরও লোকজন থাকে। অনেকে রাতের খাবার পার্কস্থ রেস্টুরেন্টসমূহে খেয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

তেহরান থেকে কেরমান

ইরানের একটি প্রদেশের নাম কেরমান। প্রদেশটির প্রাদেশিক রাজধানীর নামও কেরমান। কেরমানের অবস্থান তেহরানের দক্ষিণ-পূর্বদিকে। তেহরান থেকে কোম হয়ে কেরমানের দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটারের কিছু বেশি।

কেরমানে শায়িত আছেন বিশ্বখ্যাত মহান অলি হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ ও ইমাম রেজার ভাই ইমামজাদা শাহ হোসাইন (র.)। কেরমানে আরো রয়েছে প্রাচীন বহু মাটির কিল্লা ও পুরাকীর্তিসমূহ। কেরমান তথা এ অঞ্চলে গরমের আধিক্য বেশী। ফলে একালেও মানুষ মাটির গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করছে।

কেরমান শহরে অনেক পুরাতন স্থাপনা রয়েছে। তৎমধ্যে গঞ্জে আলী খান সাকার স্কয়ার, গঞ্জে আলী খান বাজার, কেরমান ফ্রাইডে প্রেয়ার মসজিদ অন্যতম। সেকালের এ সকল স্থাপনা ইস্পাহানের শাহ আব্বাসের স্থাপনার সাথে তুলনা হবার নয়। যদিও কেরমানবাসীদের জন্য দর্শনীয় স্থাপনার মধ্যে অন্যতম।

৪ জুন বুধবার পর্যন্ত আমরা ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে তেহরানস্থ ইস্তেকলাল হোটেলে অবস্থানরত ছিলাম। আজ ৫ জুন বিকেল ৬টায় ইরানের বেসরকারী বিমান সংস্থা মাহান এয়ারযোগে কেরমান রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম। ২ রাত কেরমানে থেকে ৭ জুন শনিবার ভোর ৬টায় একই এয়ারের ফ্লাইটে কেরমান থেকে তেহরান আসার প্রোগ্রাম।

রাষ্ট্রীয় ইরান এয়ারের পাশাপাশি ৭/৮টি বেসরকারী এয়ারলাইন রয়েছে ইরানে। এ সকল প্রাইভেট এয়ারলাইনের মধ্যে কোন কোনটিতে ৫/৭টি বা আরো অধিক এয়ারক্রাফট রয়েছে। এয়ারক্রাফটগুলোর মধ্যে বড় বড় এয়ারবাস এবং ৭৪৭ বোয়িংও রয়েছে।

তেহরানের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাংলাদেশী মি. দেলোয়ার হোসেন অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে কেরমান যাওয়া-আসার এ টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কেরমান থেকে ফিরে তাবরীজ যাওয়া-আসার জন্য তিনি কোন টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এতে মনের গভীরে চিন্তা থেকে যায় তাবরীজ যাওয়া-আসা নিয়ে।

জ ৫ জুন বৃহস্পতিবার হোটেল লবীতে বিদেশী অতিথিগণকে তদারকীর ইডগণকে জানিয়ে রাখি আমরা হোটেলে দুপুরের খাবারের পর তাদের তদারকী

প্রাচীন রায়েন শহরের অংশ

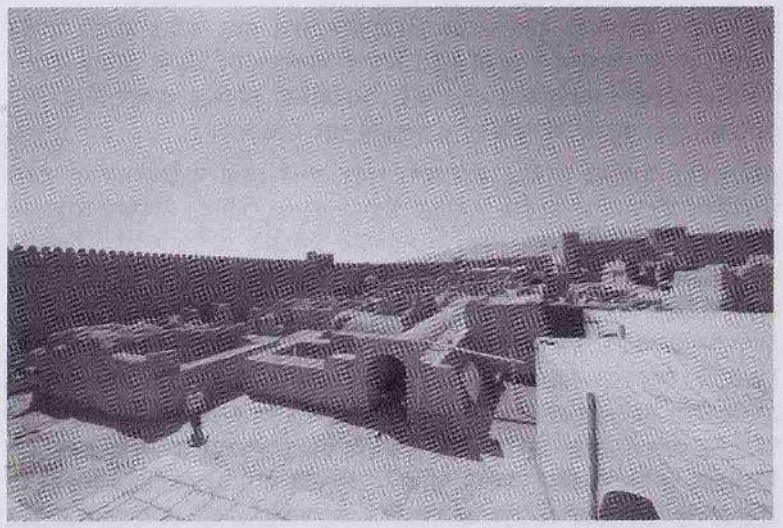

থেকে মুক্ত হয়ে স্বউদ্যোগে কেরমান চলে যাব। অতএব, আজ বিকেল থেকেই আমরা রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে আর অন্তর্ভুক্ত নই। আজ থেকে ১১ তারিখ দিবাগত রাত পর্যন্ত এ এক সপ্তাহ আমাদের নিজস্ব খরচে আমরা ইরানে অবস্থান করব।

সকালে মিল্লাত পার্কে ঘুরাফেরার পর দুপুরে হোটেল রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে গিয়ে নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল। খাবার গ্রহণকারী অতিথির সংখ্যা খুবই নগণ্য। অর্থাৎ গত রাত আর আজ সকাল থেকে বিদেশী অতিথির মধ্যে অধিকাংশের ফ্লাইট থাকায় তাঁরা স্বদেশের পথে রওনা হয়ে গেছেন।

বিকেল ৬টায় মেহেরাবাদ বিমানবন্দর থেকে আমাদের কেরমান যাওয়ার ফ্লাইট হলেও আমরা দুই/আড়াই ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে চলে যাই। আগে পৌঁছার উদ্দেশ্য বিমানবন্দর থেকে তাবরীজ যাওয়া-আসার টিকেটপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালানো।

সম্প্রতি মেহেরাবাদ বিমানবন্দরের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় তারা প্রাইভেট এয়ারলাইন ও ইরান এয়ার তথা সরকারী এয়ারলাইনের মধ্যে টার্মিনাল ভাগ করে ফেলেছে। আমরা বেসরকারী বিমানের যাত্রীরা ৪নং টার্মিনালে চলে যাই। প্রাইভেট এয়ারলাইনগুলোর প্রতিটি কাউন্টারে প্রচেষ্টা চালাই ৭/৮ তারিখ তাবরীজ যাওয়ার টিকেটের জন্য। ব্যর্থ হয়ে ইরান এয়ারের ২নং টার্মিনালে যাই গাড়ী নিয়ে; ইরান এয়ারেও ব্যর্থ হই।

অনন্যোপায় হয়ে ১২ জুন মঙ্গলবার ১০টার ফ্লাইটে তাবরীজ থেকে তেহরান আসার জন্য টিকেট খরিদ করি ইরান আসেমান এয়ারলাইনের। আসেমান তথা আসমান

ফার্সি শব্দ। যথাসময়ে বৃহদাকারের এয়ারবাসে প্রায় দেড় ঘন্টার যাত্রার মাহান এয়ারে আমরা কেরমান রওয়ানা হই। বিমান আকাশপানে উড়াল দেয়ার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মরুভূমিতে এসে যাই। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকায় নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমরা মরুভূমির পর মরুভূমি পার হতে থাকি।

এক পর্যায়ে ইরানের সর্বোচ্চ দামাভান্দ পর্বত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সাদা বরফ আচ্ছাদিত ইরানের এ সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা ৫৬৭১ মিটার। দীর্ঘক্ষণ আমাদের বহনকারী এয়ারক্রাফট শত শত কিলোমিটার মরুভূমি অতিক্রম করে কেরমান শহরের নিকটে এলে কিছুটা জনবসতি পরিলক্ষিত হয়। বিমানে কয়েকটা সিট বাদে যাত্রীতে পরিপূর্ণ। খাবার মান ইরান এয়ারের মত উন্নত নয়। যথাসময়ে কেরমান বিমানবন্দরে অবতরণের পর বিমানবন্দরে ট্যুরিস্ট কাউন্টার পেলাম না। ইরানের কেরমান অঞ্চলে ইরানীরা তেমন একটা আসেনা। ইরানে বিদেশী ভ্রমণকারীর সংখ্যা খুবই কম। তবে ইরানীরা ভ্রমণ-পিপাসু। তারা যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মাশাদ এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ইস্পাহান-সিরাজ গমন করে। ফলে ইস্পাহান ও সিরাজ বিমানবন্দরে ট্যুরিস্ট কাউন্টার রয়েছে, কেরমানে তা নেই। বিমানবন্দর কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে মানসম্পন্ন একটি হোটেলে চলে যাই টেক্সী নিয়ে। হোটেলটির নাম আকাভান হোটেল। হোটেলটির মালিকের ভাই ভাল ইংরেজি জানায় আমাদের সুবিধা হয়।

সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব এক কক্ষে এবং আমি অপর কক্ষে ২ রাতের জন্য অবস্থান নিই। হোটেল মালিকের ভাইয়ের সাথে রাত্রে বিস্তারিত আলোচনা করি কেরমানের যেয়ারত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ নিয়ে। তিনি তাঁর হোটেলে রক্ষিত ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন গাইড বই দেন উদার মনে। তাঁদের হোটেলটি মানসম্পন্ন বিধায় সকালের চা-নাস্তার ব্যবস্থা রেখেছে কক্ষ ভাড়ার সাথেই। ইরানের হোটেলগুলো নিজেরাই থ্রী স্টার, ফোর স্টার, ফাইভ স্টার দাবী করেনা। হোটেল দেখে এবং ভাড়া বুঝে নির্ণয় করতে হয়। অপরদিকে তুরস্কে তার ব্যতিক্রম।

কাল ৬ জুন সারাদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে হোটেল রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে নিই। কেরমান তেহরান থেকে সময়ের ব্যবধান প্রায় আধ ঘন্টা আগে। যেমনটা মা'শাদেও। কেরমানের আবহাওয়া গরম; তাপমাত্রা তখন ৩৪ ডিগ্রী থেকে ৩৬ ডিগ্রী উঠা-নামা করছিল। প্রাদেশিক রাজধানী শহর হলেও শহরটি অতি বড় নয়। সবুজের সমারোহ তুলনামূলকভাবে কম। তবে অন্যান্য বিমানবন্দরগুলোর মত কেরমান বিমানবন্দর রাস্তায় বড় বড় গাছ-গাছালীতে ভরপুর। কেরমান হয়ে ইরান থেকে পাকিস্তান যাওয়া-আসার বড় সড়ক রয়েছে। কেরমানের পর চিস্তান প্রদেশ সংলগ্ন পাকিস্তান সীমান্ত। অপরদিকে, খোরাসান সংলগ্ন আফগানিস্তান সীমান্ত। কেরমান থেকে পূর্বদিকে পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত জনবসতি তুলনামূলক কম, মরুপ্রবণ অঞ্চল।

কেরমানে হযরত নেয়ামত উল্লাহ অলির যেয়ারত

বিশ্বখ্যাত হযরত নেয়ামত উল্লাহ অলি ইরানের কেরমান প্রদেশে শায়িত। কাশ্মীরের হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ অলিও কেরমানে শায়িত হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ অলি একই দরবেশ না কি ভিন্ন তা জানতে পারা যায়নি। অতএব, ধরে নেয়া যায় ইনিই কাশ্মীরের শাহ নেয়ামত উল্লাহ অলি, যিনি কেয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্লোকগাথা ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যার বাস্তবতা পরিলক্ষিত হতে চলছে।

কেরমান থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে মাহান নামে ছোট শহর। যদিওবা শহরটি ছোট কিন্তু এ শহরের গুরুত্ব অত্যধিক। যেমনি এ মা'হান শহরে হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওলি শায়িত তেমনি ইরানের বিখ্যাত প্রিন্সেস গার্ডেন এ ছোট শহরে অবস্থিত।

ইরানের একটি বিখ্যাত পর্বতের পাদদেশে এ শহরের অবস্থান। এ শহরের প্রিন্সেস গার্ডেন তথা বাগ-ই-শাহজাদীর প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা ইরানের বিখ্যাত। এ বাগানের প্যালেসসমূহ প্রাচীনকাল তথা "খাজার"দের শাসনামলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নানান রং-বেরং এর ফুলের বাগানে ভরপুর। বর্তমানে ইরানের ভ্রমণপিপাসু নর-নারীতে মুখর থাকে। ইরানের ৭/৮টি বেসরকারী বিমান সংস্থার মধ্যে মাহান অন্যতম একটি। মনে হয় ঐতিহাসিক মাহান শহরের নামকরণে মাহান এয়ার করা হয়েছে।

যেয়ারতের বিবরণ : ৬ জুন শুক্রবার সকালে কেরমান হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে আমরা টেক্সিযোগে মাহান পেরিয়ে কেরমান থেকে প্রায় ১১০ কি. মি. দূরত্বে প্রাচীন শহর রায়েন-এ যাই। যাওয়ার পথে ঘন্টাখানিক সময় নিয়ে শাহজাদী গার্ডেন ঘুরেফিরে দেখে নিই। অতপর রায়েন-এর দিকে যেতে থাকি। হেজার পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এ অঞ্চলটি ইরানের প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। আমরা সকাল ১০টার পরপর সেখানে পৌঁছে যাই। শহরটি অত্যধিক ভূমিকম্পপ্রবণ। প্রাচীন রাজকীয় কিল্লাটির দেয়াল যেমন মাটির তেমনি কিল্লার অভ্যন্তরে প্রাসাদসমূহও মাটির। প্রাসাদসমূহ একতলা ও দ্বিতল বিশিষ্ট। মাটির ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে গরম অনুভব হয়না। তা সেকালের রাজা-বাদশাহগণ অনুভব করেই এ মাটির ঘরসমূহ নির্মাণ করেন। এ শহরে অসংখ্য মাটির ঘর রয়েছে। ঘরের ছাদ তথা মাটির ছাদের উপর এক প্রকার প্রলেপ দেয়া হয়েছে যাতে

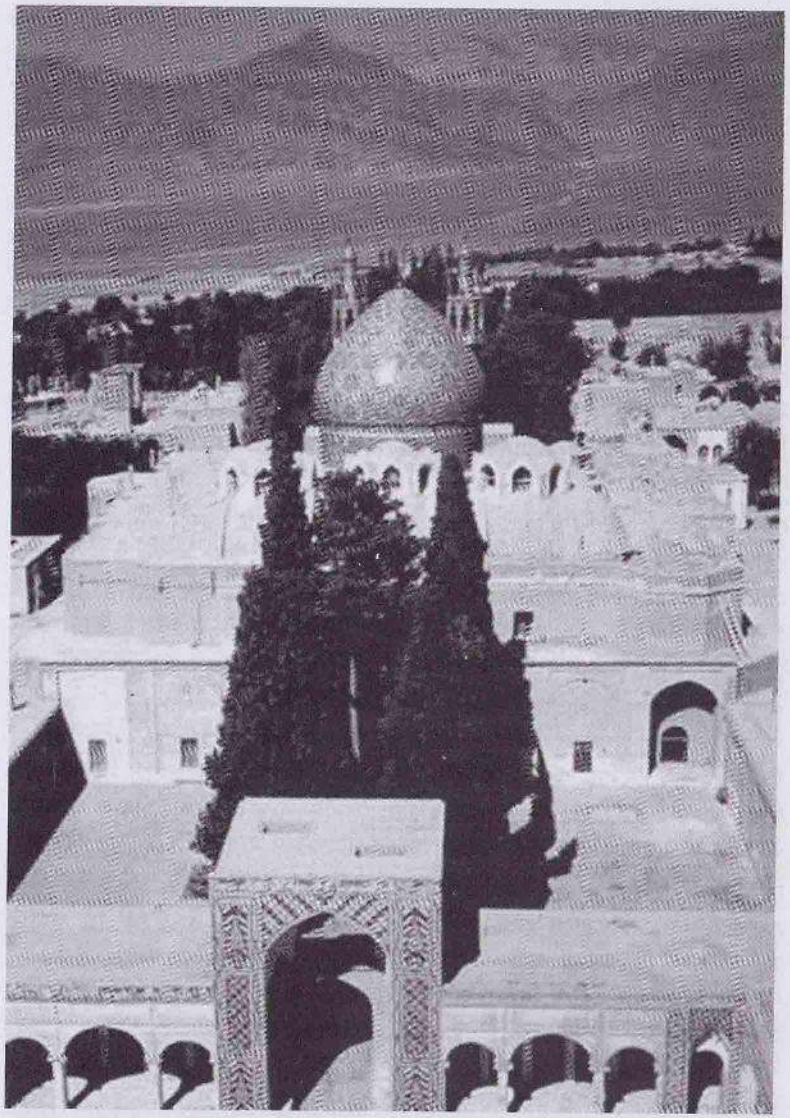

হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ অলী (রহ.)-এর মাজার

হালকা বৃষ্টিপাতে ক্ষতি না হয়। ঐসব এলাকায় বৃষ্টিপাত তুলনামূলক কম বলে জানতে পারি। সরকার সেচের মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা করে গাছ-গাছালি লাগিয়ে সবুজের সমারোহ করেছে।

ইরানী পরিবারের জীবনযাত্রা দেখতে তথাকার একটি মাটির ঘরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের টেক্সিচালক ও গাইড তাতে রাজি হয়নি, তারা কিছু খারাপ মনে করবে এই ভেবে। কিন্তু আমরা বিদেশী ভ্রমণকারী তাদের মাটির ঘরের জীবনযাত্রা দেখতে আগ্রহী একথা প্রকাশ করলে তারা খারাপ মনে না করে বরং খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু চালক তথা গাইডের অনীহার কারণে তা স্বচক্ষে অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখার সুযোগ হয়নি।

এ শহরের অধিবাসীদের ধনী বলে মনে হলনা। তারা ব্যবসার চেয়ে কৃষি-নির্ভর বলা চলে। সমগ্র ইরানে মরুপ্রবণ অঞ্চল বাদে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা রয়েছে যার সুবাদে ইরানের অধিবাসীগণের বড় অংশ কৃষি-নির্ভরশীল বলতে পারি। এ রায়েন এলাকাও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা এ শহরে একটি রেস্টুরেন্টে চা-নাস্তা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে কেরমানের পথে মাহান-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। দুপুর ১টার দিকে মাহান পৌঁছে হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ অলির মাজার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি।

হযরত নেয়ামত উল্লাহ ওলির একজন মুরীদ তথা শিষ্য ছিলেন দিল্লীর নবাব যার নাম আহমদ শাহ দাফনি। তিনি ভারতবর্ষ থেকে মাজার নির্মাণের নিমিত্তে প্রচুর টাকাকড়ি পাঠান। দিল্লীর বাদশার অর্থে ঐ বিশ্ব অলীর বিশাল এরিয়া জুড়ে মাজার কমপ্লেক্সটি মাটি দ্বারা নির্মিত। বিশ্বের বুকে মাটি নির্মিত এরকম বিশাল মাজার কমপ্লেক্স জীবনে প্রথম দেখার সুযোগ হল। ভিতরে-বাহিরে কারুকার্য খচিত পলেস্তরাগুলো খসে পড়ায় এ মাজার যে মাটির নির্মিত ও অতি প্রাচীন তা উপলব্ধি করতে পারলাম। না হয় বুঝার উপায় ছিলনা।

মাজারের ভিতরে-বাইরে ইরানী নর-নারীর মোটামুটি সমাগম প্রত্যক্ষ করলাম। তবে ইমামজাদাগণের মাজার কমপ্লেক্সের মত ব্যাপক সমাগম মনে হয়নি। মূল মাজারটি ইমামজাদাগণের মাজার আদলের নয়। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির। হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ অলির মাজার কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে আরো একাধিক অলির মাজার দেখতে পেলাম যাদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। আমরা সেখানে জুমার বদলে কসর হিসাবে যোহরের নামাজ পড়ে নিই এবং তাড়া না থাকায় দীর্ঘক্ষণ ধরে যেয়ারত ও ঘুরেফিরে সময় কাটাই। মাজার থেকে বের হওয়াকালীন বাইরে গম্বুজসহ মাজারের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু সংস্কার কাজ ব্যাপক আকারে হচ্ছিল বলে মনে হয়নি।

মাহান শহরের পাশাপাশি মাজার এরিয়ায়ও বড় বড় গাছ-গাছালী আছে। মাজার থেকে বের হওয়া মাত্র বড় রাস্তা। রাস্তার দু'পার্শ্বে রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি প্রচুর ফল-ফলাদির দোকান রয়েছে। আমরা কেরমান হোটেলে পৌঁছে খাওয়ার জন্য আমাদের দেশে সহজলভ্য নয় এ রকম কিছু ফল খরিদ করি। এখানে দামে খুবই সস্তা।

হযরত নেয়ামত উল্লাহ অলির যেয়ারত এবং শাহজাদী গার্ডেন পরিদর্শন শেষে বেলা ৪টার দিকে কেরমানের হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই।

অন্যান্য যেয়ারত শেষ করে তেহরান প্রত্যাবর্তন

৬ জুন '০৮ শুক্রবার মাহান ও রায়েন থেকে ফিরে কেরমানের হোটেলে দুপুরের খাবার সেরে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করি। অতপর বিকাল ৫টার দিকে প্রাচীন কেরমান শহরের ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন এবং ইমামজাদার যেয়ারতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি।

কেরমান শহরের প্রাণকেন্দ্রে গঞ্জে আলী খান স্কয়ার রয়েছে। তথায় প্রাচীন মসজিদ বাজারসহ নানান বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে। গঞ্জে আলী খানের ঐতিহাসিক এ সকল স্থাপনা বহু শতাব্দীর প্রাচীন হলেও ইহা ইস্পাহানের সাথে তুলনীয় হবার নয়। কেরমান শহরের প্রধান মসজিদকে ফ্রাইডে প্রেয়ার মস্ক বলা হয়।

ইতোপূর্বে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের দেশের অনুরূপ ইরানে যে কোন মসজিদে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়না। তেমনিভাবে কেরমান শহরে শুধুমাত্র এ ফ্রাইডে প্রেয়ার মসজিদে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ১৪শ' শতাব্দীতে নির্মিত এ ফ্রাইডে প্রেয়ার (মস্ক) মসজিদটি কেরমান শহরের প্রধান মসজিদ। কিন্তু এ মসজিদটি ইরানের বড় বড় শহরের মসজিদগুলোর সাথে তুলনীয় নয়।

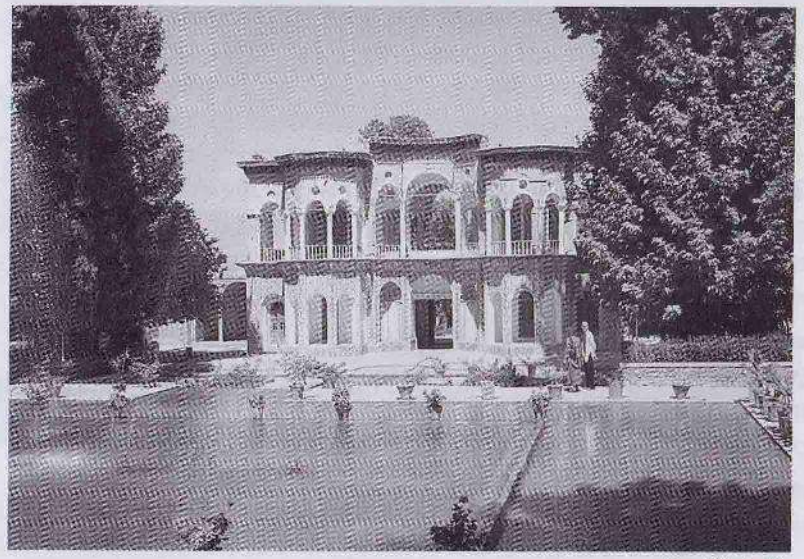

শাহজাদী গার্ডেন

১২০৯ হিজরীতে নির্মিত কেরমান শহরে রয়েছে আলী মরদান খান জলাধার। ভূগর্ভস্থ পানির পাইপলাইনের মাধ্যমে দূরবর্তী উৎস হতে পানি সরবরাহ করা হয়। প্রায় ২শ' বছর পূর্বে নির্মিত এ পাইপলাইনটি এবং পানি সংরক্ষণাগার সেকালের নির্মাণ কৌশল পর্যটকদের জানবার-বুঝবার-দেখবার ও উপলব্ধি করার খোরাক হয়ে রয়েছে।

উপরোক্ত সকল স্থাপনা দেখে আমরা ইমামজাদা হযরত হোসাইন (র.)-র যেয়ারতের উদ্দেশ্যে কেরমান শহর থেকে বেরিয়ে পড়ি। কেরমান শহর থেকে প্রায় ৩০ কি. মি. দূরত্বে জুপার শহরে এ মাজার অবস্থিত। ইরানে ইমামজাদার মাজার বলতে বিশাল ও শানদার, যেমনটি এ মাজারও। কাজারের শাসন আমলে এ মাজার নির্মিত বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। এ মাজারটি মাটির নির্মিত, তবে মাজারের অভ্যন্তর ও বহিরাংশে কারুকার্য খচিত রং-বেরং এর প্রলেপ থাকায় মাটির নির্মিত বলে অনুভূত হয়না।

ইমামজাদা হোসাইন (র.) শিয়াগণের ৮ম ইমাম, ইমাম রেজার ভাই বলে উল্লেখ রয়েছে। আমরা সেখানে যেয়ারতে মনোনিবেশ করি। সন্ধ্যার দিকে কেরমান শহরের হোটেলে ফিরে আসি। কেরমানে তেহরানের আধ ঘন্টা পূর্বে প্রায় ৮ টায় সূর্য অস্ত যায়। নামাজ শেষে রাতের খাবার খেয়ে নিই। হোটেল মালিকের মাধ্যমে টেক্সির ড্রাইভারকে বলে রাখা হয় ভোররাত ৪টায় আমাদেরকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে নিতে আসার জন্য। টেবিল ঘড়ির এলার্ম সহায়তায় ভোররাত ৩টার পরপর উঠে পড়ি। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে আমরা ৩ জন যথাসময়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই।

কেরমান শহরে সবুজের সমারোহ তুলনামূলক কম, কিন্তু এয়ারপোর্ট রোডে বড় বড় গাছ আছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোডিয়াম লাইটের জমকালো আলোর উঁকি দেওয়া দৃশ্য খুবই নয়নাভিরাম। বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখতে পেলাম মাহান এয়ারের তেহরানগামী ফ্লাইটের চেকিং শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বড় লাগেজ জমা দিয়ে বোর্ডিং কার্ডের সাথে টেগ নিয়ে নিই। অতপর ফজরের নামাজ পড়তে বিমানবন্দর-এর নামাজ কক্ষে চলে যাই। সমগ্র ইরানের যে কোন ছোট-বড় মসজিদ, অফিস-আদালত, বিমানবন্দর, হোটেলের নামাজ ঘরের একপার্শ্বে প্রচুর কারবালার মাটির টুকরা সাজানো থাকে। শিয়াগণ নামাজ পড়তে ঐ সকল মাটির টুকরা নিয়ে সিজদাস্থলে রেখে তার উপর সিজদা দিয়ে থাকে।

আমার পরিধেয় জামাকাপড় (সাফারী) ও মাথায় ক্যাপ দেখে অনায়াসে অনুমিত হয় যে আমি শিয়া নয়, সুন্নি। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বের পুরুষের শতকরা ৭০/৮০ ভাগ প্যান্ট-শার্ট পরে থাকে। অবশিষ্ট আরবীয়গণসহ আফ্রিকা মহাদেশ ও বিশ্বের বহু ছোট ছোট দেশের লোকদের পরনে তাদের জাতীয় পোশাক থাকে।

তেমনিভাবে ইরানের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ বাদে সকলে প্যান্ট-শার্ট পরে। অপরদিকে, ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিগণের অধিকাংশই প্যান্ট-শার্ট পরিহিত। ইরাক, বাহরাইন, কুয়েত, লেবাননসহ আরব রাষ্ট্রসমূহ থেকে অতিথি হিসেবে আগত শিয়াগণের মধ্যে অনেকের আরবীয় পোশাক-আশাক। কাজেই রাষ্ট্রীয় অতিথি শিয়ামতাবলম্বী ভাবাটা স্বাভাবিক। মনে হয় সকলের মাঝে আমি ব্যতিক্রম তথা স্পষ্টতই সুন্নী মতাবলম্বী। যেহেতু হালকা পাতলা লম্বাদেহী, পরিধানে সাফারী, মাথায় কাল ক্যাপ। কাজেই আমি যে শিয়া নই, সুন্নী তা অনায়াসেই ভেসে উঠে। ফলে শিয়াগণের বাঁকা দৃষ্টি এড়াতে প্রকাশ্য স্থানে নামাজ পড়তে গেলে মসজিদ/নামাজের স্থানে রক্ষিত কারবালার মাটির টুকরা নিয়ে নিই।

বিমানবন্দরের নামাজঘরে ফজরের নামাজ পড়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বিমানে আরোহণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই। আমাদের ফ্লাইট ভোর ৬টায় বিধায় তেহরান থেকে যাত্রী নিয়ে মাহান এয়ারের নির্দিষ্ট ফ্লাইট অপেক্ষমান থাকে। এয়ারবাসে আমরা নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করি। যথাসময়ে ফ্লাইট সোয়া ঘন্টার যাত্রায় আকাশে উড়াল দেয়।

আমাদের বহনকারী মাহান এয়ারের এয়ারবাসটি কেরমান শহরকে পিছনে ফেলে তেহরানকে সামনে রেখে কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই মরুভূমির উপর এসে পড়ে। গতপরশু বিকেলে তেহরান থেকে কেরমান আসার পথে মাহান এয়ার আমাদেরকে নিম্নমানের আতিথেয়তা করে। আজ দেখছি তার ব্যতিক্রম। হয়ত সকালের নাস্তা বিধায় উন্নতমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানালা দিয়ে নিচে মরুভূমির দৃশ্য দেখতে দেখতে ও সকালের নাস্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যেতে থাকে। এয়ারবাসটি যাত্রীতে ভরপুর হলেও আমরা বিদেশী বিধায় কিছুটা বেশী খাতির করছিল। যেহেতু ইরানে বিদেশীদের আনাগোনা কম বললেই চলে।

অপরদিকে, ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আগত বিদেশী অতিথি বুঝতে পারলে খাতিরের পাশাপাশি সম্মানটাও বেড়ে যায়। এমনিতে ঢাকা থেকে তেহরান পৌঁছার পর ইস্তেকলাল (সাবেক হিলটন) হোটেলে বিদেশী অতিথিদের তদারককারী গাইডগণ প্রত্যেককে একটি করে পরিচয়পত্র দেয় বুকে টাঙ্গিয়ে প্রদর্শনের জন্য। ইরানের যে কোন স্থানে তা দেখামাত্র ইমাম খোমেনীর মেহমান (অতিথি) হিসাবে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে।

আমাদের বহনকারী এয়ারবাস তেহরান মহানগরীর অভ্যন্তরে মেহেরাবাদ বিমানবন্দরে যথাসময়ে অবতরণ করে। অতপর টার্মিনাল ভবনে এসে বেল্ট থেকে লাগেজ নিয়ে তাবরীজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হই। যেহেতু আমাদের কাছে তাবরীজ যাওয়ার টিকেট করা ছিলনা। তেহরান বিমানবন্দর থেকে তাবরীজ যাওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মার মার হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই।

তেহরান থেকে তাবরীজ

ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় ২টি প্রদেশের নাম আজারবাইজান। তৎমধ্যে একটি পূর্ব আজারবাইজান, অন্যটি পশ্চিম আজারবাইজান। পূর্ব আজারবাইজানকে বলা হয় আজারবাইজানে-এ-শরকী এবং পশ্চিম আজারবাইজানকে বলা হয় আজারবাইজান-এ-গরবী।

পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী হল তাবরীজ। পশ্চিম আজারবাইজানের রাজধানী উরুমাইয়া। তাবরীজ ইরানের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর, তেহরান থেকে প্রায় ৬২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে।

৭ জুন শনিবার সকাল ৬টার ফ্লাইটে কেরমান থেকে তেহরান পৌঁছি। আমাদের সিদ্ধান্ত হল তেহরান বিমানবন্দরে অপেক্ষমান থেকে তৎক্ষণাৎ সিট পাওয়া সাপেক্ষে তাবরীজ অথবা উরুমিয়া চলে যাব। বেসরকারী এয়ারলাইনে সকাল বেলায় ফ্লাইট না থাকায় টার্মিনাল থেকে গাড়িযোগে মালপত্র নিয়ে সরকারী ইরান এয়ারের টার্মিনালে চলে যাই। ইরান এয়ারে তাবরীজের ফ্লাইটে কোন সিট খালি নাই। সকাল ৯:৫০টায় উরুমিয়া ফ্লাইটের ২টি সিট খালি আছে। কিন্তু আমরা ৩ জন বিধায় আমাদের ৩টি সিটই দরকার।

ইরান এয়ারের বক্তব্য হল যতক্ষণ যাত্রী এসে সিট বাতিল না করবে ততক্ষণ আরেকটি সিট দেয়া যাবেনা। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে যাত্রী না গেলে সিট খালি যাবে কিন্তু কাউকেও টিকেট দেওয়া যাবেনা। এরই মধ্যে তাবরীজের ফ্লাইট মিস করা ২৫/৩০ বছরের এক মহিলা এসে ইরান এয়ারের কর্মকর্তাদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাউন্টারে ভাংচুর শুরু করে দেয়। এতে ইরান এয়ারের ৩/৪ জন টিকেট সেলসম্যান নির্লিপ্তভাবে চেয়ে থাকে। তৎক্ষণাত টেলিফোন করায় ৫/৭ মিনিটের মধ্যে একজন পুলিশ এসে উক্ত ঘটনা তদন্ত করে যায়। ইতিমধ্যে উক্ত মহিলা ভাংচুর করে কোন্‌দিকে গেল বুঝতে পারিনি।

ইরানে মহিলা পুলিশ চোখে পড়েনি। এমনিতে ইরানে অপরাধ প্রবণতা নেই বললেই চলে। তারপরও একালে মহিলা পুলিশের প্রয়োজন যে একেবারে নেই তা কিন্তু বলা যাবেনা। প্রায় ২ ঘন্টার বেশী সময় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করে তাবরীজ বা উরুমিয়া যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা লাগেজসহ টেক্সিযোগে

তেহরান শহরের প্রাণকেন্দ্র মার মার হোটেলে চলে যাই। এই হোটেলে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরেও অবস্থান করেছিলাম; যেহেতু হোটেলটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে মানসম্পন্ন, যোগাযোগের জন্যও সুবিধা।

বিশ্রাম ও সারাদিন তেহরান শহরে কাটিয়ে পরদিন ৮ জুন রবিবার ভোরে টেক্সিযোগে বাসস্ট্যান্ডে চলে যাই। তাবরীজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি বাস কাউন্টারগুলো পরিপাটি সুন্দর আয়োজন। কাউন্টারে কর্মরতদের ইউনিফর্ম বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তাদের মত। সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে মন খুশি হয়ে যায়। ৩ জনের জন্য টিকেট কিনলাম জনপ্রতি ৫০০ টাকার মত। বাংলাদেশী পাঁচ শত সমমানের ৬৫০ কি. মি. মত দূরত্বের ভাড়া বেশ সস্তা মনে হল। সকাল সাতটায় বাস ছেড়ে বিকেল ৩টায় তাবরীজ পৌঁছবে বলল। আমাদেরকে বলা হল সামনের চেয়ারগুলোতে বসে অপেক্ষমান থাকার জন্য, সময় হলে আমাদেরকে বাসে নিয়ে যাবে বলে নিশ্চয়তা দিল। ইরানে এই প্রথম দূরপাল্লার বাসে চড়ছি। গত ২০০৫ সালে ইরান সফরকালে বাসে চড়ার সুযোগ হয়নি।

তাবরীজে প্রাচীন মসজিদের অংশ

যথাসময়ে আমরা বাসে গিয়ে ওঠার পর তাবরীজের উদ্দেশ্যে বাসটি ছেড়ে দিল, যাত্রী আমরা মাত্র ৬ জন। যেহেতু গত ৫/৬ দিন বন্ধ থাকার পর আজ ইরানে সরকারী অফিস-আদালত খোলার দিন। জনগণের গতি ও সবকিছু যথারীতি

তেহরানমুখী। আমাদের যাত্রা বিপরীতমুখী। বাস ছেড়ে দেয়ার পর আমাদেরকে একটি খাওয়ার প্যাকেট সরবরাহ করা হল। প্যাকেটে ১টি কেক, ১টি বিস্কিটের প্যাকেট, ১টি ছোট পানির গ্লাস। বাসটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও উন্নতমানের। বাসের চালক ২ জন ও ১ জন এসিস্ট্যান্ট রয়েছে। প্রায় ২৪/২৫ মিনিট ধরে বাসটি তেহরান মহানগরী অতিক্রম করে পশ্চিমদিকে যাচ্ছিল। রাস্তাটি আমার কাছে পরিচিত; যেহেতু ২০০৫ সালে এ রাস্তা দিয়ে হামেদান গিয়েছিলাম ইবনে সিনা ও বাবা তাহেরের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

তেহরান মহানগরী অতিক্রম করার পর বাসটি হাইওয়ে থেকে সরে গিয়ে একটি ছোট শহরের রাস্তার ধারে থামল, যাত্রী নেয়ার জন্য। ৪/৫ মিনিট থেমে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে আবার হাইওয়েতে উঠে ছুটে চলল। ১৫/২০ কিলোমিটার যাওয়ার পর পুনঃ যাত্রী নেওয়ার জন্য হাইওয়ে থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তখন বিরক্তিবোধ করছিলাম। এভাবে বিলম্ব করায় আমরা ৩টার স্থলে বিকেল সাড়ে ৫টায় তাবরীজ শহরের বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছি।

তেহরান থেকে তাবরীজ মহাসড়কটি দ্বিমুখী, ৬ লেইনের। উত্তর পার্শ্বে পাহাড়, দক্ষিণ পার্শ্বে সমতল। মাঝেমাঝে লোকালয়, মাঝেমাঝে আবাদযোগ্য জমি। গম চাষের আধিক্য দেখা যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে ফল-ফলাদির বাগান। প্রায় ৩ শত কিলোমিটার অতিক্রম করার পর উভয়পার্শ্বে পাহাড় আর পাহাড়। ঐসব পাহাড়েও গমের চাষ এবং ফলের বাগান মনে হল। এ পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশকালে এক রেস্টুরেন্টে থামলে টয়লেট সারতে যাই। ফিরতে দেখি পয়সা দিতে হচ্ছে। পকেটে ইরানী টাকা পয়সা না থাকায় সহযাত্রী থেকে এনে দিতে হল। পাহাড়ী এসব রেস্টুরেন্টেও নামাজের কক্ষ রয়েছে। তেহরান থেকে এখানে তাপমাত্রা কিছুটা কম। হালকা শীত অনুভব হচ্ছিল।

তাবরীজ শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা সারাদিনের বাস জার্নিতে কাহিল হয়ে পড়ি। শহরের বাস টার্মিনালে আমাদেরকে স্বাগত জানায় তাবরীজ শহর থেকে ২ শত কিলোমিটার দক্ষিণে "মাহবাদ" শহরে সপরিবারে বসবাসকারী ডা. রোকনুজ্জামান সেলিম। তিনি ঢাকার বাসিন্দা – চট্টগ্রামে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. কফিল উদ্দিনের শ্যালক। সে সুবাদে আমার ইরান যাওয়া এবং ইরান থেকে তাবরীজ যাওয়া মোবাইলের বদান্যতায় তাঁর জানা ছিল। তিনি ১৯৮৫ সালে ইরান যান। এখন ইরানী মেয়ে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাসরত।

বাস টার্মিনালে আমাদেরকে স্বাগত জানাতে তার জেটোস-এর ছেলে মোহাম্মদ আরশও এসেছিল। ছেলেটি খুব চটপটে, মিশুক ও উদার মনে হচ্ছিল। টেক্সি নিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে যাই হোটেলের উদ্দেশ্যে। তখন বাণিজ্যমেলা চলছিল বিধায়

মানসম্পন্ন হোটেলে কক্ষ খালি পাওয়া দুষ্কর হল। অনন্যোপায় হয়ে একটি নিম্নমানের হোটেলে ৩ জনকে একই কক্ষে থাকতে হল।

ডা. সেলিমের শাশুর বাড়ী তাবরীজে এবং আমাদের এ হোটেল-এর একদম নিকটে। আমরা তাবরীজ যাচ্ছি জেনে ডা. সেলিমের শ্বাশুড়ী আমাদের জন্য রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। রাত্রে গিয়ে দেখি আমাদের সৌজন্যে ঘরভর্তি অতিথি। ডাক্তার সেলিমের শালী, মামা শ্বশুর, মামা শ্বশুরের স্ত্রী, ছেলে, কন্যা, জামাতা অনেকে। সেলিমের শ্বাশুড়ীরা কুর্দি। বিশ্বে কুর্দিদের শারীরিক গঠন ও আতিথেয়তার সুনাম রয়েছে। তারা যেমনি শারীরিকভাবে সমর্থ, তেমনি অতিথিপরায়ণ। ডা. সেলিমের শ্বশুর ইন্তেকাল করেছে কয়েকবছর হল। আমরা মাগরিবের পর রাত ১০টার দিকে ডা. সেলিমের শ্বশুরালয়ে যাই। আমাদেরকে পেয়ে তারা অত্যন্ত উৎফুল্ল হল ও খুশি প্রকাশ করছিল। ফার্সি ভাষা না জানার কারণে আমরা বারবার সালামালাইকুম ও খোশ আমদেদ বলে তাদের সালামের প্রতিউত্তরে বলতে থাকি। ডা. সেলিমের পাশাপাশি মোহাম্মদ আরশ ভাল ইংরেজি জানাতে সুবিধা হল।

রাতের খাবারসহ প্রায় ২ ঘন্টার মত অবস্থান করে রাত ১২টার দিকে হোটেলে এসে ঘুমিয়ে পড়ি।

তাবরীজ থেকে মারাঘেহ্ হয়ে উরুমিয়া

৮ জুন '০৮ রবিবার সকালে তাবরীজ থেকে ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে ইরানের অন্যতম প্রাচীন শহর মারাঘেহ্'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম। তথা হতে মাহ্বাদ হয়ে পশ্চিম আজারবাইজানের রাজধানী উরুমিয়া গমনের প্রোগ্রামও রয়েছে।

হযরত খাজা নাসির উদ্দিন তুসির শহর এই মারাঘেহ্ এবং ইরানের প্রাচীন নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম। মারাঘেহ্ শহর হালাকো খানের স্মৃতিবিজড়িত। এ শহরে তার বহু স্থাপনা রয়েছে। কিছুকাল এই মারাঘেহ্ হালাকো খানের আঞ্চলিক রাজধানী ছিল। ১১৯৭ সালে নির্মিত ব্লু টাওয়ার ইরানের সমাধি টাওয়ার হিসাবে বিখ্যাত। মারাঘেহ্-তে প্রচুর মার্বেল পাথর পাওয়া যায়। এ পাথর না কি পানি থেকেই জমাট বাঁধে। অসংখ্য ঝর্ণা থেকে বুদবুদ আকারে সমান্তরাল স্তর থেকে নির্গত হয়। প্রথমে উক্ত পানির স্তর কঠিন আবরণ বিশিষ্ট এবং সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়। পাথরগুলো গোলাপী, সাদা, সবুজ, বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। এ পাথরগুলো বিশ্বের বুকে অতি মূল্যবান পাথর হিসেবে বিবেচিত। এ মারাঘেহ্ শহরের পাহাড়ে রয়েছে বিখ্যাত অবজারভেটরী সেন্টার যা খাজা নাসির উদ্দিন তুসীর সৌজন্যে হালাকো খানের নির্দেশনায় তা নির্মিত হয়েছিল। ইহা নগর দুর্গ হিসেবে তখন ব্যবহৃত হচ্ছিল। নাসির উদ্দিন তুসি ৫৯৭ হিজরিতে (১২০২ সাল) খোরাসানের "তূস" নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাবরীজের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সৈয়দ তৌহিদী আমাদের ভ্রমণের সুবিধার্থে একটি বিলাসবহুল গাড়ী প্রদান করে। তিনি সফরসঙ্গী সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক পার্টনার। আমাদের অবস্থান করা হোটেলটি নিম্নমানের। সকালের ফ্রি নাস্তা সরবরাহ করা হয় জনপ্রতি এক একটি ট্রেতে করে। নাস্তার মান যেমনি সাধারণ তেমনি পরিমাণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সকালের নাস্তা সেরে ডাক্তার রোকনুজ্জামান সেলিমসহ আমরা ৪ জন তাবরীজ থেকে মারাঘেহ্-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। বেলা ১০টার দিকে মারাঘেহ্ শহরে পৌঁছে যাই। রাস্তাঘাট উন্নতমানের। দু'পার্শ্বে শহর, শিল্প-কারখানা ও বাগানাদি রয়েছে। এ অঞ্চল মরুভূমি সদৃশ নয়। সমগ্র ইরানের মত এখানেও রাস্তায় ঘনঘন পুলিশী পাহারা গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত।

মারাঘেহ শহরটি যে প্রাচীন তা নানান দুর্গ, টাওয়ার, স্থাপনাসমূহ দেখেই বুঝা যায়। শহরের বড় রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে খাজা নাসির উদ্দিন তুসীর ভাস্কর্য।

বিশ্বের বুকে ইরান ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ বলা যায়। শিয়া ধর্মীয় দৃষ্টি মোতাবেক এ ভাস্কর্য গ্রহণযোগ্য মনে হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে এ মারাঘেহ্ শহরে ঘুরেফিরে দেখে অতপর আরো প্রায় ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে মাহবাদ নামক শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। ডাক্তার সেলিম ৮০-র দশকে ইরানে এসে আজারী কূর্দি মেয়ে বিবাহ করে। তাদের দুই পুত্রসন্তান রয়েছে। তাঁরা মাহবাদ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এ শহরে তাঁর কর্মস্থল। আমরা বেলা ২টার দিকে তাঁর আবাসস্থলে পৌঁছি। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র ও দুই নিকটাত্মীয় মহিলা আমাদের জন্য দুপুরের খাবার রান্না করে অপেক্ষমান ছিল। দ্বিতল বিশিষ্ট তাঁর ঘরটি সুন্দর পরিপাটি। ছেলেরা জীবনে এ প্রথম পিতার দেশীয় আপনজন দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। ৮/৯ বছরের ছোট ছেলেটি আমাকে বারেবারে জড়িয়ে ধরতে থাকে। ছেলেরা ফার্সির পাশাপাশি ইংরেজি জানে। ডা. সেলিমের সহধর্মিনী ইরানী খাবারের পাশাপাশি ইন্ডিয়ান খাবার পরিবেশনে সচেষ্ট ছিল। হাতে সময় কম থাকায় ডা. সেলিমের বাসায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

মারাঘেহ্ থেকে মাহবাদ ১২০ কিলোমিটার রাস্তার কোথাও মরুভূমি সদৃশ নয়। রাস্তার দু'ধারে শহরের পাশাপাশি বাগানের আধিক্য বেশী। ইরানের বসতিগুলো গ্রামাঞ্চলেও অনেকটা ছোট ছোট শহরের মত। মাহবাদ থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটারের মত উত্তর-পশ্চিমে পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী উরুমিয়া। ইরানের বৃহত্তর লেক-এর পাড়ে এ উরুমিয়া শহর। এ অঞ্চলটি কুর্দি ও আজারী বসতিতে পরিপূর্ণ। ফার্সি ভাষার পাশাপাশি কুর্দি ভাষাও এখানে প্রচলিত। উরুমিয়াও ইরানের প্রাচীন শহর।

বস্তুতঃ ইরানের আজারবাইজান অঞ্চলটি বিশ্বের একটি প্রাচীন জনপদ। খ্রীস্ট-পূর্ব ২ হাজার অব্দের ইতিহাস রয়েছে এ উরুমিয়াতে। উরুমিয়াসহ পশ্চিম আজারবাইজানে সবুজের আধিক্য রয়েছে। তেহরান থেকে ৯৪৬ কি. মি. পশ্চিমে এই উরুমিয়া শহর। উরুমিয়াতে প্রাচীন যাদুঘর, প্রাচীন জামে মসজিদসহ নানান প্রাচীন স্থাপনা রয়েছে। উরুমিয়া লেকটি ইরানের একটি পর্যটন আকর্ষণীয় সম্পদ বলা যায়। লেকটি অনেকটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি। এ লেক পূর্ব আজারবাইজান ও পশ্চিম আজারবাইজানকে বিভাজন করে রেখেছে। এ লেককে সল্ট লেকও বলা হয়ে থাকে। ইরানের অভ্যন্তরে বৃহত্তম এ লেকটির দৈর্ঘ্য ১৪০ কি. মি. ও প্রস্থ ৫৫ কি. মি. এবং গভীর ১৬ মিটার তথা ৫২ ফিট। ইহার লবণাক্ততা এত বেশী যে, কোন মৎস্য জাতীয় প্রাণী থাকতে পারেনা। অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে লেক-এর পাড় একদম সাদা। জাহাজে এবং ব্রীজের পিলারগুলোতে লবণ জমাট বেঁধে থাকে। তারপরও ফিলিস্তিন-জর্ডান সীমান্তে ডেড সী তথা মৃত সাগরের লবণাক্ততার মত তীব্রতর হবেনা, তার চেয়ে কিছুটা কম হবে। এ লেক এর মাঝা-

মাঝি অংশের প্রস্থ কিছুটা কম তেমনি গভীরতাও স্বল্প। ফলে ইরান সরকার যাতায়াতের সুবিধার জন্য এ স্থানে লেক-এর ভিতর মাটি ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ করে। লেক-এর অভ্যন্তরে জাহাজ চলাচলে ব্যাহত না হয় মত সুবিধার্থে উঁচু ও বড় একটি সেতু নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছে। এ লেকে ছোট ও ক্ষুদ্র শতাধিক দ্বীপ রয়েছে।

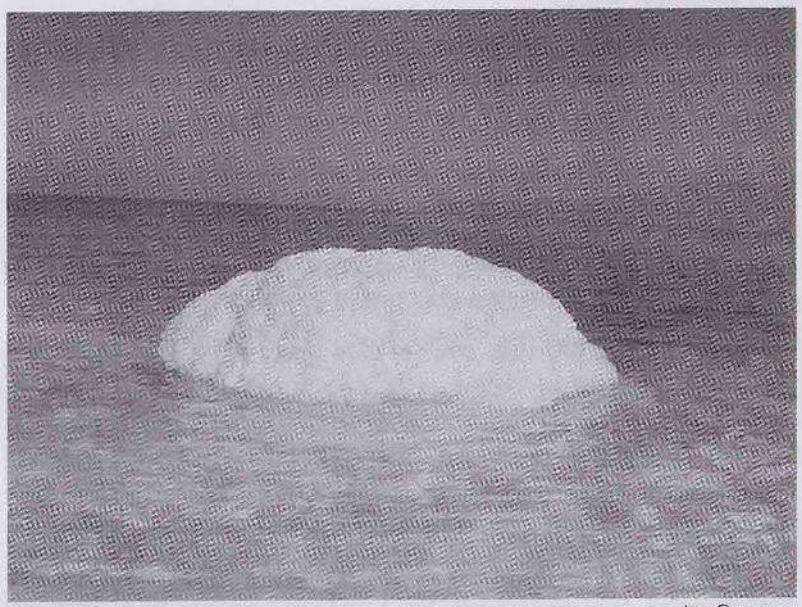

উরুমিয়া লেক

আমরা মাহবাদে ডা. সেলিম থেকে বিদায় নিয়ে উরুমিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। পাহাড়ী বাগানের মধ্যদিয়ে ৪০/৫০ কি. মি. আসার পর ডানপার্শ্বে উরুমিয়া লেক দেখতে পাই। উরুমিয়া লেক-এর এ অঞ্চলটি পাহাড়ী এবং উর্বর। রাস্তাটি আঁকাবাঁকা; তবে রাস্তা উন্নতমানের হাইওয়ে। আমাদের গাড়ীচালক গতির সীমা লঙ্ঘন করায় হাইওয়ে পুলিশ গাড়ী থামিয়ে জরিমানা করে।

লেক-এর পাড়ে পাহাড়ের উপর নানান পর্যটন স্থাপনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। রাস্তার বাম পার্শ্বে নানান ফলের বাগান। কিছুক্ষণ পাহাড়ী এলাকায় গাড়ী চলার পর আমরা উরুমিয়া শহরের নিকটে সমতল ভূমিতে এসে যাই। প্রাচীন উরুমিয়া শহরটি সমতল ভূমিতে মনে হল। শহরটিতে প্রাচীন স্থাপনা চোখে পড়ছিল, নতুন চাকচিক্যময় দালানের সারির পাশাপাশি।

উরুমিয়া লেক-এর সেতু নির্মাণের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ফেরীযোগে পার হতে হয়। ফেরী না কি সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে যায়। তখন ১ শত কিলোমিটার বা আরো

অধিক পথ ঘুরে তাবরীজ তথা মূল ইরানে আসতে হয়। উরুমিয়া শহরটি লেক-এর পাড়ে, এখানে লেক-এর প্রশস্ততা বেশী। ফলে আরো ২৫/৩০ কিলোমিটার উত্তরে যাওয়ার পর আমরা ডানদিকে মোড় নিয়ে লেক-এর দিকে যেতে থাকি। দেখি দু'পাড়ে লেক-এর পানি, মধ্যখানে রাস্তা। লেকের ঢেউ-এর আঘাতে রাস্তা না ভাঙ্গার জন্য পাথর ঢালাই করে দেয়া হয়েছে। এ রাস্তা ও সেতু দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিষেধ।

আমরা লেক-এর ভিতর রাস্তা দিয়ে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর ফেরী পার হওয়ার উদ্দেশ্যে অপেক্ষমান লাইনে পড়ি।

এ লাইনে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে ফেরীর নিকটে পৌঁছতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় পার হয়ে যায়। গাড়ী থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি করাতে কৌতূহলী হয়ে ইরানীরা আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমিও ইরানীদের সাথে কথাবার্তা বলতে সচেষ্ট হই। ইরানীদের সাথে আলাপে বাংলাদেশী মুসলমান, ইমাম খোমেনীর মেহমান বলায় সম্মানের চোখে দেখছিল। রাস্তাটির দুই পাড়ে লেক-এর পানির উপরি অংশ লবণ জমাট বেঁধে রয়েছে। দূরে থাকালে লবণ বাষ্প বুঝতে পারা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর আমাদের গাড়ী ফেরীতে উঠার সুযোগ পায়। প্রায় ৩/৪টি ফেরী হালকা যানবাহন পারাপার করছিল। প্রতিটি ফেরীতে ১৫/২০টি করে যানবাহন, তারপরও কুলিয়ে উঠতে পারছেনা। সেতুটি নাকি ভারী যানবাহনের চাপে ভেঙ্গে যাওয়ায় পুনঃনির্মাণ করছে, জানিনা সত্যতা কোন্‌টি। ফেরীযোগে লেক-এর পূর্বপ্রান্তে রাস্তায় পৌঁছে লেক-এর ভিতর দিয়ে আরও ২/৩ কিলোমিটার যেতে হলো, অতপর লেক-এর পাড়ে পৌঁছতে সক্ষম হই। সেখান হতে প্রায় ১ শত কিলোমিটার যাওয়ার পর সন্ধ্যার পরপর তাবরীজ শহরে পৌঁছি।

তাবরীজ শহরে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী সৈয়দ তৌহিদী আমাদের এক রেস্টুরেন্টে রাতের খাবারের জন্য নিয়ে যায়। খাবারের পর তাবরীজের বিখ্যাত পার্কে নিয়ে যায়। পার্কটি শহরের অভ্যন্তরে সমতল ভূমিতে লেক পরিবেষ্টিত। রাত্রে হিমশীতল বাতাসে তাপমাত্রা দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে পার্কে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় হোটেলে ফিরে আসি রাত ১২টার দিকে।

তাবরীজ-তেহরান হয়ে ইস্তাম্বুল

ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় আজারবাইজান অঞ্চলটি ইরানের শষ্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর তাবরীজের কারণে আজারবাইজানের গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে যায়। আজারবাইজান শীতকালে বরফাবৃত থাকে।

খ্রীস্ট-পূর্ব ৩২৮ অব্দে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট-এর সাথে তাবরীজের সম্পর্ক রয়েছে। আজারবাইজান ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও কৃষির জন্য বিখ্যাত। পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী এ ঐতিহাসিক তাবরীজ শহরকে আউলিয়ার শহরও বলা হয়ে থাকে।

মেশকাত শরীফের রচয়িতা ইমাম মেশকাত এবং মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির পীর শামশের তাবরীজী, হযরত সৈয়দ মখদুম শাহ জালাল উদ্দীন তাবরীজীসহ বহু অলি-দরবেশ এ শহরের সাথে জড়িত।

তাবরীজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী এ তাবরীজ মহানগরী আজীসয় উপত্যাকায় অবস্থিত, তেহরান থেকে ৬৩৫ কি. মি. পশ্চিমে।

তাবরীজে রয়েছে বিখ্যাত "কাবুদ মস্ক" (মসজিদ)। যা ৮৭০ হিজরিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাবরীজের ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর মধ্যে আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনুর রশীদের স্ত্রী জোবাইদার অবদান রয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ২২ হিজরিতে আজারবাইজান ইসলামের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

জামে মসজিদ, যাদুঘর, পুরাতন বাজার, বাগ-ই-গুলিস্তান, বাগ-ই-শোমলে, ছেহেল দোখতার সেতু ইত্যাদি তাবরীজের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান।

ইরানে তেহরানের পর ইস্পাহান নগরী, অতপর তাবরীজকে বড় শহর হিসাবে গণ্য করে থাকে। অতপর সিরাজ ও মা'শাদ।

১০ জুন '০৮ মঙ্গলবার সকাল ১০টার ফ্লাইটে ইরানের বেসরকারী আসেমান এয়ারে তাবরীজ থেকে তেহরান যাওয়ার প্রোগ্রাম। সকালের নাস্তা সেরে হোটেল থেকে টেক্সিযোগে বিমানবন্দর রওয়ানা হয়ে যাই। বিমানবন্দর শহরের অনতিদূরে। বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন দেখে হতচকিত হই। যেহেতু নবনির্মিত এ টার্মিনাল ভবনটি বেশ আধুনিক। মনে হয় ইরানের অভ্যন্তরেই এটি শ্রেষ্ঠ টার্মিনাল। তেহরানে নবনির্মিত ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর টার্মিনাল-এর চেয়ে তাবরীজের এই টার্মিনাল ভবনটি আমার কাছে অনেক বেশী সুন্দর মনে হচ্ছিল।

ইস্পাহান, সিরাজ, রাস্ত, মাশাদ, কেরমান এ সকল বিমানবন্দর টার্মিনালগুলো আমার কাছে ঢাকার চেয়ে আধুনিকতায় যেমনি কম তেমনি আকারেও ছোট মনে হয়েছিল।

বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ঘন্টাখানেকের যাত্রায় আমরা আকাশপানে উড়াল দিই। তেহরান থেকে তাবরীজ যাওয়াকালীন যেমনি স্থলপথে বাগানাদিসহ সবুজাভ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল আকাশ থেকেও অনুরূপ দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। বেসরকারী মাহান এয়ারের মত এ আসেমান এয়ারের আতিথেয়তাও দুর্বল। বিমান যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ঘন্টাখানেকের যাত্রায় তেহরান শহরের অভ্যন্তরে পুরানো বিমানবন্দর মেহেরাবাদে অবতরণ করি। টেক্সীযোগে মার মার হোটেলে চলে যাই। বিকেল বেলা তেহরান শহর ঘুরেফিরে কাটাই। পরদিন দেলোয়ার সাহেব ইমাম খোমেনীর বাড়ী দেখাতে নিয়ে যান। দেলোয়ার সাহেব নোয়াখালীর বাসিন্দা ইরানী মেয়ে বিয়ে করে তেহরানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী। তিনি তেহরানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

বিদেশী যে কোন ভ্রমণকারীরা বা রাষ্ট্রীয় অতিথি, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ইমাম খোমেনীর মাজার কমপ্লেক্সটি যেয়ারতের পাশাপাশি ইমামের বাড়ীঘরও দেখতে যায়। তা দর্শনীয় স্থান হওয়ার মূল কারণ হল যেমনি তাঁর সাদা-

মাটা জীবনযাপন ছিল তেমনি বাড়ীঘরও সাদামাটা। ফলে তাঁরই আবাসস্থল পরিদর্শন করে শিক্ষালাভ করার বিষয়।

ইমাম খোমেনী ইসলামী বিপ্লবের অব্যবহিত পরপর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ফ্রান্স থেকে তেহরান ফিরে আসেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ না করে নিজ বাড়িতে অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করে গেছেন।

ইরানী জাতির পিতা এবং সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হয়েও অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করায় তেহরান গমনকারী যে কেউ তাঁর অতি সাধারণ জীবনাপনের স্থাপনা পরিদর্শন করে আদর্শের শিক্ষালাভ করে থাকে।

ইমাম খোমেনীর বাড়ীটি কয়েকদিন আগে আমাদের অবস্থান করা ইস্তিকলাল হোটেলের নিকটে আল-বুরুজ পর্বতের ঢালুতে অবস্থিত। তাঁর বাড়ীর প্রবেশমুখে নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছে। তবে যে কেউ ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাঁর বাড়ী পরিদর্শন করতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামের বাড়ীর মত মূল বাড়ী ও কাছাড়ী বাড়ী হিসাবে আগে-পিছে দুই ভাগ করা দেখতে পেলাম। তিনি কাছাড়ী বাড়ীতে রাষ্ট্রীয় ও বিদেশী মেহমানদের সাক্ষাৎ প্রদান করতেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ না করে অতি সাধারণ জীবনযাপন করে ইমাম খোমেনী একালে বিশ্বের বুকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

১১ জুন বুধবার দেলোয়ার সাহেবের সহায়তায় আমরা ইমাম খোমেনীর আবাসস্থলসহ অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করি।

দিবাগত শেষরাত্রে তেহরান থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল যাওয়ার ফ্লাইট। তারপরও বাধ্য হয়ে বিশ্রাম না নিয়ে দেলোয়ার সাহেবের বাড়ীতে রাতের খাবার গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁরই অতি আবদারের কারণে।

তাঁর বাড়ীটি ইমাম খোমেনীর বাড়ী থেকে মাত্র ৩/৪ শত মিটার দূরত্বে। তাঁরই ইরানী সহধর্মিনী দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় রপ্ত করা এদেশীয় মুখরোচক খাবার বেগুন ভর্ত্তা, আলুভর্ত্তা পরিবেশন করেন অন্যান্য ইরানী খাবারের পাশাপাশি। এমনকি খাবারের পর আমাদের দেশীয় অনুকরণীয় মিষ্টান্নও সরবরাহ করেন। ইরানে যে কোন খাবারে ফল-ফলার থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাত ১১টার দিকে আমরা আমাদের অবস্থান করা মার মার হোটেলে ফিরে আসি। তাঁর বাড়ী তথা ইমাম খোমেনীর বাড়ীর এরিয়া থেকে সমতলভূমির তাপমাত্রা কম হলেও ৫/৭ ডিগ্রী ব্যবধান হবে।

রাত ১১টার দিকে হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম নিই। অতপর হোটেল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে টেক্সি ঠিক করে নিই। যেহেতু নবনির্মিত ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তেহরান শহর থেকে কিছুটা দূরত্বে। আমরা রাত প্রায় ১টার দিকে আমাদের হোটেল থেকে ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের

উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। আমাদের বহনকারী উড়োজাহাজ ভোররাত ৪টার স্থলে ভোর ৫টায় প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিটের যাত্রার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

ইমাম খোমেনী বিমানবন্দর থেকে আমাদের বহনকারী তার্কিস এয়ারলাইনের এয়ারবাসটি উর্দ্ধলোকে উঠতে উঠতে মেঘমালা অতিক্রম করায় ভোরের আলোকে নিম্নমুখী ধূসর সাদা মেঘরাজির আস্তরণ বাদে অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। কেন জানি পারস্যের রাজধানী ফেলে আসা তেহরানের জন্য মানসপটে নাড়া দিচ্ছিল।

যেহেতু আজো পারস্যের সাথে আমাদের দেশের নানাবিধ সাদৃশ্যের একেবারে বিলুপ্তি ঘটেনি এবং আদৌ ঘটা সম্ভবপর নয়। খ্রীস্টপূর্ব ৬ হাজার অব্দে তেহরানে মানব বসতির অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। ৬১৭ হিজরিতে (১২২০ সালে) মোঙ্গলদের দ্বারা এর আক্রমণের পর থেকে তেহরান ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য শহর হিসাবে পরিগণিত হয়, শাহ তাহ্মাস্ব তেহরানের নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিখা খনন করেন। ৯৬২ হিজরি (১৫৫৪ সালে) তেহরান একটি উল্লেখযোগ্য শহর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১২১০ হিজরিতে (১৭৭৫ সাল) আগা মোহাম্মদ খান-ই-খাজার তেহরানকে রাজধানী ঘোষণা করেছিলেন। তখন তথায় ইমারত নির্মিত হয়েছিল।

পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তেহরান শহর আল-বুরুজ পর্বতের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত হয়। পাহলভী শাহদ্বয়ের আমলে আল-বুরুজ পর্বতের পাদদেশসহ তেহরান যেমনি বিশালত্ব লাভ করে তেমনি আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৮ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর তেহরান উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্মীয় পরিবেশও ফিরে আসে। সকালের নাস্তা খাওয়ার পাশাপাশি তেহরান নিয়ে ভাবনার রাজ্যে বিচরণ করতে করতে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে এসে পড়ি।

কুর্দি জাতি ও তাদের আতিথেয়তা

বিশ্বের বুকে কয়েকটি ভাগ্যাহত জাতিদের মধ্যে কুর্দিও একটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিপক্ষ শক্তিধর দেশগুলো ওসমানী সালতানাতের বিশাল সাম্রাজ্যকে ভাগ-বাটোয়ারা করতে গিয়ে কুর্দি অঞ্চলটিও ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। এভাবে মধ্য কুর্দি অঞ্চলটি যে তিন দেশে ভাগ হয়ে যায় তা হল : ইরান, ইরাক ও তুরস্ক। সিরিয়া ও আর্মেনিয়া সীমান্তে কিছু কিছু কুর্দি রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুর্দি হল ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সীমান্তে। বিশ্বে প্রায় দুই কোটির উপর কুর্দি রয়েছে। তৎমধ্যে তুরস্কে প্রায় এক কোটি বিশ লাখের উপর কুর্দির বাস। ইরানে প্রায় ৫০ লাখ তথা ৫ মিলিয়নের উপরে কুর্দি বসবাসরত। ইরাকে ৪০ লাখ তথা ৪ মিলিয়ন, সিরিয়ায় প্রায় ৫ লাখ তথা আধা মিলিয়ন এবং আর্মেনিয়ায় প্রায় এক লাখ কুর্দির বাস।

ভাগ্যাহত এ কুর্দিরা তাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছে। তাদের উক্ত সংগ্রাম কোন সময় চাঙ্গা হয় কোন সময় নির্জীব হয়ে যায়। ইরান, ইরাক ও তুরস্ক তিনটি শক্তিধর দেশ। এ তিন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সরকার কুর্দিদেরকে দমিয়ে রেখেছে। উক্ত ৩ দেশের মধ্যে সুন্দর ও তিক্ত সম্পর্ক থাক বা না-থাক কুর্দিদের দমনের ব্যাপারে ৩ দেশই একমত। ইরান, ইরাক, তুরস্ক যেমনি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র তেমনি কুর্দি জাতিরা মুসলিম। তারপরও তারা স্বাধীনতা লাভ থেকে বঞ্চিত। জাতিগত ভেদাভেদের কারণে কুর্দিরা স্বাধীনতা লাভে মরিয়া হয়ে উঠলেও ইরাকের লৌহ মানব সুন্নী সাদ্দাম শিয়াদের মত কুর্দিদেরকেও শক্ত হাতে দমন করে রাখে। সাদ্দামের পতনের পর সংখ্যাগুরু শিয়ারা দমন নীতি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তেমনিভাবে তথাকার কুর্দিরা সুযোগ বুঝে তুরস্ক ও ইরান সীমান্তে অপরাপর কূর্দিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বতন্ত্র দেশ গঠনে প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। আমার মনে হয়না বড় ধরনের কোন ঘটনা ছাড়া এই শক্তিধর ৩টি দেশ থেকে কুর্দিরা বেরিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র কুর্দিস্থান রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে।

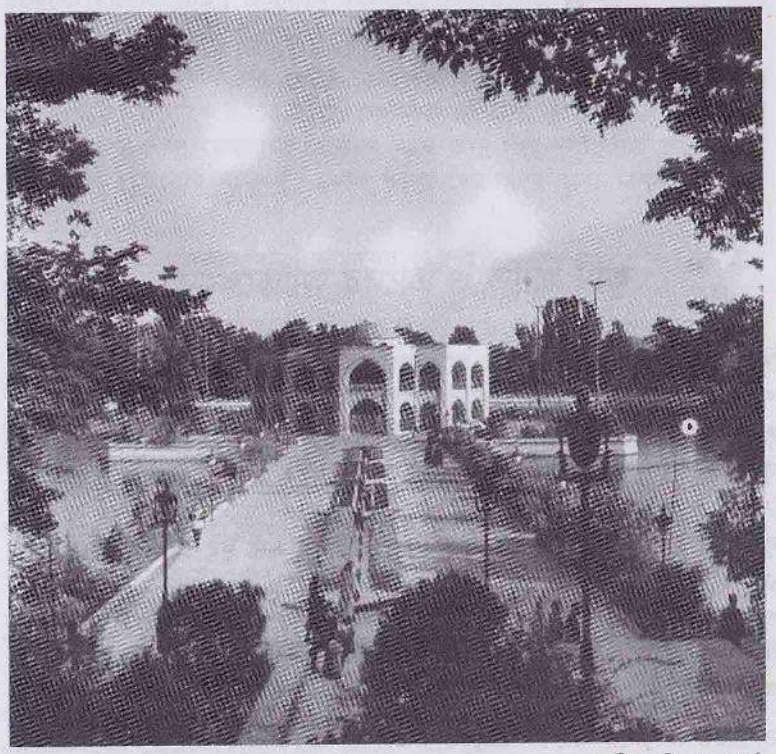

তাবরীজে বিখ্যাত পার্ক

ইরাকে সাদ্দাম শাসনের অবসান পরবর্তী শিয়াদের পাশাপাশি কুর্দিরাও কিছুটা হলেও প্রভাবমুক্ত জীবনযাপন করছে। জানিনা এ সুযোগের সুবাদে শুধু ইরাকের কুর্দি অধ্যুষিত অংশ নিয়ে ভবিষ্যতে ছোটখাট কোন কুর্দি রাষ্ট্র গঠিত হয় কি না!

ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় আজারবাইজান অঞ্চলটি কুর্দি ও আজারী অধ্যুষিত। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রায় ৮৬ হাজার কিলোমিটারের শিয়া অধ্যুষিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাম আজারবাইজান।

পাকিস্তান আমলে পাঠানদের দেখতে পেতাম যেমনি দীর্ঘ ও সুঠামদেহী তেমনিভাবে ইরানের আজারবাইজান অঞ্চলে দেখতে পেলাম কুর্দিরাও সুঠাম দেহের। তাদের চেহারা ও ভাব দেখে খুবই সাহসী ও শক্তিশালী মনে হল, তেমনি আজারীরাও। পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী তাবরীজ, পশ্চিম আজারবাইজানের রাজধানী উরুমিয়া এবং সাথে সাথে মারঘেহ্ ও মাহবাদ শহরে গিয়ে কুর্দি ও আজারীদের

সাথে কিছুটা হলেও মিশার সুযোগ হয়। এতে বুঝতে পেলাম কুর্দিরা যেমনি সাহসী তেমনি সহজ সরল ও অতিথিপরায়ণ।

তেহরান থেকে তাবরীজ পৌঁছে বাংলাদেশী ডা. সেলিমের শ্বশুর বাড়ীতে যাই রাতের খাবার খেতে। ডা. সেলিমের শ্বশুর আজারী, শ্বাশুরী কুর্দি। তাবরীজে আমাদের হোটেল থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরত্বে আতিথেয়তা গ্রহণ করতে গিয়ে হতবাক হয়ে যাই। দেশীয় আমরা ৩ জন অতিথিকে পেয়ে ডা. সেলিমের শ্বশুরবাড়ী যেন উৎসবে মেতে উঠে। ডাক্তারের মামা শ্বাশুর ও তার স্ত্রী, মেয়ে, মেয়ের জামাই, দুই ছেলে, ডাক্তারের শালীসহ ঘরভর্তি অতিথি এসেছে আমাদের সৌজন্যে। ঘরে প্রবেশ করতেই দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানায় তাঁদের রীতি অনুযায়ী। আমরা শুধু সালাম ও খোশ আমদেদ বাদে কোন আলাপ করতে পারছিলাম না ভাষাগত সমস্যার কারণে। অবশ্য ডাক্তারের পাশাপাশি ডাক্তারের ভায়ারার ছেলে মোহাম্মদ আরশ ভাল ইংরেজি জানায় তাদের মাধ্যমে কথোপকথন চলছিল। তাঁরা সকলে মিলে কেউ শরবত ও নাস্তা দিচ্ছিল কেউ টেবিলে খাবার পরিবেশনে তৎপর ছিল। রাতের খাবার গ্রহণকালীন আমাদের প্লেটে নানারকম মেনু পরিবেশন উৎফুল্লচিত্তে আন্তরিক তৎপরতা ভুলবার নয়।

খাওয়ার পর সোফায় উপবেশন করলে পরে আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য ইরানী নানাবিধ ফল-ফলাদিতে টেবিল ভর্তি হয়ে যায়।

রাত ১২টার দিকে বিদায়কালীন তাঁদের চেহারা দেখি মলিন। অর্থাৎ তাঁদের ঘরে আমরা প্রবেশকালীন যে আনন্দ উৎফুল্ল পরিবেশ অনুভব করছিলাম তেমনি আমাদের বিদায় নেওয়াকালীন লক্ষ্য করলাম তার বিপরীত বিদায়ীর বিরহ বেদনা।

পরদিন দুপুরের খাবার কোথায় খাব তা নির্ধারিত ছিলনা। তাবরীজ থেকে মারাঘেহ্ শহরে পৌঁছার পর দুপুর ১২টার দিকে প্রবাসী ডা. সেলিম আমাদের থেকে জানতে চাই মারাঘেহ্ থেকে উরুমিয়া যাওয়া পথে মারাঘেহ্ থেকে আরো ১২০ কি. মি. দূরত্বে উরুমিয়ার পথে মাহবাদে তাঁর বাসায় থামব কি না? আমরা তাঁর ঘরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী, তাঁর ঘরবাড়ী দেখার প্রত্যাশায় যাব বললাম।

দুপুর ২টার দিকে মাহবাদে ডা. সেলিম-এর বাড়ীতে পৌঁছে আমরা হতবাক হয়ে যাই। যেহেতু ডা. সেলিমের স্ত্রী-দুই ছেলে ছাড়াও আরো কয়েকজন অতিথি ঘরে অপেক্ষমান আমাদের সৌজন্যে। শুধু তাই নয় আমাদের সৌজন্যে তাঁরা হালকা নাস্তার পাশাপাশি দুপুরের খাবারের আয়োজন করে রেখেছেন। স্বভাবতই যার প্রস্তুতি ভোর অবধি শুরু হওয়ারই কথা যা ডা. সেলিম মোটেও জানেন না বা বুঝতে পারেন নি। গতকাল বিকেলেও তাবরীজ পৌঁছার পর ডা. সেলিম জানতে চেয়েছিল তাঁর শ্বশুর বাড়ী যাব কি না? আমরা ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা ৮টায়

ডা. সেলিম শ্বশুর বাড়ী থেকে টেলিফোন পেয়ে জানালেন, তাঁরা সকলে আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন রাতের খাবারের আয়োজন সহকারে।

এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাবরীজ ও মাহবাদে আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ ডা. সেলিমের সুবাদে হলেও স্বদেশীদের জন্য ডা. সেলিমের আগ্রহের চেয়ে ভিনদেশীদের প্রতি তাঁর শ্বশুরালয়ের আন্তরিকতা অত্যধিক।

তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে ও তাঁর বাড়ীতে তাঁরই শ্বাশুড়ী ও সহধর্মিনী আমাদের জন্য যে খাবার তৈরী করে অপেক্ষমান তা যে তাঁর অজ্ঞাতে ছিল বুঝতে বাকী রইলনা।

তেহরানসহ ইরানের বিভিন্ন শহরে ইরানীদের আতিথেয়তা গ্রহণ করা হয়েছিল। তা এক কি দুইজনের বাদে বাকি সকলে রেস্টুরেন্টে। পার্শ্ববর্তী দেশ তুরস্কে তুর্কিদের আতিথেয়তাও গ্রহণ করি রেস্টুরেন্টে গিয়েই। তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে গেলেও কুর্দিদের আতিথেয়তা গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করিনি। নতুবা দুই দেশের পার্থক্যও বুঝতে পারতাম।

একটা প্রবাদ আছে – "কি খাওয়ালো তা বড় কথা নয় কিভাবে খাওয়ালো তাই বড়।" অনুরূপভাবে স্পষ্টতই বলা চলে কুর্দিদের কাছে খাওয়ার চেয়ে নিজ ঘরে দাওয়াত করে কষ্ট স্বীকার করে খাওয়ার আয়োজন করা যে অতি আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ তা অস্বীকারের উপায় নেই।

শিয়া মতাবলম্বীর দৃষ্টিভঙ্গি

নবী পাক (স.)-র ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় দল-উপদলের কোন্দলের প্রাধান্য তেমন ছিলনা বলা যায়। যদিওবা আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর (র.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওসমান গণী (র.) ও হযরত আলী (ক.)-এর আমলে ধর্মীয় ভেদাভেদ তথা কোন্দলের প্রভাব একেবারে ছিলনা তা নয়। কিন্তু এজিদের পৃষ্ঠপোষকতায় কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাপ্রবাহের পর আহলে বাইতের প্রতি মোহাব্বত নিয়ে শিয়া আকিদার প্রসারতা লাভ করে বলা চলে। উমাইয়া খেলাফতকালে আহলে বাইতের প্রতি সাধারণ মুসলমানগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা অত্যধিক বেড়ে যায়। ফলে উমাইয়া শাসকগণ হেজাজে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি নজরদারী-খবরদারী বাড়িয়ে দেন। এতে অনেক আহলে বাইত তথা আওলাদে রসুলগণ ইরাক, পারস্য ও অনেকে মিশরের দিকে চলে যায়। শিয়াগণ আহলে বাইতের অতি মাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে সুসংগঠিত হওয়ার প্রয়াস পায়। উমাইয়া শাসকগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধারণ মুসলমানগণও শিয়াগণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এমনিতে শিয়াগণের দৃষ্টিভঙ্গি হল হযরত আবু বকর (র.), হযরত ওমর (র.), হযরত ওসমান (র.) ছিলেন জবরদখলকারী খলিফা, ইসলামে আদৌ খলিফা বলতে কিছুই নেই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল রসুল পাক (স.) পরবর্তী হযরত আলী (স.)-ই হল একমাত্র প্রতিনিধি তথা ইমাম, অন্য কেউ নয়।

উমাইয়া শাসকগণের আহলে বাইতের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইরাক, পারস্যে শিয়া মতবাদের বিস্তার লাভ করার অন্যতম কারণ।

অনুরূপভাবে আব্বাসীয় খলিফাগণও শিয়াগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলনা। তারাও আওলাদে রসুলগণের প্রতি নানা উৎপীড়ন ও বিরূপ আচরণ করত। যেহেতু জনগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল আওলাদে রসুলগণের প্রতি।

আব্বাসীয় খলিফা আল মোতাওয়াক্কিল শিয়া মতাবাদকে দমন করতে গিয়ে অসংখ্য শিয়া নেতাকে হত্যা করেছিল। এতে শিয়া মতাবলম্বীদের কোন ক্ষতিসাধিত না হয়ে বরং আরো প্রসারতা লাভ করেছিল।

শিয়াগণের প্রধান আক্বিদা বিশ্বাস হল যেহেতু হযরত আলী (ক.) সর্বপ্রথম কনিষ্ঠদের মধ্যে ইসলাম কবুল করেন, নবী করিম (স.)-এর আপন চাচাত ভাই ও

জামাতা, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু একমাত্র তিনিই নবী পাক (স.)-এর একমাত্র উত্তরসুরী হওয়ার অধিকারী। ৩ খলিফাগণ যেমনি অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী তেমনি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী।

হালাকো খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণের ফলে আব্বাসীয় শাসনের পতন হলে তুর্কি খেলাফতের সূত্রপাত হয়। তুর্কিরা পারস্য দখল করতে ব্যর্থ হয়। ফলে অনায়াসে পারস্যে শিয়া মতাবলম্বীরা শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন হতে আজ অবধি পারস্যসহ আশপাশ এলাকায় নানা অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায়ও শিয়াগণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে রয়েছে।

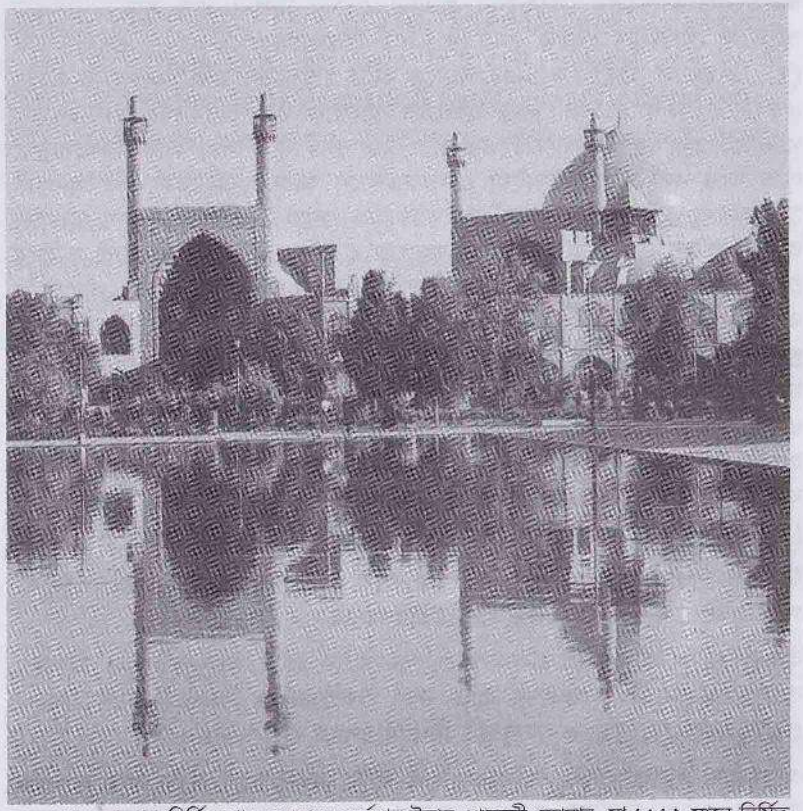

শাহ আব্বাস নির্মিত শাহ স্কোয়ার। বর্তমান ইমাম খোমেনী স্কোয়ার, যা ১৬১২ সালে নির্মিত

বর্তমানে বিশ্বের কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার দিক দিয়ে শিয়াগণ সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তৎমধ্যে ইরানে শতকরা ৯০ জন, ইরাকে শতকরা ৬০ জন, বাহরাইনে শতকরা ৭০ জন, আজারবাইজান শতকরা ৭০ জন।

ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আজারবাইজান শিয়া সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে, বাহরাইনে শতকরা ৭০ জনের মত শিয়া হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুন্নী শেখগণের হাতে, ইরাকে ৬০ শতাংশ শিয়া হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ সাদ্দাম হোসেনের সুন্নী শাসিত কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইরাক আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পর শিয়াদের প্রাধান্য বিস্তারলাভ করে। লেবাননে ৫০ শতাংশ খ্রীস্টান, ৫০ শতাংশ মুসলিম তৎমধ্যে শিয়াগণের প্রাধান্য বেশী। লেবাননের জনপ্রিয় বিশ্বখ্যাত নেতা হাসান নসরুল্লাহ একজন শিয়ামতাবলম্বী। কুয়েতে ৪০ শতাংশ শিয়া রয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে শিয়ার সংখ্যা কম নয়। তেমনটা ভারতেও। বিশ্বের বহুদেশে শিয়ারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

ইরানের শাহ'র আমলে দীর্ঘদিন পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে আমেরিকার সাথে। এমনিতে একটি অপপ্রচার বা অপবাদ ছিল শিয়ারাও কাদিয়ানীদের মত সুন্নী-বিদ্বেষী। তারা পশ্চিমা খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলো থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে টিকে থাকতে সচেষ্ট।

১৯৭৯ সালে ইরানে মহামান্য ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী শিয়াগণের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর সম্প্রীতির যে দুর্নাম ছিল তা ঘুচে যায়। যেহেতু বিশ্বের বুকে শিয়াগণের মূল কেন্দ্র হল ইরান।

মহামান্য আয়াতুল্লাহ খোমেনীর একটি মাত্র যুগান্তকারী স্লোগান বিশ্বের ১২০ কোটি সুন্নী মুসলমানকে তাক লাগিয়ে দেয়া। আর উক্তিটি হল – "আমরা শিয়াও নই আমরা সুন্নীও নই – আমরা মুসলমান।"

নির্বাসিত জীবনযাপনের পর ফ্রান্স থেকে স্বদেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ না করে অতি সাদামাটা জীবনযাপন করে চলে যাওয়ায় বিশ্বের বুকে তাঁর সম্মান বহুগুণ বেড়ে যায়।

ভারতীয় বংশোদ্ভুত সালমান রুশদী নবী পাক (স.)-এর প্রতি বেয়াদবি করে "স্যাটানিক ভার্সেস" রচনা করায় এই একমাত্র মহান নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী সালমান রুশদীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড জারী করেন যা আজ অবধি বহাল রয়েছে, ভবিষ্যতেও থেকে যাবে। বিশ্বের কোন মুসলিম রাজা-বাদশাহ-প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট নবী পাক (স.)-এর উম্মত হয়েও এরূপ সাহসী ভূমিকা দেখাতে পারেনি।

কিছু কিছু দেশে শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপলাভ করে তৎমধ্যে পাকিস্তান অন্যতম। আমাদের দেশে শিয়া খুবই নগণ্য বলা চলে। শতকরা একজনও হবে মনে হয় না। সকলে সুন্নী মুসলমান, আমাদের সুন্নী ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যেখানে হিংসা, বিদ্বেষ, একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি রয়েছে, একে অপরকে কাফের পর্যন্ত ফতোয়া দেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে বিরোধ বা দূরত্ব থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।

দু'বার ইরান সফরকালে ইরানী বিজ্ঞগণকে বারেবারে বলেছিলাম বিশ্বে শিয়াগণের সংখ্যা ১০ কোটি তথা ১ শত মিলিয়নের অধিক হবেন না। অতএব, উচিত হবে আপনাদেরই ১০/১২ গুণ বেশী সুন্নি মুসলমানদের সাথে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থানের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া।

১২০ কোটি সুন্নি মুসলমানের সাথে ১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন) শিয়াদের ধর্মীয় মতভেদকে খাটো করে দেখা যাবেনা। যেমন: তারা কলেমার সাথে আলীউ অলিউল্লাহ যোগ করে দিয়েছে; আজানে হযরত আলীর নামসহ অতিরিক্ত বাক্য যোগ করা হয়েছে। তারা কারবালার মাটিকে অতি পবিত্র মনে করে; এ মাটি সংরক্ষণ করে তাতে নামাজের সিজদা দেয়; তাদের নামাজসমূহও ব্যতিক্রম। জোহরের নামাজ পড়ে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আসরের নামাজ পড়ে থাকে, তেমনি মাগরিবের নামাজের কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এশা'র নামাজ পড়ে থাকে। তাদের নামাজে একজন মুকাব্বির থাকে এবং মুকাব্বির কেবলার বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু জামাতে অংশগ্রহণ করে না। তারা ওজু করতে পা ধৌত করে না; পায়ের উপরিভাগ মসেহ করে মাত্র।

শিয়াগণ মসজিদে পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর কাল্পনিক ছবি টাঙ্গিয়ে সম্মান করে। ইরানের বাৎসরিক সরকারী বন্ধসমূহ ব্যতিক্রম।

তেমনিভাবে ব্যতিক্রম তাদের বাৎসরিক আনন্দোৎসব ও শোক প্রকাশের ধরণও। বিশ্বে মুসলমানগণের প্রধান আনন্দোৎসব হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। আবার অনেকে ১২ রবিউল আউয়ালকে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) হিসাবে ভিন্ন আঙ্গিকে উদযাপন করে থাকেন।

কিন্তু শিয়াদের বাৎসরিক প্রধান উৎসব হল নওরোজকে কেন্দ্র করে। নওরোজ অর্থাৎ নবদিন তথা নববর্ষ শিয়ারা পালন করে ফার্সি সাল গণনা হিসেবে।

এ নওরোজে সপ্তাহব্যাপী সরকারী বন্ধ থাকে। শিয়ারা সপ্তাহব্যাপী উক্ত উৎসব জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে এবং আনন্দ উৎসবে মেতে থাকে। শিয়ারা বিশ্বাস করে তাদের ১২তম তথা সর্বশেষ ইমাম, ইমাম মেহেদী (আ.) জন্মগ্রহণ করেছে ২৫০ হিজরীর দিকে এবং তিনি মানবদৃষ্টির অগোচরে রয়েছেন। যথাসময়ে মানবকূলে প্রকাশিত হবেন। শিয়ারা মনে করে তাঁর জন্ম ১৫ শাবান। উক্ত দিবস আমরা লাইলাতুল বরাত হিসাবে উদযাপন করি। তাদের শেষ ইমাম তথা ১২তম ইমামের জন্মদিন হিসাবে উক্ত দিবস তাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তারা সেমতে পালন করে।

অপরদিকে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় একদিন করে সরকারী ছুটি থাকে এবং তারা তা সাদামাটাভাবে পালন করে।

শিয়াগণের কাছে আনন্দোৎসবের চেয়ে বছরে শোকের কার্যক্রম বহুগুণ বেশী। তেমনিভাবে সরকারী বন্ধও রয়েছে। দুই দিনব্যাপী কারবালার শোক দিবস উপলক্ষে সরকারী ছুটি থাকে। তখন শোক পালন করতে গিয়ে কোটি কোটি ইরানী শিয়ারা শোকের মাতমে ফেটে পড়ে। ইরানে আরো রয়েছে হযরত আলী (ক.) এবং মা ফাতেমা (রা.) জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনসহ একাধিক ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী পালন। সে লক্ষে ইরানে সরকারী ছুটিও রয়েছে। মোট কথা, ইরানী শিয়াদের মাঝে সুন্নীদের মত না হয়ে ব্যক্তিক্রমধর্মী আনন্দোৎসব ও শোক পালন করে থাকে।

আমাদের দেশে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, শিয়ারা হযরত আলী (ক.)-কে নবী মনে করে থাকেন। ইরানে যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত হই যে, তা আদৌ সত্য নয়। তারা হযরত আলী (ক.)-কে ইমাম মনে করেন এবং প্রথম ইমাম। অর্থাৎ নবী করিম (স.)-এর পর হযরত আলীর (ক.) স্থান, সম্মান-মর্যাদা। নবী করিম (স.)-এর প্রতি শিয়াগণের ভালবাসা-সম্মান-শ্রদ্ধা সুন্নিগণ থেকে বেশী বৈ কম নয়। নবী পাক (স.)-এর নাম যেখানে যেভাবে উচ্চারিত হবে সাথে সাথে শিয়ারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে সম্মিলিতভাবে দরূদ শরীফ পড়ে উঠে এবং তা একবারের জন্যও ভুল হতে দেখিনি। নবী করিম (স.)-এর নামের সাথে সমস্বরে পঠিত তাদের সংক্ষিপ্ত এ দরূদ শরীফ হল : 'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলি মোহাম্মদ'।

শিয়াগণ আহলে বাইতের প্রতি অর্থাৎ নবীজির (স.) ওয়ারিশগণের প্রতি যে অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল তাতে ইতস্ততের অবকাশ নেই। তারা খেলাফতে বিশ্বাসী নয় ইমামতে বিশ্বাসী। আগেও উল্লেখ করা আছে, তারা পরপর ১২ জন আওলাদে রসুল (স.)-কে ইমাম হিসেবে মানে। তারা হলেন: ১. ইমাম হযরত আলী (রা.), ২. ইমাম হযরত হাসান (রা.) ৩. ইমাম হযরত হোসাইন (রা.) ৪. ইমাম হযরত জয়নাল আবেদীন (র.) ৫. ইমাম হযরত বাকের (র.) ৬. ইমাম হযরত জাফর সাদেক (রা.) ৭. ইমাম হযরত মূসা কাজেম (র.) ৮. ইমাম হযরত রেজা (র.) ৯. ইমাম হযরত মোহাম্মদ জাওয়াত তকী (র.) ১০. ইমাম হযরত আলী আন নকী (র.) ১১. ইমাম হযরত আল হাছান আল আশকারী (র.) ১২. ইমাম হযরত মেহেদী (আ.)।

আমাদের সুন্নিদের উচিৎ হবে শিয়াগণের প্রতি বিদ্বেষ না রেখে কিভাবে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থানে আসা যায় তা ভেবে দেখা। যেহেতু বর্তমানে মুসলিম সমাজ নাজুক অবস্থায়। বিশ্ব মুসলমানের বৃহত্তর ঐক্য প্রয়াসে শিয়া-সুন্নি মতভেদ ভুলে গিয়ে সহযোগিতা ও সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থানের ভিত রচনা করা জরুরী যা সময়ের দাবী।

আমাদের দেশে পারস্যের প্রভাব

আমাদের দেশসহ উপমহাদেশে ৫/৬ শত বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি। সুলতানী আমল ও মোগল আমল পেরিয়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজি ও ফার্সি উভয় ভাষা সমান্তরালে প্রচলন ছিল। উপমহাদেশ বিভাগের পর থেকে বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশে পর্যায়ক্রমে ফার্সি ভাষার ব্যবহার কমে যেতে থাকে।

বর্তমানকালে ফার্সি ভাষা জানা ব্যক্তি হাতেগোনা। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ফার্সি বিভাগ চালু রয়েছে। আমাদের দেশের কোন কোন সরকারী মাদরাসাগুলোতে ফার্সি ভাষার ব্যবহার রয়েছে। তেমনি কোন কোন বেসরকারী তথা কওমী মাদরাসাগুলোতে এখানো পাঠ্যসূচিতে ফার্সি রয়েছে।

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে ৫/৬ শত বছর ধরে ফার্সি ভাষার প্রচলন থাকায় বাংলা ভাষাতে ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এখনো বাংলা ভাষায় সাত হাজারের অধিক ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ রয়েছে বলে জানা যায়। অর্থাৎ বাংলা ভাষা হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখনীতে অগণিত ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে গেছেন।

আমাদের দেশে এমন অগণিত শব্দসমূহ বহুল প্রচলিত রয়েছে যেগুলো মূলত ফার্সি শব্দ যেমন : খোদা, মারফৎ, আসমান, জমিন, মেহমান, দুনিয়া, মুশকিল, দরজা/দরওয়াজা, খালি, খোশ আমদেদ, খোদা হাফেজ, খানম, জনাব, বিমার, ওয়াকফ, শহীদ, নজদিক, পনির, পুল, চাদর, জায়নামাজ, বাজার, নামাজ, হালুয়া, সফর, বোরখা, বাদাম, পিঁয়াজ, সালাদ ইত্যাদি।

এতো গেল ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশের কথা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের দেশে কোরমা, পোলাও, বিরানীকে মোগলদের খাওয়ার অনুকরণ বা অনুপ্রবেশ বলে মনে করে থাকি। এ সকল খাবারের প্রচলন তুলনামূলকভাবে ঢাকাতেই বেশী। এখনো পুরাতন ঢাকায় মোগলাই পরটা, বাকরখানীসহ অনেক খাবার মোগলী

ইমাম রেজা মসজিদ, মা'শাদ

খাবার বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ খাবারগুলো ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বাদে পারস্য তথা ইরান এবং তুরস্কের কোথাও খাওয়াতো নয়ই দেখতেও পাওয়া যায়নি। কাজেই এই খাবারগুলো আমাদের দেশে প্রচলনের পিছনের ইতিহাস ভাববার বিষয়। কোত্থেকে কিভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা জানার বিষয়।

পারস্য তথা ইরানের বহু মহান আল্লাহর অলিগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন। গৌড়, সোনারগাঁ, বগুড়া, নেত্রকোণা, চট্টগ্রামসহ বহু এলাকায় পারস্যের মহান অলিগণ শায়িত রয়েছেন। মুসলিম বিশ্বে কয়েকটি আউলিয়াগণের শহর রয়েছে তন্মধ্যে তাবরীজ, নিশাপুর, তুস ও বল্ক পারস্যের অন্তর্গত। যদিওবা বল্কের বর্তমান অবস্থান ইরান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানে।

ইরানে কয়েক হাজার ইমামজাদার মাজার রয়েছে। এ সংখ্যা নাকি ৫ হাজারেরও অধিক। পারস্যের শিয়া মতাবলম্বীগণ খেলাফতে নয় ইমামতে বিশ্বাসী তা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। তারা আওলাদে রসুলগণের মধ্যে ইমামজাদাগণকে অত্যধিক সম্মান তথা মর্যাদা দিতে গিয়ে বিশাল বিশাল দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো তথা মাজার নির্মাণ করেছে ও করে চলেছে। ইরানের প্রায় ছোট-বড় শহরে এক বা একাধিক ইমামজাদার মাজার রয়েছে। মাজারগুলোর বিশালত্ব স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতে পারে।

বিশ্বের বুকে মাজারের বিশালত্বের দিক দিয়ে ইরাকের নজফে শেরে খোদা হযরত আলীর (ক.) মাজার ও ইরানের মা'শাদে হযরত ইমাম রেজার মাজার। উভয় মাজার কমপ্লেক্স প্রায় ১ কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে বিস্তৃত। আমাদের দেশে মহান অলিগণের সম্মানার্থে মাজার নির্মাণ প্রথা পারস্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে বলে মনে করিনা। এমনকি মোগল বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁর স্ত্রী মমতাজ বেগমের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে বিশ্বখ্যাত তাজমহলও পারস্যের অনুকরণীয় প্রভাব বলতে পারি।

তুর্কি ওসমানী সালতানাত-এর সুলতানগণ মাজার-প্রেমী ছিলেন। তবে তা পারস্যের মত নয়। যদিওবা বাদশাহ আবদুল আজিজ ১৯ শতকের প্রথমদিকে সৌদি আরব দখল করার পর তুর্কি সুলতানগণ কর্তৃক নির্মিত আহলে বাইত, আওলাদে রসুল সাহাবা, শোহদায়ে কেরামগণের ছোট ছোট মাজারগুলো ধ্বংস করে ফেলেছে। তাঁরা বেদা'আত শিরিক তথা ধর্মবিরোধী কাজ মনে করে তা ধ্বংস করে দেয়

এখনো ইস্তাম্বুল নগরীর বিখ্যাত সোলাইমানিয়া মসজিদ সংলগ্ন সুলতানের মাজার রয়েছে।

ঢাকার পূর্বে সোনারগাঁও বাংলার রাজধানী থাকালীন তথাকার সম্রাট গিয়াসউদ্দিন কবি ও সাহিত্যমনা ছিলেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীগণকে খুবই সমাদর করতেন। তিনি একবার কবিতার পরবর্তী অংশের ছন্দ মিলাবার জন্য উপঢৌকনসহ একজন বাহককে পাঠিয়েছিলেন সুদূর পারস্যে কবি হাফিজ সিরাজির নিকট। সাথে সাথে তাঁকে বাংলায় ভ্রমণের দাওয়াতও দিয়েছিলেন। তখনকার আমলে প্রায় এক বছরের যাত্রায় বাহক কবির নিকট পৌঁছে। মহাকবি হাফিজ সিরাজী বাংলায় না আসলেও কবি উক্ত কবিতার পরবর্তী ছন্দ মিলিয়ে দিলে বাহক তা নিয়ে পুনরায় বাংলায় ফিরে আসেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালে পারস্যের সিরাজে গিয়েছিলেন। তিনি মহাকবি হাফিজ সিরাজির সমাধিসৌধে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন

নয়াদিল্লীর হাশেমী ও পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের ড. গজল খান ঘটক। তাঁর ইরান ও ইরানের সিরাজ ভ্রমণ-পরবর্তী কবি নিজেও একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফার্সি সাহিত্যের লালিত্য বাংলায় টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি একবার মহাকবি হাফিজ সিরাজিকে বাংলায় আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন।

ইরান তথা পারস্যের বাইরে একমাত্র এই উপমহাদেশেই ফার্সি রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় উপমহাদেশ তথা বাংলা পারস্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত ছিল।

আমাদের দেশে সুলতানী ও মোগল আমল পেরিয়ে বৃটিশ আমলের বহু বছর পরেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান, দলিল-দস্তাবেজ চুক্তিপত্রসহ ইত্যাদি যাবতীয় কিছু ফার্সি ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হত। প্রায় ২ শত বছরের কাছাকাছি বৃটিশরা বাংলা শাসন করলেও সুলতানী আমল ও মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত ফার্সিকে বাংলা থেকে বিদায় দেয়া সম্ভবপর হয়নি। আজও বহু পুরাকীর্তিসমূহের শীলালিপিতেও ফার্সি ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অর্থাৎ সুলতানী ও মোগল আমল বিদায় নেওয়ার পর বৃটিশ-পাকিস্তান আমল পেরিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চললেও আমরা আজো পারস্যের প্রভাব ও ফার্সির ব্যবহার থেকে মুক্ত নই।

ইমাম খোমেনী পরবর্তী ইরান

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের পরের ইরান এবং পূর্ববর্তী ইরানের মধ্যে অনেক ব্যবধান। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বহু রক্তের বিনিময়ে পাহলভী শাহ সপরিবারে ইরান থেকে বিতাড়িত হয় ১৯৭৯ সালের ১৪ জানুয়ারীতে। অপরদিকে, ইমাম খোমেনী ইরাক, তুরস্কে দীর্ঘ ১৪ বছরের নির্বাসিত জীবনযাপন করে ফ্রান্স চলে যান। ফ্রান্স থেকে ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী তেহরান প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ না করে নিজ বাড়ীতে অতি সাধারণ জীবনযাপন করতে থাকেন। সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ইরানকে দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন। এভাবে তেহরানের মাটিতে ১০ বছরকাল অতি সাধারণ জীবনযাপন করে ১৯৮৯ সালের ৩ জুন ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু রেখে যান ইরানের জন্য অনেক সাফল্য, দিকনির্দেশনা এবং শিয়ামতাবলম্বীদের শতশত বছরের লালিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন।

মূলত পাহলভী শাহ-এর আমলে ইরান বর্তমান আধুনিক তুরস্কের অনুরূপ ইউরোপিয়ান স্টাইলের জীবনযাত্রা গ্রহণ করে। সাথে সাথে উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রসমূহের আদলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করান। পশ্চিমা দেশসমূহ পাহলভী শাহ পিতাপুত্রকে নানাদিক দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে যেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে কাদিয়ানীদের মত শিয়াগণকে পশ্চিমা-ইহুদী খ্রীস্টানগণের লালিত একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখতে থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। পাহলভী শাহ-এর আমলে দীর্ঘসময় কাদিয়ানীদের মত শিয়ারাও পশ্চিমা ইহুদী, খ্রীস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে শিয়াদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের উপর কালিমা লেপন করায়। অপরদিকে, পশ্চিমা ধাচের জীবনযাত্রা গ্রহণ করে ইরানে নানান বিলাসবহুল জীবযাপন-এর পাশাপাশি সামাজিক অপরাধ প্রবণতা লালন করে চলে। রাষ্ট্রীয় সম্পদে চলে অবাধে লুটপাট। ইরানের নারীসমাজ বিলাসিতা ও উলঙ্গপনা গ্রহণ করে নানাভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। পুরুষরা বিলাসী জীবনযাপন গ্রহণ করে অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

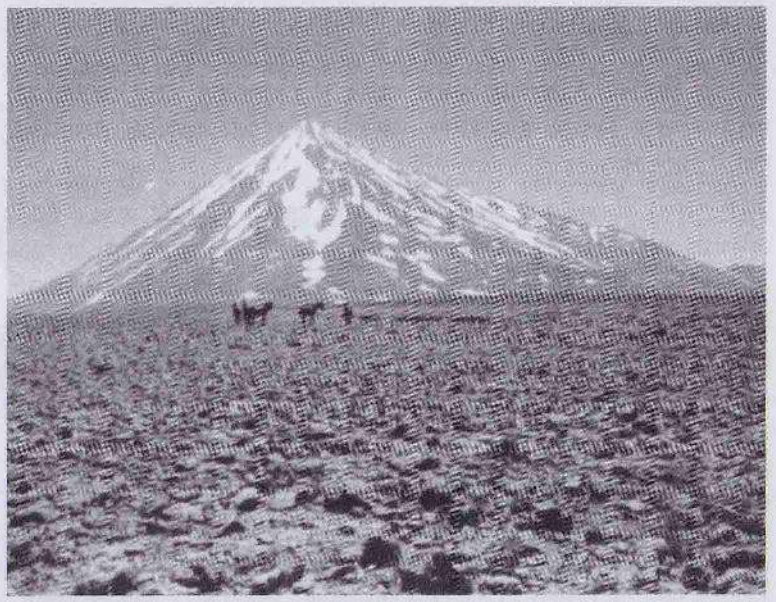

ইরানের ডামাবান্দ সার্মিট সর্বোচ্চ পর্বত শিঙ্গ যার উচ্চতা ৫৬৭১মিটার

এমনি এক নাজুক অবস্থায় ইমাম খোমেনী ৭ কোটির মত ইরানবাসীর জন্য আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ হয়ে আবির্ভূত হন। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হয়।

ইসলামী বিপ্লবের বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ যোগ্য ইরানী শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম খোমেনী দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু বিদেশের মাটিতে অবস্থান করেও তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে থাকেন। ইমাম খোমেনীর লক্ষ লক্ষ অনুসারীদের মধ্যে অসংখ্য শাহাদাত বরণের পরেও তারা সংগ্রামে পিছ-পা হচ্ছিলনা। ফলশ্রুতিতে পাহলভী শাহ সপরিবারে ইরান থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

ইমাম খোমেনী দেশে প্রত্যাবর্তন করে ধর্মীয় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধারণাতীত সাফল্য লাভ করেন। তিনি দেশে ফিরে তেহরানের মাটিতে ১০ বছরকাল অতি সাধারণ জীবন যাপন করে ইরানের আপামর জনগণের পাশাপাশি বিশ্ববাসীর কাছেও অতি সম্মানের উচ্চ শিখরে সমাসীন হন। রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী না হয়েও তাঁর সম্মান সর্বউর্ধ্বে ছিল। তাঁর সঠিক সময়োচিত দিকনির্দেশনার কারণে ইরান দ্রুত উন্নতিলাভে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদের কোনরূপ

লুটপাট নেই। রাষ্ট্রীয় সমস্ত কার্যক্রম জনকল্যাণে। ইরানীরা রাষ্ট্রীয় সেবার সুফল পাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রী-এমপি-সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীর কোথাও বিলাসিতার লেশমাত্র চোখে পড়বে না। আমাদের গরীব দেশের মত রাষ্ট্রীয় সম্পদে বিলাসী জীবনযাপন, আলীশান সিংহাসন আকৃতির চেয়ার-গদী ইরানে চোখে পড়েনি।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথ ব্যয় হতে থাকায় ইরান দ্রুত সম্পদশালী হচ্ছে। ইরানী নারীসমাজের জীবনযাত্রা দেখলে অবাক হতে হয়। নারীরা পশ্চিমা কালচার পরিহার করে শালীনতা গ্রহণ করেছে। তালেবানী ধর্মীয় উগ্রবাদী ও গোঁড়ামী তাদের মধ্যে নাই। ইরানী নারীরা শালীনতার ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীন। হোটেল রেস্টুরেন্টে, অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, দোকান-মার্কেটে নারীদের বিচরণ দেখে অবাক হতে হয়। উপসাগরীয় রাজতন্ত্র দেশগুলোর মত তাদের দেশে খাদ্দামা প্রথা (চাকরাণী) চালু নেই। ইরানী নারীরা তাদের ঘরকন্নার কাজ, সন্তান-সন্ততি লালন পালন নিজেরাই করে থাকেন। প্রয়োজনে বাচ্চাদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যায়। নিজেদের গাড়ী নিজেরাই চালায়। নারীদের প্রতি ওয়াক্তে প্রায় প্রতিটি মসজিদে জা'মাতে নামাজ পড়ার তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম খোমেনীর দিকনির্দেশনায় ৭ কোটি ইরানী আয়েশী-বিলাসী জীবনযাপন থেকে ফিরে আসায় স্বভাবতই কর্মমুখর হয়ে যায়। ফলে চাষাবাদ, মিল-কারখানায় নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী হতে থাকে। ইরান এগিয়ে যেতে থাকে দ্রুত।

শিয়া মতাদর্শ নিয়ে পাহলভী শাহর আমল বা আরো আগে কাদিয়ানীদের অনুরূপ যে দুর্নামের ভাগী হয়েছিল ইমাম খোমেনীর ধর্মীয় বিপ্লবের ফলে তা অনেকটা ঘুছে যায়।

ইমাম খোমেনীর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দুটি বিষয় বিশ্বে তাক লাগিয়ে দেয় : একটি হল – নবী পাক (স.)-এর শানে বেয়াদবী করায় কুখ্যাত সালমান রুশদীকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার কারণে বিশ্ব মুসলিমগণের অন্তরে ইমাম খোমেনীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের কোন রাজা-বাদশাহ প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী এ কুখ্যাত জ্ঞানপাপী রুশদীর প্রতি শাস্তি ঘোষণা করতে সাহস করেনি। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী হয়েও ইমাম খোমেনী নবীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

অপরটি হল : ইমাম খোমেনীর একটি যুগান্তকারী শ্লোগান – আর তা হল "আমরা শিয়াও নই আমরা সুন্নীও নই – আমরা মুসলিম"। এতে শিয়া-সুন্নী ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ বহুলাংশে লোপ পেয়ে যায়।

সুন্নী ও শিয়ার মধ্যে বহু বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। শিয়ারা যদি নবীপাক (স.)-এর পরে হযরত আলী (ক.)-কে নবী না মেনে ইমাম মানে তবে এক্ষেত্রে শিয়াগণকে মুসলিম মনে না করা সহজ নয়। অপরদিকে, নবী পাক (স.)-এর প্রতি মোহাব্বত এবং আহলে বাইত-এর প্রতি তাঁদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ সুন্নীদেরকে ছাড়িয়ে যাবে।

ইমাম খোমেনী যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়ার কারণে ধর্মীয়ক্ষেত্রে, নারীসমাজের ক্ষেত্রে, সামরিকক্ষেত্রে, অর্থনৈতিকক্ষেত্রে এক কথায় – ইরানীদের জীবনযাপনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে।

৭ কোটি ইরানী ইমাম খোমেনীর কাছে ঋণী। ইমাম খোমেনী ইন্তেকাল করেছেন আজ ১৯ বছর পেরিয়ে গেল। ইমাম খোমেনীর প্রতি ইরানীদের মনের গভীর থেকে শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করা যাবেনা। তাঁরই শানে কবিরা যখন মর্সিয়া পড়ে তখন ইরানীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াতে থাকে।

মাজারের দেশ ইরান। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইমামসহ অসংখ্য অলি-দরবেশের মাজার রয়েছে ইরানে। তেহরান শহরের উপকণ্ঠে শহীদানের কবর সংলগ্ন ইমাম খোমেনীর কবরকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মাজার কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন রয়েছে। দীর্ঘ ১৯ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও ইমাম খোমেনীর মাজার কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হচ্ছেনা।

বিশ্বের বুকে মাজারের বিশালত্বের দিক দিয়ে ইরাকের নজফে হযরত আলী (ক.)-এর মাজার এবং ইরানের মা'শাদে ইমাম রেজার মাজার। এ দুই মাজারের বিশালত্ব স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করা যাবেনা। মনে হয় সমগ্র বিশ্বে বিশালত্বের দিক দিয়ে অপর আর একটি মাজার যোগ হতে যাচ্ছে এবং তা হবে ইমাম খোমেনীর মাজার।

হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এ মাজার কমপ্লেক্স নির্মাণ ইমাম খোমেনীর প্রতি ইরানী জনগণের গভীর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ তা সহজেই বুঝে নেয়া যায়।

ইরানী রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের সাথে মতবিনিময়

ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে মাননীয় রাষ্ট্রদূতগণের সাথে। রাষ্ট্রদূতগণের সাথে সাক্ষাতে ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইরানের বিভিন্ন অবদান ও ভূমিকা বাংলাদেশের সাথে ইরানের সুসম্পর্কসহ নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়।

এইরূপ আলাপ আলোচনা হয় ইরানের মাননীয় সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব হাসান ফারজানদেহ-এর সাথে ২১ জুন ২০১০। পরবর্তীতে বর্তমান মাননীয় রাষ্ট্রদূত হোসাইন আমিনিয়ান তুসী রাষ্ট্রদূত দায়িত্ব গ্রহণ করলে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করি।

রাষ্ট্রদূতগণও লেখালেখিতে বিচরণ এবং দু'দুবার ইরানে সফর করায় তারাও কৌতূহলী হয়ে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে অতি আগ্রহ থাকা অনুধাবন করা যায়। যেহেতু বাংলাদেশের সাথে ইরানের নিবিড় সুসম্পর্ক রয়েছে।

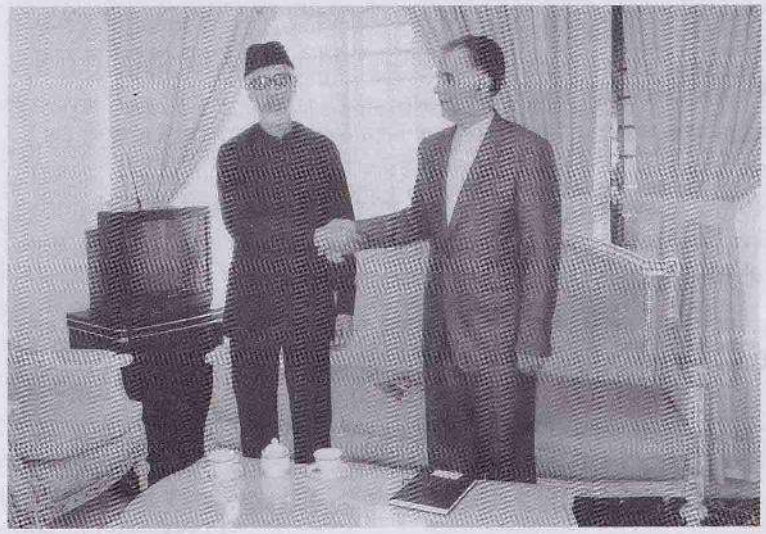

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নতুন মাননীয় রাষ্ট্রদূত হোসাইন আমিনিয়ান তুসী ঢাকাস্থ দূতাবাসে দায়িত্ব গ্রহণ করলে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন লেখক। মতবিনিময়ের পর বিদায়কালে করমর্দনরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

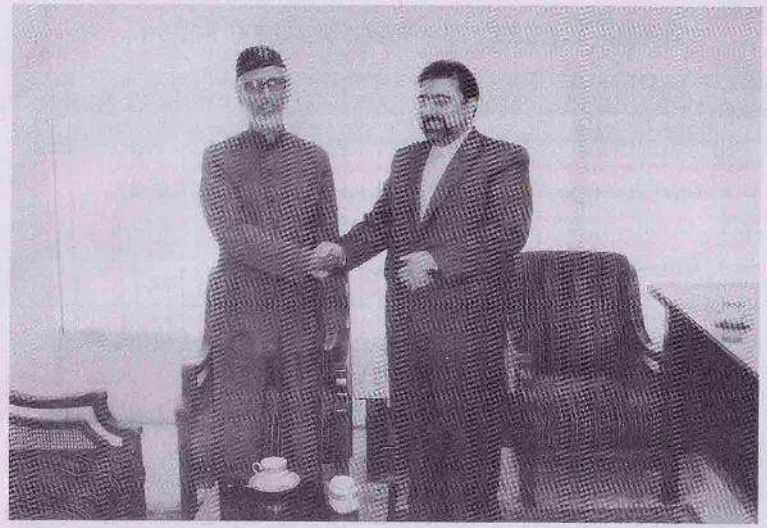

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাননীয় রাষ্ট্রদূত (সাবেক) হাসান ফারজানদেহ-এর সাথে ঢাকাস্থ বারিধারা দূতাবাসে মতবিনিময়ের পর বিদায়কালে করমর্দন করছেন লেখক

ইসলামী বিপ্লবত্তোর এক নজরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ক্রমিক	নির্বাচনী মেয়াদ	নির্বাচনের তারিখ	ভোটের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	প্রার্থী সংখ্যা	নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম
১	প্রথম	২৫/১২/১৯৮০	২,০৯,৯৩,৬৪৩	১,৪১,৫২,৮৮৭	৬৭.৪২%	১২৪	বনি সদর
২	দ্বিতীয়	২৪/০৭/১৯৮১	২,২৬,৮৭,০১৭	১,৪৫,৭৩,৮০৩	৬৪.২৪%	৭১	শহীদ মোহাম্মদ আলী রেজায়ী
৩	তৃতীয়	০২/১০/১৯৮১	২,২৬,৮৬,০১৭	১,৬৮,৪৭,৭১৭	৭৪.২৬%	৪৬	আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী
৪	চতুর্থ	১৬/০৮/১৯৮৫	২,৫৯,৯৩,৮০২	১,৪২,৩৮,৫৮৭	৫৪.৭৮%	৫০	আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী
৫	পঞ্চম	২৭/০৮/১৯৮৯	৩,০১,৩৯,৫৯৮	১,৬৪,৫২,৬৭৭	৫৪.৫৯%	৭৯	আলী আকবার হাশেমী রাফসানজানি
৬.	ষষ্ঠ	১১/০৬/১৯৯৩	৩,৩১,৫৬,০৫৫	১,৬৭,৯৬,৭৮৭	৫০.৫৬%	১২৮	আলী আকবার হাশেমী রাফসানজানি
৭.	সপ্তম	২৩/০৫/১৯৯৭	৩,৬৪,৬৬,৪৮৭	২,৯১,৪৫,৭৫৪	৭৯.৯৩%	২৩৮	মোহাম্মদ খাতামী
৮.	অষ্টম	০৭/০৬/২০০১	৪,২১,৭০,২৩০	২,৮০,৮১,৯৩০	৬৬.৫৯%	৮১৪	মোহাম্মদ খাতামী
৯	নবম (প্রথম পর্ব)	১৭/০৬/২০০৫	৪,৬৭,৮৬,৪১৮	২,৯৪,০০,৮৫৭	৬২.৮৪%	১০১৪	কোন প্রার্থীই ৫০% এর ওপর ভোট না পাওয়ায় পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা
	নবম (দ্বিতীয় পর্ব)	২৪/০৬/২০০৫	৪,৬৭,৮৬,৪১৮	২,৭৯,৫৮,৯৩১	৫৯.৭৬%	২	মাহমুদ আহমাদিনেযাদ
১০	দশম	১২/০৬/২০০৯	৪,৬০,৭৬,৬৯৫	৩,৯১,৬৫,১৯১	৮৫.০০%	৪	মাহমুদ আহমাদিনেযাদ

দশম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিস্তারিত ফলাফল

প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ঃ ৩,৯১,৬৫,১৯১ (মোট ভোটারের ৮৫%)
মাহমুদ আহমাদিনেযাদ ঃ ২,৪৫,২৭,৫১৭ (প্রদত্ত ভোটের ৬৩.৬২%)
মীর হোসাইন মুসাভী ঃ ১,৩২,১৬,৪১১ (প্রদত্ত ভোটের ৩৩.৭৫%)
মোহসেন রেজায়ী ঃ ৬,৮৭,২৪০ (প্রদত্ত ভোটের ১.৭৩%)
মাহদী কাররুবী ঃ ৩,৩৩,৬৩৫ (প্রদত্ত ভোটের ০.৮৫%)
নষ্ট ভোটের সংখ্যা ঃ ৪,০৯,৩৮৯ যা প্রদত্ত মোট ভোটের ১.৪০%

সৌজন্যে : নিউজ লেটার